বাংলায় মুসলিম জাগরণে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা

মোঃ আববাস আলী
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ৬০/২০০৮-২০০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

ড. মো: আতাউর রহমান মিয়াজী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলায় মুসলিম জাগরণে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি গবেষক মোঃ আব্বাস আলীর মৌলিক রচনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের আবশ্যিক শর্তাবলীর আঙ্গিকে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য এটি প্রণীত হয়েছে। আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতি প্রক্রিয়াত্তোর তদারকি করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করেছি। অতঃপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ জ্ঞাপন করছি।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

''বাংলায় মুসলিম জাগরণে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা'' শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী । সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করা আমার জন্য অতি দূরুহ ব্যাপার ছিল। তাই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ জাকারিয়া উক্ত বিষয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া, এই বিভাগের অফিস স্টাফগণ বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্র মোঃ ইসমাইল হোসেনকে। কেননা, সে আমাকে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিল। পরবর্তীতে, সড়ক দুর্ঘটনায় অকাল প্রয়াত এই মেধাবী ছাত্রের অকাল মৃত্যুতে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

এই গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বেগম সুফিয়া কামাল গ্রন্থাগার (ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী), বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীসহ আরো কতিপয় লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। উক্ত সব লাইব্রেরীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এই জন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁদের কথা, যাদের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমাকে অফিসিয়াল কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ গবেষণা কর্ম সুস্পন্ন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাতা বেগম আবেজান নেসা, প্রিয়তমা স্ত্রী শাহনাজ পারভীন নূপুর এবং আদরের কন্যা আফসানা বিনতে আববাস (আনিসা)। আজ আমার বাবা মরহুম শাহাদাত হোসেন বেঁচে নেই। তিনি জীবিত থাকলে আমার এ সফলতায় সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। এ মুহূর্তে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর নামে উৎসর্গ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

মোঃ আববাস আলী
রেজিঃ নম্বরঃ ৬০/২০০৮-২০০৯

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	প্রথম অধ্যায় ভূমিকা	
২	দ্বিতীয় অধ্যায় সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা	
৩	তৃতীয় অধ্যায় বাংলায় মুসলিম জাগরণের স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য	
৪	চতুর্থ অধ্যায় জমিরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জীবন	
৫	পঞ্চম অধ্যায় জমিরুদ্দীনের রচনাবলী পর্যালোচনা	
৬	ষষ্ঠ অধ্যায় মুসলিম জাগরণে জমিরুদ্দীনের ভূমিকা	
৭	সপ্তম অধ্যায় উপসংহার	
৮	গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	

বিষয়ঃ বাংলায় মুসলিম জাগরণে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর শুরু হতে অদ্যবধি যত রকম ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা এসেছে তার মধ্যে ইসলামই কেবল আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। আর এই দ্বীন ইসলাম বা জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীর সূচনা হতে বর্তমান পর্যন্ত আল্লাহ্ তার অসংখ্যা নবী, রাসূল, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাব তাবেয়ীগণ কর্তৃক নিরলসভাবে ক্রমান্বয়ে নিরবিচ্ছিনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ঠিক তেমনিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারত উপমহাদেশে যে কয় জন দ্বীন ইসলামের প্রচারক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, বাগ্মী, তর্ক-বিশারদ, কবি, প্রবন্ধকার ও সুলেখক জন্ম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন অন্যতম।

১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর এদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমানগণ সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম এদেশে শাসন করেন। মাঝখানে রাজা গনেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা টোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলা শাসন করেছিলেন, কিন্তু তারা ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি-নাজিম। বাংলা বিজিত হওয়ার পর অনেক আগে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরবের মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং পরবর্তীতে তারা ভারতের অধীশ্বর হন। মামলুক, খিলজী, ঘোরি, বলবন, শূর, মোগল বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করেন। মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পঞ্চাশ বছর পর ইংরেজরা প্রথম বাংলা এবং একশত বছরের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ দখল করে ভারতে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দোলার পতনের সাথে সাথে বাংলার মুসলিম জাতির বুকে নেমে আসে এক দুর্যোগের মহা ঘনঘটা। ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে তাদের আধিপত্যি প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। অথচ যে মুসলমান তাদের মান -সম্ভ্রাব, শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য, বিত্ত-বৈভব, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছিল অবিস্মরণীয়, কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তারা পরবর্তীতে পিছু হটতে শুরু করে। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর লখনৌতি বিজয়ের পর এদেশের মুসলমানগণ রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অলঙ্কৃত করেছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর দ্রুত গতিতে মুসলমানদের ভিত্তি ধ্বংসের দিকে যেতে শুরু করে। ফলে, প্রতিবেশী হিন্দুরা এটিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা বিস্তার করে।

এদেশীয় মুসলমাদের বিত্ত,বৈভব,সম্মান কিছু দিনের মধ্যেই হাতছাড়া হয়ে যায়। বিত্তমান মুসলমানরা পথের ভিখারীতে পরিনত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কারণে মুসলমানদের অবস্থা পরবর্তীতে শোচনীয় হয়ে ওঠে। জমিদারী ও জায়গীরদারীসহ সকল কিছুই হিন্দুদের করায়ত্তে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার তাঁর "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থে লিখেছেন, ''১৭০ বছর পর পূর্ব বাংলার সম্ভ্রান্ত কোন মুসলমানদের পক্ষে দরিদ্র হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আজ তাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যে সুযোগ করে দেয়া হলো সে পথ ধরেই একশত বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দিল্লীর মসনদ ইংরেজদের করাতলে চলে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরাজয় সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানরা চরম হতাশা ও অনিশ্চিয়তার মুখে পতিত হয়। বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল মুসলমানরা, তাই মুসলমানরা ইংরেজদের প্রাণঘাতী শত্রুরুপে পরিগণিত হলো, অপরদিকে হিন্দুরা হলো তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু।

উপরন্তু, ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় খ্রীস্টান মিশনারীরা মুসলমানদের অশিক্ষা ও দ্রারিদ্র্যতার সুযোগে ধর্মান্তরের দৌরাত্ব ব্যাপকভাবে চালাতে লাগল। মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রথম দিকে সেই জোয়ারে গাঁ ভাসালেন। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এমতাবস্থায়, মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন মুন্সি মেহেরুল্লাহ এর সংস্পর্শে এসে ইসলামের সুমহান আদর্শে সামিল হবার সুযোগ পান। তিনি বৃটিশ শাসকদের ছত্র ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত

খ্রীস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতাকে রুখে দিয়ে বজ্রকণ্ঠে জবাব দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। বৃটিশ রাজ শক্তির নিকট মাতা নত না করে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এর সাথে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে তিনি প্রচার করলেন মহান সৃষ্টিকর্তার শ্বাশত ইসলামের অমীয় বাণী। তিনি পুনরুদ্ধার এবং উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের অতল গহবর হতে হারিয়ে যাওয়া লাঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত পথভ্রষ্ট মুসলিম জাতিকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্যা বই লিখে, বাংলার আনাচে-কানাচে অসংখ্যা জনসমাবেশে দীপ্ত কণ্ঠে সভা-সমাবেশ করে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নব-জীবনের আশার উদীপ্ত আলো। বিংশ শতকে বাংলা তথা এই উপমহাদেশে যে যুগান্তরকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম পুরুষ ছিলেন মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন- একথা নিদ্বিধায় বলতে পারি।

মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ছিলেন ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত এক মহান অজেয় পুরুষ। বাংলার মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার সুযোগে খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা তাদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্মের মতাদর্শ ঢালাওভাবে প্রচার অব্যাহত রাখে। ফলে সমগ্র বাংলার মুসলিম জাতির মধ্যে খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। সময়টি ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম নেতারা মোটেই নিরব ভূমিকা পালন করেননি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে, মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। এ ঋণ প্রতিটি বাংলার মুসলমানকে অকপটে স্বীকার করতে হবে। আর তাঁর ঋণ স্বীকারের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর জীবনী নিয়ে কাজ করার। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পেলাম যে, এ বিষয় অনেকে কাজ করেছেন। পরে আমার তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক জনাব প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী কে আমার এম.ফিল এর বিষয়টি নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে অভয় দিয়ে জানালেন যে, যেহেতুে আমার জন্মস্থান বৃহত্তম যশোর জেলায়, সেহেতু আমার মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের উপর গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। মেহেরপুরে জন্মগ্রহণকারী এই বীর সৈনিকের উপর তেমন কোন কাজ/গবেষণা না বললেই চলে। তাই আমি তাঁর উপর কাজ করার ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রস্তাবকে সানন্দচিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে প্রাণে গেঁথে নিলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রবল উৎসাহ ও সুপরামর্শকে বুকে লালন করে অনেক আশা নিয়ে আমি ছুটে যাই মেহেরপুরের গাঁড়াডোব গ্রামে মরহুম মুন্সি সাহেবের বাড়ীতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে থাকতাম। সে সুবাধে আমার সমবয়সী ইংরেজী বিভাগের বন্ধু মোঃ আমিরুল ইসলাম ছিলেন মেহেরপুরের সন্তান। বর্তমানে তিনি মেহেরপুরের সরকারী বালক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। আমি তাঁর সহযোগিতা নিলাম। আমার এই বন্ধুর মাধ্যমে মেহেরপুরে সরেজমিনে পরিদর্শন করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমি দেখতে পেলাম মরহুম মুন্সি সাহেবের বাড়ীর পাশেই নাম ফলকযুক্ত একটি কবর। কবরটি মুন্সি সাহেবের জানতে পেয়ে মনের ভিতর অনেক আবেগ উচ্ছ্বাস তৈরী হল। আমি আমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে কবর জিয়ারত করলাম। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেলাম মুন্সি সাহেবের পুত্র কন্যাদের কেউ বেঁচে নেই। তাঁর একজন পৌত্রের কাছে করুণ অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা জানতে পেলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, বর্তমানে তাঁর বাড়ীর অবস্থা ভাঙা কয়েকটি চালা কুঁড়েঘর। মুন্সি সাহেবের পুত্রদের মধ্যে আজিজুদ্দীন, জামালুদ্দীন, গিয়াস উদ্দীন তাঁর পুস্তক প্রকাশনার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। মুন্সির অনেকগুলো বইয়ের প্রকাশক হিসেবে তাঁর পুত্র-কন্যাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে। পুত্র জামালুদ্দীন এলাকার একজন নামকরা শিকারী হিসেবে পরিচিতি ছিল। লেখালেখির প্রতি তার বেশ আগ্রহ ছিল। জানা গেছে যে, মুন্সির কন্যা নূরজাহান সাহিত্য চর্চা করতেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মুন্সি সাহেবের পৌত্র পৌত্রীদের বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। পৌত্রদের মধ্যে বর্তমানে (কোর্টের মুহুরী) যিনি বেঁচে আছেন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আমি তাঁর কাছে মরহুম মুন্সিজির লেখা বইপত্র ও পান্ডুলিপিসমূহ দেখা ও পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি আমাকে তেমন কোন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন না। তিনি আমাকে দ্বিধাহীনচিত্তে জানালেন যে, দাদার ইন্তেকালের পর তাঁর বই পুস্তকসমূহ গাংনীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জমিরিয়া লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগার খুলে বইসমূহ সেখানে রাখা হয়। এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বইসমূহের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এছাড়া কিছু বই বাড়ীতে ছিল, বর্তমানে তার কোন হদিস নেই। তিনি জানান যে, আমার বাবার সাথে জনৈক পুলিশ অফিসারের ভাল সম্পর্ক ছিল, তাঁকে দাদার বেশ কয়েকটি বই দেয়া হয়েছিল। বাবার মুখে শুনেছি, "দাদার কিছু বই বাংলা একাডেমীতে আছে"। এসব কথা শুনার পর কিছুটা হতাশ হয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে নিরুৎসহিত করেননি, বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করতে বলেন এবং নাসির হেলাল সম্পাদিত "মুনশী মেহেরুল্লাহ জীবন ও কর্ম" পুস্তকটি দেখার পরামর্শ প্রদান করেন

এবং পরবর্তীতে আমি ড. আবুল হাসান চৌধুরী রচিত "মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন জীবন গ্রন্থমালা-২৩" বইটির সন্ধান পাই। তথ্যবহুল এই বই দুইটি আমার উৎসাহ, উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পেল।

মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন সম্পর্কে এই পর্যন্ত কম বেশি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেটা নিতান্ত মুষ্টিমেয় এবং সীমিত। বিশেষ করে বর্তমান যুগের লেখক, প্রাবন্ধিকদের লিখনীতে জমিরুদ্দীন একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবেই সীমাবদ্ধমাত্র। সুতরাং এই আবর্তের বাইরে থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের জীবন-সাধনা, সমকালীন প্রেক্ষাপট ও ইসলাম প্রচার, প্রসারে তার অবদানকে আলোকপাত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

সত্যিকার অর্থে বাংলায় মুসলিম জাগরণের উন্মেষ পর্বে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্যভাবে বিবেচনার অধিকার রাখে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, ঊনিশ ও বিশ শতকে সেই সন্ধিক্ষণে ইসলামের সুমহান আহবান মুসলিম আত্নচেতনা লাভে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে সে সময়ে যাঁরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী নব-জাগরণ আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন তাদের মধ্যে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন নিঃসন্দেহে অন্যতম। তাঁর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় রোধে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন মোল্লা-মৌলভী-মুন্সি উপাধিতে ভূষিত ধর্ম প্রচারক। আধুনিক শিক্ষা অপেক্ষা আরবী, ফার্সী, উর্দু এবং ইসলামী শাস্ত্রেই তাদের অধিকার ছিল সর্বাধিক। পবিত্র ইসলামের আলোকে তাঁরা যাবতীয় পার্থিব সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যাখা করার চেষ্টা করেছেন এবং তার উপায়/ব্যবস্থা তারা আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিপূণভাবে মূল্যায়ণ করলে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায় না। কিন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, বাংলার মুসলিম জাগরণে আজীবন ধর্ম-চর্চা, সমাজ সংস্কার ও নিজ কওমের সেবায় আত্ননিয়োগ করেছিলেন, সেই মহান ব্যক্তি আজো সেই সম্মান-মর্যাদা লাভে বঞ্চিত রয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে তিনি কোন উল্লেখযোগ্য সম্মান/স্বীকৃতি প্রাপ্ত হননি। তাঁর নিজ জেলা শহর মেহেরপুরে অবস্থিত একটি মার্কেট ও গাঁড়াডোবে একটি সড়ক ব্যতীত তাঁর নামে স্থানীয় এবং জাতীয়ভাবে আর কোন সড়ক বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়নি। তাঁর ত্যাগ ও অবদানের যেটুকু মূল্যায়ণ করা হয়েছে তা তার জীবদ্দশায় সাধিত হয়েছে এবং তা নিতান্তই যৎসামান্য। বলাবাহুল্য, এ পর্যন্ত তাঁর অবদান ও সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়ে কোথাও কোন বস্তুনিষ্ঠ কাজ হয়নি। এমতাবস্থায়, বাংলার মুসলিম জাগরণে

মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের ভূমিকায় তার কর্ম সাধনা ও অবদানের প্রতি যথাযথ মূল্যায়ণ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

আমার এই অভিসন্দর্ভটি সাত (৭) টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছি। অধ্যায় গুলোর শিরোনাম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. ভূমিকা
২. সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা
৩. বাংলায় মুসলিম জাগরণের স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য
৪. জমিরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জীবন
৫. জমিরুদ্দীনের রচনাবলী পর্যালোচনা
৬. মুসলিম জাগরণে জমিরুদ্দীনের ভূমিকা
৭. উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরদ্দীনের আবির্ভবকালীন প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকে ঊনিশ শতাব্দীর সমাপনী পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থার বাস্তবচিত্র সার সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলার মুসলিম জাতির প্রকৃত অবস্থা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলায় মুসলিম জাগরণের স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও সর্বভারতীয় পটভূমিতে বাংলায় মুসলিম জাগরণ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় মুসলিম জাগরণ বিলম্বিত হওয়ার কারণ, ক্রমান্বয়ে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) ও শাহ আব্দুল আযীয এর জিহাদ আন্দোলনের সূত্র ধরে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রঃ) ও তাঁর শীষ্যবর্গের সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া, বাংলাং উক্ত জিহাদ আন্দোলনের প্রভাব, উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে হাজী শরীয়তুল্লাহ, শহীদ তিতুমীর ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এর অবদান ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্র ধরে পরবর্তীতে ইংরেজদের সাথে আপোষকামী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল 'Enlightened' বা 'আলোকপ্রাপ্ত' কতিপয় শহুরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেস্টায় দেরীতে হলেও মুসলিম মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ, এক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখের

দৃশ্যপটে আগমন ও নেতৃত্ব প্রদান, ভারতে দেওবন্দ ও আলীগড় আন্দোলন এবং বাংলায় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ তাঁদেও অনুসারীদের জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত নসিহতনামা বিষয়ক বই-পত্র প্রকাশ, বাংলায় মুসলিম সমাজে কতিপয় সাহিত্যকদের আবির্ভব ও তাঁদের সাহিত্য কর্ম, কতিপয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আত্নপ্রকাশ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ প্রর্ভতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের জন্ম,বংশ, পারিবারিক পরিচয়, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্র জীবনে তিনি খ্রীস্টান ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্রীস্টান ধর্মের কুটকৌশলে আটকা পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্মের অনুসারী হয়ে যান। পরবর্তীতে ভুল অনুধাবন করে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বিষয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি স্বধর্ম ফিরে এসে ইসলামের একজন খাদেম হিসেবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়টি ও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের শিক্ষানুরাগী, পান্ডিত্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি তাঁর চির প্রস্থান প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সাধনার অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ১০৮ খানা। যেহেতু তাঁর লিখিত পুস্তক-পুস্তিকারগুলি এখন প্রায় দুষ্পাপ্য, তাই অনেকের কাছে এই সংখ্যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তবে, ফুরফরা শরীফের পীর হযরত আবুবকর (রাঃ) এর বর্ণনা মতে, খ্রীস্টান মিশনারীরা যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কুৎসা-রটনা ও তাঁর চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপনের উদ্দেশ্যে ৫২ খানা পুস্তক রচনা করে, তখন পীর সাহেব জমিরুদ্দীন সাহেবকে উক্ত ৫২ খানা পুস্তকের প্রতিবাদ স্বরুপ পুস্তক রচনা করার নির্দেশ দেন। এখান থেকেই "রদ্দে খ্রীস্টান" সিরিজের উদ্ভব হয় । তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থমালার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বিভিন্ন ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর লিখিত মুসলিম-অমুসলিম খ্যাতনামা পন্ডিতদের রচিত গ্রন্থমালা হতে অনুদিত। যেহেতু বাংলাসহ, ইংরেজী, আরবী, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা তাঁর দখলে ছিল, সেহেতু অনুবাদমূলক গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অনেক অনুসন্ধানকরে তাঁর বেশ কিছু বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থ হতে তাঁর আরো ১২ টি গ্রন্থের তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তাঁর

সাথে সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকাসমূহ প্রত্যেকটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে আমার মূল লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করার চেষ্টা চালিয়েছি। এ অধ্যায়ের সমাপনীতে মুসলমান সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাতে মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত ৫০ টি প্রবন্ধের শিরোনাম উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৮টি প্রবন্ধের পর্যালোচনার করার প্রয়াস পেয়েছি। এছাড়া, বিভিন্ন সূত্র হতে উদ্ধারকৃত ২২টি প্রবন্ধের শুধুমাত্র শিরোনাম উল্লেখ করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর মুসলিম জাগরণে ভূমিকা শীর্ষক বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা-ভারতে খ্রীস্টান ধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি, খ্রীস্টান ধর্মের অসারতার বিরুদ্ধে মুন্সী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের জ্বালাময়ী বক্তৃতা-বিবৃতি ও ক্ষুরধার লিখনীতে ধারণ, মিশনারী কর্তৃক ইসলাম ও মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্বক লিখনীর তীব্র প্রতিবাদমূলক লিখনী স্থান পেয়েছে। খ্রীস্টান ধর্মের মূল ত্রিত্ববাদ ''ঈশ্বরই পিতা, ঈশ্বরই পুত্র, ঈশ্বরই পবিত্র আত্মা" এই কাল্পনিক মতবাদের কঠোরভাবে প্রতিবাদ করে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বাইবেলের প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইসা (আঃ) কেবল আল্লাহপাকের একজন নবী ও রাসূল। বাংলায় মুসলিম জাগরণে তিনি যে যুগান্তরকারী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্তকারে এগুলো আলোচনান্তে জমিরুদ্দীনের প্রতিক্রিয়ার গঠনমূলক দিকসমূহ আলোচনার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহার হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উপসংহারে রয়েছে মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের জীবন-কর্ম এবং মুসলিম জাগরণের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য একটি মনোসম্মত অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের উপর লেখালেখির কাজ সংখ্যার দিক হতে উল্লেখযোগ্য না হলেও গুণগত দিক থেকে সন্তোষজনক নয়। আমার গবেষণা কর্মটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে-এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে চাইনা। কেননা, এই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে তথ্য উপাত্ত অনুসন্ধানকালে অনেকক্ষেত্রে আমাকে অপ্রত্যাশিত বিরুপ আচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এই মহামনীষীর কৃতিত্বপূর্ণ "জীবন ইতিহাস", ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর অসামান্য অবদানের প্রতি আমাকে মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ করেছে বিধায় এসব কোন প্রতিকূলতায় কখনও কষ্টের হেতু হয়ে দাঁড়াইনি। তারপরেও আমার দীর্ঘদিনের বিরামহীন প্রচেষ্টা এই গবেষণালব্ধ শ্রমের ফসল থেকে যদি কেউ ন্যূনতম উপকৃত হন, তাহলে সেটাই হবে আমার অনেক পাওয়া। পরম করুণাময় আমাদের সকলের সৎ উদ্দেশ্য সার্থক করুন-এই প্রত্যাশা কামনা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা

ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যোগ নেয় পর্তুগীজরা। ১৪৯৮ সালে ভাস্কোদাগামার নেতৃত্বে এদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ধারার সূত্রপাত হয়। ইউরোপ মহাদেশে ক্রুসেডের পটভূমিতে পর্তুগীজরা ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। সেই পটভূমিতে পর্তুগীজরা মুসলিম ভারতে এসেছিল এক হাতে বাইবেল এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এবং সাথে ছিল বাণিজ্যের কুটকৌশল। তাই এদের সম্পর্কে ডঃ জহুরুল ইসলাম উইলিয়াম হান্টারের বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ They were not traders, but Knigterran and Crusaders---. their national temper had been formed in contest with the Moors (Muslims) at home[১]

পরবর্তীকালে ডাচ/ওলন্দাজ, ফরাসী এবং সর্বশেষে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়া ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে। প্রথমে সেবার কথা বললেও মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জন। তারপর এদেশের শাসকগোষ্ঠী তথা এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী জনগণের আতিথেয়তা ও সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হাতিয়ে নেয়। ১৭৫৭ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১৯০ বছর কাল তারা এই উপমহাদেশের এক প্রান্ত হতে আরাম্ভ করে গোটা ভূ-খন্ডই শাসন ক্ষমতার অধীনে করে ফেলে। বলাবাহুল্য যে, এই ১৯০ বছরের ইতিহাস ছিল এদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার। তাদের মূলতঃ লক্ষ্য ছিল বাংলা ও ভারতের ধর্মীয় অবস্থা বিশেষকরে ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য বিনাস সাধন করা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এদেরকে পঙ্গু করা। সর্বোপুরি, বলতে গেলে বাংলা ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-দীক্ষা, উৎপাদন, কৃষি, কারিগরী, বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংস করে এদেশের অজ্ঞতা, অদক্ষতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল বৃটিশ সরকারের শাসননীতি।

---

[১] (A Brief History of the India People, 1868) . মোঃ জহুরুল ইসলাম, মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহঃ তাঁর জীবন ও কর্ম (কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস, পৃষ্ঠা-১২৫।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালে সুজলা, সুফলা ও শস্য শ্যামলায় ভরপুর ছিল এই ভারতবর্ষ যা তৎকালীন ইউরোপকে ও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ পরিব্রাজকগণ অকপটে এ কথা স্বীকার করেছেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের বিশ্বাসী ছিলেন না বটে, তবে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেনঃ অবশ্য এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বৃটিশেরা ভারতবর্ষের উপর যে দুদর্শা চালিয়েছে তা ভারতবর্ষের পূর্বের সকল দুদর্শা হতে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।[২]

বাংলার মুসলমানরা ১৭৫৭ সালে পলাশীর পর থেকে পতন যুগ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়েছে প্রভূ ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহভাজন হিন্দুদের হাতে। উইলিয়াম উইলসন হান্টারের মন্তব্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

----in order to bring clearly before the English eye the class of the people with whose grivances this chapter deals. I would further pemise that my remarks apply only to lower Bengal, the Provinces with which I am best acquainted, and in which. So far as I can learn, the Muhammadans have suffered most severly under British Rule.[৩]

ইংরেজ কোম্পানী ভারতীয় প্রচলিত প্রশাসন রীতিনীতির আলোকে কোন প্রকার পরিবর্তন না করার শর্তে ১৭৬৫ সালে সম্রাট শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। কিন্তু সে শর্ত তারা মোটেই রক্ষা করে নাই। এর কিছুদিন পরেই লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়। তারপর ১৭৭৪ সালে বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বার বছর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড কর্ণওয়ালিস।[৪]

কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করলেও ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা রয়ে গেল নায়েব দেওয়ানদের হাতে। রবার্ট ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় সম্রাটকে দিতে হত ২৬ লাখ টাকা, নবাবকে ৩২ লাখ টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ কোম্পানী নিত। অরাজকতার সময়ে রাজস্ব আদায়কারীরা ইচ্ছে মত রাজস্ব আদায় করত, এতে সবটুকু চাপ এসে পড়ল সাধারণ জনগণের উপর।

---

[২] (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, (মস্কোঃ প্রগতি প্রকাশন,১৯৭১, পৃঃ৩৭)।

[৩] (The Indian Musalmans, Dacca:First Edition,1975, Page-140-141).

[৪] (ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য,পৃ-২৮)

মোগল আমলে যারা ছিল কেবল রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তা মাত্র, ইংরেজ শাসকরা এক পর্যায়ে এসব গোমস্তা বা খাজনা আদায়কারী কর্মচারীদের জমিদার বা জমির মালিক বলে ঘোষণা করলো। এ সকল তথাকথিত গোমস্তা স্টাইলের সমাজপতি ও জমিদারদের প্রধান কাজ হলো কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করা এবং আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেম্পানীর তহবিলে জমা দেয়া।

ইংরেজ সরকার এসব জমিদারদের নিকট হতে যথাসময়ে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করল তাদের খোদ আর্শিবাদপুষ্ট দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রতিনিধি। এরাই কুখ্যাত নায়েব-ই-দীওয়ান হিসেবে পরিচিত। বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নায়েব-ই-দীওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হলো

আহমদ রেজা খাঁ এবং বিহারের নায়েব-ই-দীওয়ান হিসেবে সনদ পেল সীতাব রায় ও দেবী সিংহ নামক দুই সরদার।[৫] এসব নায়েব-ই দীওয়ানদের গোমস্তাদের উৎপীড়ন ও অবাধ লুণ্ঠন শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের প্রভূ ইংরেজ সরকার তা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৭২ সালে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইংল্যান্ড কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরসকে লিখেছিলেনঃ

নায়েব-ই-দীওয়ানের গোমস্তারা জমিদার ও কৃষকদের নিকট হতে যত বেশি পারে অর্থ আদায় করে নিচ্ছে। জমিদারগণও নাজিমদের নিকট হতে নীচের দিকে (চাষীদের) অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার লাভ করেছে। নাজিমরা তাদের সকলের সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার রাজকীয় বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত রেখেছে এবং তারই মারফতে দেশের ধন-সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করার মাধ্যমে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকার লাভ করেছে।

সেকালে বাংলার উন্নত কৃষি ও শিল্পের অবস্থা কোম্পানী-কর্মচারীদের শুল্কবিহীন অন্তর্বাণিজ্য,তাঁতী এবং অন্যান্য শ্রমজীবি শ্রেণীর উপরে তাদের নির্মম অত্যাচারের ফলে ধ্বংস হতে বসেছিল। কোম্পানী-কর্মচারিদের মাত্রাতিরিক্ত বিলাসবহুল ও বেপরোয়া অত্যাচারের ফলে লর্ড ক্লাইভ ও শঙ্কিত না হয়ে পারেননি। বহির্বাণিজ্যও কোম্পানীর একচেটে হয়ে গিয়েছিল। উইলিয়াম বোল্টস্ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁতীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সাধ্যাতিত পরিমাণ কাপড় বয়ন করার জন্য বাধ্য করা হত। যারা কাঁচা রেশম বয়ন করত, তাদের উপর অত্যচার এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময় এই অসাধ্য দাবী এড়ানোর জন্য তারা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি

[৫] (মেসবাহুল হক, পলাশীর যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃঃ১০)।

কেটে ফেলত।[৬] লন্ডন থেকে আমদানীকৃত তৈরী জিনিসের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্পের পরাজয় হতে থাকল প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর এভাবেই বাংলার গঠনশীল ও প্রতিষ্ঠিত শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল।

বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী ক্ষমতা লাভের অব্যবহিত পর প্রতি বছর প্রচুর টাকা বিদেশে চলে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতি আরেকটি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল। দেশের সংগৃহীত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশের বেশি অর্থ বৃটেনে চলে যেত[৭]। ১৮০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী জানা যায়-পূর্ববর্তী ৩০ বছরের ১০৮৫ কোটি টাকা বৃটেনে পাচার হয়[৮]। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে নেমে আসে সীমাহীন বিপর্যয়। ইংরেজ কোম্পানী ও কর্মচারী কর্তৃক অবর্ণনীয় শোষণ লুণ্ঠন এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নির্মম অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) এক বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এটাই "ছিয়াত্তরের মন্বত্তর নামে পরিচিত"। এই ছিয়াত্তরের মন্বত্তরের ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়[৯]।

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একের পর এক এদেশের জনগণের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালায়। তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিও জন্য এদেশের মৃত প্রায় কৃষকের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। তাইতো হিসেবে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষের পূর্বে (১৭৬৮) যেখানে বাংলাদেশের রাজস্ব ছিল ১,৫২,০৪৮৫৬ টাকা, দুর্ভিক্ষের পর (১৭৭১) সারা দেশে এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারানোর পরেও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায়"[১০]।

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতিহাস 'সিয়ার-উল-মুতায়াখখারিন' রচয়িতা ইংরেজ দস্যুদের এই বিভৎস্য শোষণ, উৎপীড়ন ও দুভিক্ষ-মহামারীতে সর্বহারা অসহায় জনগণের দুঃখ, দুদর্শায় ব্যাকুল হয়ে লিখেছিলেনঃ হে খোদা! তোমার দুঃখ-দুদর্শা ক্লিষ্ট বান্দাদের সাহায্যের জন্য একটিবার তুমি স্বর্গ হতে এ ধরার ধূলোয় নেমে এসো। আর রক্ষা কর তাদের এ অসহনীয় উৎপীড়নের হাত থেকে[১১]।

ছিয়াত্তরের মন্বত্তরকে কেন্দ্র করে কৃষকেরা রাজস্ব দিতে অপরাগতা প্রকাশ করতে পারে এমন পরিস্থিতিতে প্রথম লর্ড হেস্টিংস ও পরে কর্ণওয়ালিস কর্তৃক নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

---

[৬] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-২৯।

[৭] পূর্বোক্ত, পৃ-২৯-৩০

[৮] আবুল হাসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্য কর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ-৯।

[৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯-১০

[১০] বদরুউদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক,উদ্ধৃত মেসবাহুল হক রচিত 'পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে,ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮৭, পৃ-১৫।

[১১] (Siyar-Ul-Mutakharian, Ghulam Hussain Khan, P-15, উদ্ধৃত পূর্বোক্ত,পৃ-১৫).

রাজস্ব আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে যে পদ্ধতি চালু ছিল তা মূলোৎপাটন করে একটা সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার জন্য 'একসালা' 'পাঁচসালা' এরপরে 'দশসালা' এবং পরিশেষে তিন বছর পর ১৭৯৩ সালে 'চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজারও মালিক হয় এবং বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল নেমে আসে। লাখ লাখ চাষী ঘর-বাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, আবাদী জমি বন-জঙ্গলে পরিণত হয়। তবুও বৃটিশ কোম্পানীর ন্যূনতম জুলুম কমলো না[১২]।

বাংলার জমিদারদের নিকট হতে সরকারকে প্রদেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল চার কোটি দুই লাখ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদার গোষ্ঠী কৃষকের নিকট থেকে প্রদেয় মোট রাজস্বের প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করতে সক্ষম হয়[১৩]। অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে "সূর্যাস্ত আইন" নামে আরেকটি আইন প্রণয়ন হয়। এই আইনের আওতায় জমিদারীর খাজনা রাজকোষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পৌছালে সে জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। কোম্পানী সরকারের এই সব অপকর্মের ফলে বনেদী জমিদারগুলো বিধ্বস্ত হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলশ্রুতিতে, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর হতে শুরু করে ছোট-খাটো জমিদারী এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়[১৪]। এ সকল পরিবর্তনের ফলে উচ্চ হতে নিম্ন বিত্ত পর্যন্ত প্রত্যেকে পেটের দায়ে পূর্বপুরুষদের জমিজমা বিক্রয় করে দেয়া, এমনকি বিগত সময়ের অর্থ-সম্পদ, সোনা-গহনা ও অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। অপরদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ঐ সমস্ত অর্থ-সম্পদ জমা করে ভারত হতে ইংল্যান্ডে পাচার করে নিয়ে যায়[১৫]।

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেছেন, নবাবী আমলে অভিজাত মুসলিম গোষ্ঠীর অর্থ উপার্জনের তিনটি প্রধান খাত ছিল। যথাঃ-সামরিক পদলাভ,রাজস্ব ভোগ এবং বিচার ও রাজনৈতিক নিয়োগ[১৬]। কোম্পানী আমলে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও ছাটাইয়ের ফলে অনেকে চাকুরী হারালেন। (আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য)। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রথম কয়েক বছর মুসলমানদের

[১২] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-১৯।
[১৩] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা,পৃ-১০।
[১৪] ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৩০-৩১
[১৫] ডঃ মুশতাক আহমেদ, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমেদ মাদানী (রাঃ),ঢাকা,ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৮।
[১৬] উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, লন্ডন,৩য় সংস্করণঃ ১৮৭৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫৯।

তেমন কোন আধিপত্যি ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ কালেক্টরদের নিয়োগ হওয়ায় তাঁদের স্থান সংকুচিত হলো।

এমতাবস্থায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা জমিদারী হারালো এবং এই ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে কুক্ষিগত হলো। নবাবী আমলের ভূমি ব্যবস্থার সাথে কোম্পানী আমলের বন্দোবস্ত ছিল বেশ পার্থক্য। সুতরাং দেখা গেল যে, নতুন ব্যবস্থায় তারাই জমিদারী লাভ করল,যাদের হাতে নগদ অর্থ মজুদ ছিল। তাই একথা নিদ্বিধায় বলা যায় যে,চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে কেন্দ্র করে বাংলার বিত্তশালী হিন্দুরা পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে বাংলার মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন[১৭]।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস এবার নযর দিলেন লাখেরাজ সম্পত্তির দিকে যার প্রতিক্রিয়া ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। মুসলিম আমলে লাখেরাজ বা নিস্কর সম্পত্তির অধিকারী এক শ্রেণীর ভূমি মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এ সকল লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ দখল করতেন[১৮]। ১৮২৮ সালে "নিস্কর জমি বাজেয়াপ্ত আইনে" লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকাংশই মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে, বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান দারিদ্রতার করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের ফলে আঠার শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গোটা ভারতবর্ষে যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়। এরপর একের পর এক ইংরেজরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বিভিন্ন রাজ্য তাদের করায়ত্ত করে নেয়। একদিন তাদের দারিদ্র থাকা অসম্ভব ছিল, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই মুসলমানরা কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হয়[১৯]। এক সময়ে যে ভারত রেশম ও সুতী জিনিস রপ্তানী করত, কোম্পানী আমলে সেই ভারত ইংল্যান্ড হতে এসব দ্রব্য আমদানী করতে বাধ্য হয়। বৃটিশ সরকারের ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষের শিল্প যেভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত জে,সি, মেলভিন; সি.আই ট্রাভেলিয়ান, এইচ লার্পেন্ট এবং মন্টেগোমারী মার্টিন সুস্পষ্ট বলেছেন, "we have destroyed the manufacture of India." ট্রাভেরিয়ানের তথ্য থেকে জানা

[১৭] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।
[১৮] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৩১।
[১৯] আবুল আসাদ, একশ বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ,১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪২।

যায়-"মসলিন শিল্পের ধ্বংসবিলোপের ফলে ঢাকার জনসংখ্যা দেড় লাখ থেকে ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।"[২০]

১৮১৩ সালে 'সনদ আইনে' ইংরেজরা একপর্যায়ে দস্যুবৃত্তি থেকে অনেকটা নমনীয় পর্যায় চলে আসে। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব হয়ে যায়। পরবর্তীতে শাসক শ্রেণীর শোষণ পদ্ধতির বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শোষণের এই আধুনিক অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে[২১]।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে 'শিল্প বিপ্লব' শুরু হওয়ার পর থেকে কলকারখানা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। শিল্পপতিরা শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদিত পণ্য সম্ভার বিক্রয়ের জন্য বাংলা তথা ভারতবর্ষ কে উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা চালান। এই প্রয়াসের সঙ্গে মূলতঃ নীল চাষের সম্পর্ক ছিল মানানসই। ফলে নীল চাষ বাংলা অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অচিরেই সেখানে গড়ে ওঠে তিন হতে চারশ' নীলকুঠি। অধিক লাভের আশায় এসব নীল কুঠিয়ালরা কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আশার রায়তদের উপর অত্যাচরের স্টীম রোলার চালাতে দ্বিধা করতে না[২২]।

এদেশে নীলকর ও তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বর্বরতার যে নিদের্শন রেখে গেছে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের তৎকালীন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সম্পাদকের মন্তব্যঃ "গ্রামে গ্রামে নীলকরদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে। দারোগা তা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে। কেননা, প্রজারা ভয়ে কোন নালিশ করিতে সাহসী হয় না। সাহেবদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া কঠিন। আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক খুব গভীর। তাই প্রজা শ্রেণীর অভিযোগ হয়তো আরো অত্যাচার ডাকিয়া আনিবে"[২৩]।

১৮৬০ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্যার জন পিটার গ্রান্ট কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ নীলকরদের অত্যাচার বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং বহু পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছিল[২৪]। বর্ধমানের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট এইচ,বি,লফোর্ড বলেছেন-

---

[২০] Romsh Datt. The Economic History of India in the Victorian Age, London:3rd edn;1908, BK.J.Chs 8.
[২১] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, পৃ-১১।
[২২] আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য,পৃষ্ঠা-৪২।
[২৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা, কলিকাতাঃ ১৮৫৯,পৃষ্ঠা-৫৮।
[২৪] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা-১৭৫।

রায়তরা নীল বুনছে নীলকরদের খুশি করার জন্য, নিজেদের লাভ বা খুশির জন্য নয়। কাজেই নীলকরগণ যদি দাদন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় হোক। সে ক্ষতি তারা নিজেরাই বহন করুক[২৫]।

১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত লাখেরাজ সম্পর্কে নতুন নতুন আইন তৈরী করা হয়। এই সব অভিনব আইন-কানুন সাধারণ জনতা না জানতে পারায় অনেকের সম্পত্তি তাদের অজান্তে নতুন আইনের আওতায় বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তের ফলে শুধু মুসলমান উচ্চবিত্তের ক্ষতি হয়নি, বরং হিন্দুদের ও ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজ অন্যভাবে যেমন নতুন জমিদারী লাভ করে বা কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করে বা ইংরেজ বণিকদের সহকারী হয়ে) নিজেদের পুনর্গঠন করার সুযোগ পেলেন, অথচ নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন[২৬]।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কোম্পানী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং ১৮৫৮ সালে বৃটিশ সরকার সরাসরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে (আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা)। বৃটিশ সরকার ঐ সময়ে ভারতের শাসনাধিকার চার কোটি ৬০ লাখ পাউন্ডে ক্রয় করে নেয়। ঐ টাকা পরিশোধ করার দায়িত্ব ও অর্পিত হয় ভারতীয় রাজকোষের উপর। শাসকের আসনে বৃটিশ সরকার সমাসীন হয়ে ধন-সম্পদ বছরের পর বছর এভাবে পাচার করে নিয়ে যায়। এই ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীর জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল নেমে আসে। যার ফলে এক সময়ে যে জাতির কখনো অভাবের চিন্তা করতো না, কিন্তু পরবর্তীতে সেই জাতি মিসকিনে পরিণত হয়[২৭]।

আসামের চিফ কমিশনার স্যার চার্লস ১৮৮৮ সালের এক সরকারী রিপোর্টে বলেন, আমি নিদ্বিধায় বলতে পারি যে, এখানকার কৃষকদের ৫০% এর আর্থিক অবস্থার এত অবনতি ঘটেছে যে, তারা গোটা এক বছরে ও পেট ভরে এক বেলা আহার করা কাকে বলে জানে না। জনৈক আমেরিকান মিশনারী লালা লাজপৎ রায় উদ্বৃতি করে বলেন, "উত্তর ভারতের লোকেরা জীবন যাপন করে না বরং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কোন ক্রমে পূরণ করে যাচ্ছে মাত্র। আমি এমন বহু পরিবারকে দেখতে

[২৫] H.B. Luwford, Papers Relating to Indigo Cultivation in Bengal, Calcutta, P-80-93
[২৬] ড.আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪২-৪৩।
[২৭] মেসবাহুল হক, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সম্পাদনঃ আব্দুল গফুর, প্রকাশ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭৩।

পেয়েছি, যারা মৃত লাশের গোশত খেয়ে জীবন যাপন করছে, অথচ সেই সময়ে কোন দুর্ভিক্ষ ছিল না"[২৮]।

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্থ হয় এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়। ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচার,দুঃশাসন, শোষণ ও শত্রুতা মনোভাব পোষণ মুসলমানদের জীবন,সম্পদ এমনকি সামাজিক মান-মর্যাদা চরমভাবে ক্ষণ্ন করে দেয়। যার বাস্তব নমুনা লক্ষ্য করা যায়, বিগত কয়েক শত বছর যাবত যে মুসলমান সার্বিক উন্নতিতে সমৃদ্ধময়ী হয়ে আসল, আজ তারা পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অধঃপতনের গ্লানিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ ব্যাপারে উইলিয়ামের মন্তব্য চমৎকার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়ঃ

W. W. Hunter obsered in about 1870: A hundred and seventeen years ago it was almost impossible for a well-born Mussalman in Bengal to become poor. at present it is almost impossible for him to continue rich: The truth of this statement will be evident from the account of the conditions of the Muslims under the British rule[29].

ইংরেজ শাসনের পূর্বে দেওয়ানী ও রাজস্ব, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা তথা নিরাপত্তা ও শিক্ষা প্রভৃতি বেসামরিক চাকুরীতে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ডঃ ওয়াকিল আহমদের এক হিসাব মতে ১৭৭৪ সালে কোম্পানী সরকারের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়-সেখানে মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হিন্দু কর্মচারী সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ১৯ জন [৩০] ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর মুসলমানদেরকে ঐসকল পদ থেকে অপসারণ করতে থাকে, আর সে সব পদে নিজেদের ফিরিঙ্গি লোকজন অথবা হিন্দুদেরকে নিয়োগ করতে থাকে। যে কারণে মুসলমানরা সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম ৫০ বছর পর্যন্ত মুসলমানরাই সরকারী কাজ কর্মে একক সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য পেয়েছিল। এরপর পঞ্চাশ বছর ধরে যুগের পরিক্রমায় দ্রুতগতিতে ১৮৩৭ সালে সরকারী কাজে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগে মুসলিম আধিপত্য ক্ষণ্ন হতে থাকল। এরপর থেকে ঐ পদগুলো পূরণ হতে থাকে হিন্দুদের দ্বারা, -যারা ইংরেজী ভাষা

---

[২৮] আব্দুর রহমান, তাহরিকে রেশমী রুমাল, লাহোর,,উদু প্রেস-১৯৬০, পৃষ্ঠা-৭৭, ডঃ মুশতাক আহমদ রচিত 'শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা-৪৯।

[২৯] Dr. K.M. Mohsin, Bangladesh Under British Rule: Islam in Bangladesh Through Ages, P: 83

[৩০] ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ২৭-২৮।

শিখেছিল। উইলিয়াম উইলসন হান্টার লিখেছিলে, ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসের হিসাবে প্রকাশঃ প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু। কিন্তু দু'বছর পর একজন মুসলমান, ৩ জন হিন্দু। দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরীর ক্ষেত্রে ২ জন মুসলমান, ৯ জন হিন্দু। কিন্তু দু'বছর পর ১ জন মুসলমান, ১০ জন হিন্দু[৩১]।

প্রাক-ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক সকল পদে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইংরেজ শাসন আমলে সেটার সম্পূর্ণ রদবদল হয়। ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসের সিভিল সার্ভিসের লিস্ট মোতাবেক চাকুরীর যে পরিসংখ্যান দেখা যায়, তাতে বিভিন্ন পদের সরকারী পদ ছিল ২১১১টি। তন্মধ্যে ইংরেজদের জন্যই ছিল ১,৩৩৮টি পদ, হিন্দুদের জন্য ৬৮১টি পদ আর মুসলমানদের জন্য পদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২টি[৩২]।

এ থেকেই প্রতিয়মান হয় যে, একশত বছর পূর্বে যারা প্রশাসনের প্রায় সকল বিভাগে অধিষ্ঠিত ছিলেন বৃটিশ সরকারের আমলে মোট চাকুরীর কুড়ি ভাগের এক ভাগও তাদের প্রদান করা হয়নি। চাকুরীসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এই অসম বন্টননীতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক তথা আপত্তিকর। মুসলমানদের মনে পুঞ্জিভূত এই বেদন ও আপত্তির আবেদন বিভিন্ন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সিপাহী বিদ্রোহসহ সাওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে বিদ্রোহের এক নবমাত্রা রূপ লাভ করে।

রাজনৈতিক অবস্থা

পলাশী যুদ্ধের প্রহসনের মাধ্যমে ১৭৫৭ সাল থেকে ইংরেজ কোম্পানীর দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মীর জাফর আলী খাঁন নবাব হলেন (১৭৫৭-১৭৬০) তিন বছরের জন্য। কোম্পানীর অনুগত হয়েও তিনি মসনদ ধরে রাখতে পারেননি। লর্ড ক্লাইভ তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এর পর মীর কাশিম (১৭৬০-১৭৬৩) নবাব হন। কোম্পানীর আজ্ঞাবহ নবাব মীর কাশেমও রাজ্যচ্যুত হন। মীর জাফর পুনরায় নবাবী ফিরে পেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখলেন। এর কিছুদিন পর মীর জাফরের ১৮ বছরের বয়স্ক জারজ পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬) মসনদ লাভ করেন। আনন্দে দিশেহারা হয়ে নতুন নবাব বলে উঠলেন। 'আল্লাহকে ধন্যবাদ'। আমি এখন যত খুশি নর্তকী

[৩১] পূর্বোক্ত, পৃ-১১০।
[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ-১১১।

রাখতে পারব[৩৩] মুলতঃ ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে রাজদন্ড ধারণ করল।

ঐতিহাসিক সূত্রে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বলা হয় কোম্পানী আমল। ১৭৭৩ সালের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ শক্তির নিয়ন্ত্রণ নানা ষড়যন্ত্র অপচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজ শক্তি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতা লাভ করল ঠিকই; কিন্তু শুরুতেই তাঁরা দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব কায়েম করল না। কারণ জনগণ তাদের কর্তৃত্বের আনুগত্য করবে কি-না সে লক্ষ্যে প্রথমে ইংরেজদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ নবাবকে নামকে ওয়াস্তে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে নেপথ্যে শাসকের চাবিকাঠি রাখল নিজেদের হাতে[৩৪]

১৮৫৭ সালের ভারতের ইতিহাসে সিপাহী অভ্যুত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনাবহুল অধ্যায়ের সূচনা করে। এই অভ্যুত্থানের স্বরূপ নিয়ে নানা জনের নানা মতান্তর সৃষ্টি হলেও এতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি যে দুর্বল হয়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জানের মন্তব্যঃকেউ কেউ একে ধর্মান্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে দেখেছেন, কেউবা একে মনে করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। আবার অনেকেই চিত্রিত করেছেন এদেশবাসীর প্রথম স্বাধীনতা-সমর হিসেবে। মনে হয় অভ্যুত্থানের মধ্যে এই সবকটি লক্ষণই সন্নিহিত হয়েছিল[৩৫]

১৭৫৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এ দেশের বুকে অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে-যা গণবিদ্রোহে রূপ লাভ করে। বৃটিশ সৃষ্ট-সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের রিরুদ্ধে জনগণ তাদের অসহায় শৃঙ্খলিত বহুবার হাতিয়ার তুলে ধরেছে, বার বার পরাজিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তবুও নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মদানের আদর্শ নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে স্বৈরাচারী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। শোষণের প্রধান শিকার এদেশের কৃষক গোষ্ঠীর সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিল। 'ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত এই কৃষক আন্দোলন সমগ্র বাংলা, বিহার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল-যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত[৩৬] এই কৃষক বিদ্রোহকে ফকির-সন্নাসী

---

[৩৩] আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৮।
[৩৪] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ৭।
[৩৫] আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৫৪।
[৩৬] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ১১১।

বিদ্রোহ নামে পরিচিত হওয়ার কারণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ফকিরের সম্মন্ধে মরহুম নওয়াবজাদা আব্দুল আলী কোলকাতা থেকে প্রকাশিত এশিয়াটিক জার্ণালে লিখেছেনঃ

তারা মাথায় লম্বা চুল রাখে, রঙ্গিন কাপড় পড়ে এবং লোহার শিকল ও লম্বা চিমটা ব্যবহার করে। তাদের খাদ্য প্রধানতঃ আতপ চাল, ঘি ও নুন। তারা মাছ মাংস খায় না এবং কিছুদিন আগ পর্যন্তও তারা কৌমার্যের জীবন-যাপন করতো। সফরের সময় তারা মৎস্য প্রতিক চিহ্ন অঙ্কিত পতাকা ব্যবহার করে এবং তারা বিরাট দলবল নিয়ে চলাফেরা করে। তাদের উপাধী 'বোরহানা'। এসব ফকীর 'বসরিয়া' তরিকার 'তৈফুরিয়া খান ওয়াড়ো' ও 'তারাগাতি' ঘরের অন্তর্ভূক্ত। অন্যভাবে আমার মনে হয় 'তৈফুরিয়া খান ওয়াড়ো' হচ্ছে 'বসরিয়া'; ঘরেরই একটা শখা। শাহা মাদার হচ্ছেন এ তরিকা প্রবর্তক[৩৭]

এভাবে তৎকালীন বাংলায় অনেক ছোট-বড় গণ-বিদ্রোহ কৃষক ও প্রজা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তন্মোধ্যে ফারায়েযী আন্দোলন (১৮৩৮-৪৮), তাঁতী বিদ্রোহ (১৯৭০) ওহাবী আন্দোলন (১৮৭০-১৯৩০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), লবণ বিদ্রোহ (১৭৮০), চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৮৯), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য[৩৮]। বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার মানসে উল্লেখিত সংগ্রাম তথা বিদ্রোহ সফল ভূমিকা রাখে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশের মিডিয়া হিসাবে মুসলমানদের বিভিন্ন 'সভা-সমিতি' রাজনৈতিক চেতনার বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তি-চিন্তা ও সমষ্টি-চিন্তার মধ্যে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন বোধ থেকে মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটে। তখন থেকে এক নতুন ধরনের সমাজ সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী শিক্ষিত রাম-মোহন রায় (১৭৭৪-১৮৭৩) প্রথম 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) অনুষ্ঠিত করেন। প্রথম পঞ্চাশ বছর হিন্দু শিক্ষিত সমাজে অনেকগুলো সভা-সমিতি গড়ে ওঠে[৩৯]। 'বেঙ্গল বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি' (১৮৪৩), 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), প্রসন্ন

---

[৩৭] নওয়াবজাদা আব্দুল বারী ছিলেন ইম্পেরিয়াল রেকর্ড কিপার, ১৯০৩ সালে তিনি এশিয়াটিক সোইটির জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখেন, এটি তারই অংশ বিশেষ,পৃ-২১।

[৩৮] ওয়াকিল আহমদ, উনশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃঃ ৫১৯।

[৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ-১১৫

কুমারের 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৩), রাধা কান্ত দেবের 'ধর্মসভা' (১৮২৮), 'ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮২৯), তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'সাধারণ জ্ঞানোপর্জিকা সভা' (১৮৩৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৮) প্রভৃতি সমিতিগুলো আংশিক হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রথম সংগঠন 'আঞ্জুমানে ইসলাম' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫) স্থাপিত হয়। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'নূর-আল ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' (১৮৯৯), 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম' (১৮৯১), 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩), 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান সমিতি' (১৮৯৯) ইত্যাদি সভা-সমিতির মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে জাগ্রত করার এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখে।

স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ও আত্মবিকাশের মনোভাব নিয়েই হিন্দু মুসলমানের এই সভাগুলোর জন্ম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় কোন কোন সভা-সমিতি, স্ব-সমিতি ও স্ব-শ্রেণীর স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে। হিন্দু-মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী গতিধারায় পরিচালিত হয়েছে এসব সভা-সমিতি। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান সম্প্রদায় এক কাতারে মিলিত হতে পারেনি [৪০]।

ভারতীয় রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি ছাড়া আরো কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনীতি ছিল অন্যতম। তাই প্রথম যুগে হিন্দু নেতারা ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করলেও পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিব্র অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং দেশে তখন জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইন্ডিয়া লীগ ইত্যাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়[৪১]। এই সাংগঠনিক তৎপরতাকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্যে সাবেক ইংরেজ সিভিলিয়ান এলেন অক্টেভিয়ান হিউমের (১৮২৯-১৯১২) পরিকল্পনায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়[৪২]। গত কারণেই প্রাথমিক অবস্থায় কংগ্রেস সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের ধারণা ছিল পরিস্কার।

---

[৪০] পূর্বোক্ত, পৃ-১১৭-১১৮

[৪১] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৭৩।

[৪২] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, পৃ-১৬।

১৮৮৫-১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছর কাল জাতীয় কংগ্রেসের যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা অত্যন্ত নরমপন্থী এবং উদার মনভাব সম্পন্ন[৪৩]। রাজা রামমোহনের ন্যায় স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) ইংরেজ শাসননীতির আনুগত্য করে, তবে তাঁরা সমগ্র দেশবাসীকে নিজেদের অধিকার-সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা সংকোচপূর্ণভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে শাসন-বিভাগ থেকে বিচারবিভাগ পৃথক করার জন্যে, ভারতীয়দেরকে সরকারী পদে পুনঃনিয়োগের দাবিতে, অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ও সামরিক খাতে ব্যায় হ্রাস করার জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এইসব আবেদন-নিবেদন গৃহীত হয়নি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ায় ভারতের আইন সম্মত রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলেও এর গতি ছিল যৎসামান্য। পাশাপাশি ঠিক ঐ সময়ে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির দ্বারা সাম্রজ্যবাদী স্বাসন অবিচল রাখার জন্যে ইংরেজরা যে সময়ে বিভিন্ন মতবাদ চালিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী[৪৪]। এদিকে ১৮৯৯ সালে বড়লাট কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ভারতে এসে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে হিন্দু মুসলিমের মাঝে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব বহুগুণে জাগিয়ে তোলে। এই সময় থেকে কংগ্রেস-রাজনীতির পাশাপাশি বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি ভিত্তি স্থাপিত হয়[৪৫]। মুসলমানদের একটি শ্রেণী প্রথম দিকে কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করলেও পরবর্তীতে বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে মুসলমানদের উপর বৃটিশ-রাজশক্তির অত্যাচার-অবিচার ও নির্যাতনের ফলে তারই সূত্র ধরে মুসলিম-মানসে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয় এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র লাভের প্রচষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়।

এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ মুসলিম নেতা।

---

[৪৩] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৭৪।
[৪৪] ডঃ মুসতাক আহমেদ, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমেদ মাদানী (রঃ),পৃ-৯২
[৪৫] আবুল হোসেন চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, পৃ-১৭।

তাঁরা মুসলিম জনস্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে গড়ে তোলে সুসম্পর্ক, অপরদিকে স্বীয় সম্প্রদায়ের জনগণকে করে তোলে অধিকার-সচেতন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাত ছিল, বৃটিশ সরকারের রোষ অপনোদনের জন্য সৈয়দ আহমেদ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উর্দুতে 'ভারতের বিদ্রোহের কারণ' (১৯৫৯) শীর্ষক পুস্তিকা রচনা করে বৃটিশ সরকারের সন্দেহ ভঙ্গনের চেষ্টা করেন।[৪৬] তার এই প্রচেষ্টা মুসলিম জনতার জন্য অনুকূল পরিবেশ বয়ে আনে।

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে নবাব আব্দুল লতিফের অবদান ব্যর্থ হয়নি। ১৮৭০ -৭২ সালের পর আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক বিচারপতি নরম্যান এবং শের খান কর্তৃক বড়লাট লর্ড মেয়ো নিহত হলে উক্ত দুই হন্তাকে তিনি তীব্র নিন্দা করেন। (ওয়াকিল আহমেদ ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা)। এর পর আব্দুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইট'র উদ্যোগে কলকাতায় এক সভা আহ্বান করেন।সেই সভায় জৌনপুরের আধ্যাত্মিক মাওলানা কেরামত আলী (১৮০০-১৮৭৩) বক্তৃতায় এক পর্যায়ে ফত্ওয়া দেন যে, বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয় 'দারুল ইসলাম'।

তরিকা-ই মুহাম্মদীয়া-পন্থীদের থেকে প্রশ্নটি পুনরুত্থাপিত হলে মক্কার হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাজহাবের তিনজন ফত্ওয়াদানকারী (মুফতী) ঘোষণা দেন যে, তারতবর্ষ 'দার-উল-হরব'[৪৭]। নবাব আব্দুল লতিফ ও মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ অনুরূপ একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের আকাঙ্খা করেছিলেন। পরবর্তী তাঁরা মাওলানা কেরামত আলীর ফত্ওয়া সম্বলিত পূর্ণ বক্তৃতার বিবরণী ছাপিয়ে ভারতের মুসলমানদের জ্ঞাতর্থে তার পাঁচ হাজার কপি জনগণের হাতে হাতে পৌঁছে দিলেন[৪৮]।

[৪৬] ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা শীর্ষক গ্রন্থের ৩নং টীকা হতে সংকলিত, পৃ-৫২১।
[৪৭] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,পৃ-৬৯
[৪৮] ওয়াকিল আহমেদ উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-১২৪

মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির জন্মের ১৫ বছর পর সৈয়দ আমীর আলী এবং কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমানের নেতৃত্বে ১৮৭৮ সালের ১২ মে ন্যাসনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার মত যখন কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না তখন রাজনৈতিক স্বার্থ সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। সৈয়দ আমির আলীও সরকারের সঙ্গে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তবে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যদের তুলনায় এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব।

সমকালীন সময়ে তিনি মুসলমান সমাজের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যথিত হয়ে এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ১৮৮২ সালে বড়লাট লর্ড রিপনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ২৮টি পরিচ্ছেদের একটি দীর্ঘ 'স্মারক পত্র' পেশ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ স্মারক পত্রে সৈয়দ আমির আলি স্ব-সম্প্রদায়ের বর্তমান দুর্গতির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এগুলোর অবসান কামনা করেছেন এবং স্ব-গোত্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ইংরেজ শাসকের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নিবেদন করেছেন[৪৯]। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে' যোগদানের জন্যে আহুত হয়েও দুরদর্শী আমির আলী তা থেকে বিরত থাকেন। যেহেতু তিনি সামাজিকভাবে হিন্দু মুসলমানদের একতা ও সমৃদ্ধি চাইলেও রাজনৈতিকভাবে মুসলমানকে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান কামনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবুল আসাদ লিখেছেনঃ

''মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি যেখানে বৃটিশদের গায়ে হাত বুলিয়ে মুসলমানদের অধিকার আদায় করেছিল, সেখানে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন দাবী আদায়ের প্রেসার গ্রুপ হিসাবে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বলা যায়, নবাব আব্দুল লতিফের জাতীয় উত্থানের চারা গাছটি সৈয়দ আমির আলীর হাতে এসে আরো শক্তি অর্জন করলো''[৫০]।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের আগে মুসলিম নেতা সৈয়দ আহমদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেসে যোগদানের ব্যপারে শুধুমাত্র অস্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না,

[৪৯] পূর্বোক্ত পৃ-১৩৫।
[৫০] আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি,পৃ-৩৬।

বরং তিনি ১৮৮৭ সালের বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ বক্তৃতায় হিন্দুদের যুক্ত নির্বাচন দাবীর তীব্র বিরোধিতা করলেন। এ সময়ে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম বিরোধিতা ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লে বিপদের আশংকায় তিনি ১৮৮৯ সালে মুসলিম প্রতিরক্ষা সমিতি গঠন করলেন[৫১]

স্যার সৈয়দ আহমদের এই কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র ভারতবর্ষে থেমে থাকেনি, বাংলাতে এর প্রভাব পড়ে। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী হয়তো তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিলেন[৫২]। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কি সদর কি মফস্বল অধিকাংশ শহরগুলোতে সৈয়দ আহমদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন এসোসিয়েশন ও আঞ্জুমান গড়ে উঠেছিল, -যা ছিল কংগ্রেস বিরোধী।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মুসলমান সম্পাদিত বাংলা-ইংরেজী পত্র-পত্রিকা সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের অনুকূলে কাজ করে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়ঃ

"আমরা কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিযোগী নহি। কি যে প্রণালীতে কংগ্রেসের কার্য চলিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের আপত্তি। আমরা দেখিতেছি, প্রজার প্রকৃত হিত সাধনের পরিবর্তে কংগ্রেস এখন নানাবিধ অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয়ে অবতারণা করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে রাজপুরুষদের চক্ষে ঘৃণিত ও হেয় করিয়া তুলিতেছেন। এই চাকুরীজীবি বাঙ্গালী এই কংগ্রেসের জন্য রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইয়াছেন। একতা লইয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস মন্দিরে কংগ্রেস পান্ডাদের মধ্যে সে একতা কোথায়? বাংলাদেশ কংগ্রেসের উদ্ভব ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী সম্পাদকেরা, কংগ্রেসের অধিনায়কেরা আত্মদ্রোহে নিমগ্ন। ..... সৈয়দ আহমদ সাহেব প্রথমে কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সেই কর্মবীর তাহার প্রতি সহানুভূতি শূন্য হন। আমরা তাই নানা কারণে কংগ্রেস দ্বারা সুফল লাভের আশা করিতেছি না। অনেকে বলেন-আমরা কংগ্রেস

[৫১] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭।
[৫২] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ-১৮।

বিরোধী। ..... আমরা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু ইহার বর্তমান কর্মপ্রণালীর বিরোধী। (মিহির ও সুধাকর, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩০৭)[৫৩]

'মাসিক হাফেজ' পত্রিকা (১৮৯৭) সহ 'ইসলাম' (১৮৮৫), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১), 'সুধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' ('৮৯২), 'প্রচারক' (১৮৯৯), 'নূর-অল-ইমান' (১৯০০), 'নবনূর' (১৯০৩) প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতে কংগ্রেসের বিপক্ষে বিভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে, –যা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

তৎকালীন বাংলায় যে সকল মুসলিম রাজনীতিবিদ কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করে প্রায় সব অধিবেশনে যোগদান করেছেন তাঁরা হলেন গুনিয়াউকের আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭), বর্ধমানের আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬), লেদুয়ারের আব্দুল হালিম গজনবী (১৮৭৯-১৯৫৬), পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) সম্পাদনায় সোলতানে'র (১৯০১) মত আরো দু'একটি পত্রিকা কংগ্রেসের পক্ষে জনমত প্রচার করে[৫৪]

মুসলিম জাগরণের স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল সুদূরপ্রসারী। আর সৈয়দ আমির আলি বঙ্গীয় মুসলমানাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁর এসোসিয়েশন মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান–যা প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ স্থানীয় সংস্থার কাজ করে। ১৯০৪ সালে তাঁর বিলেত চলে যাওয়ার পর ইহা নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য তিনি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেন[৫৫]। আমির আলি মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে ইহার ফল বিপুল অর্থবহ হয়ে উঠেছিল।

---

[৫৩] ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৫২৫।
[৫৪] পূর্বোক্ত, পৃ-৫২৬।
[৫৫] এম.এ রহিম,পূর্বোক্ত,পৃ-১৩৯

লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের ফলাফল মুসলমানদের রাজনৈতিক অঙ্গণে এক গভীর প্রভাব পড়ে–যদিও এই বিভাগ অনেকাংশে ছিল বৃটিশ সরকারের দূরভিসন্ধিমূলক। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করবার মত মুসলমানদের তখন মানসিক প্রস্তুতি বা সংহতি—শিক্ষা কোনটাই ছিল না। তবুও চূড়ান্ত ভাবে সিদ্ধান্তে অনুযায়ী ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রথম দিনটাকে মুসলমানরা পালন করল 'উৎসবের দিন' হিসেবে। আর বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকী হিন্দুরা উদ্‌যাপন করল 'জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে[৫৬]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পর মুসলমান সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অভিঘাত, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রম অবনতি ও মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের পটভূমিকায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে নওয়াব মুহ্‌সিনুল মুল্‌ক, নওয়াব আলী চৌধুরী, এ, কে, ফজলুল হক সহ ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লিখিত দাবি পেশ করে[৫৭]। ঐ স্মারকলিপিতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার শিক্ষা, চাকুরী, জন-প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা হয়। সিমলা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক ফল ডেকে এনেছিল। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিমূলক একটি সভায় প্রস্তাব—সমর্থনের মাধ্যমে (ক) ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তি বৃদ্ধি, (খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার-স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতি এবং (গ) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার না হয়, এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংস্থা" (All India Muslim League) নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়[৫৮]। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই। কেননা তৎকালীন

---

[৫৬] (আবুল আসাদ,পূর্বোক্ত,পৃ-৪৬-৪৭)।

[৫৭] পূর্বোক্ত, পৃ-৫১।

[58] এম,এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৩।

মুসলিম সমাজের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের জন্য এরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। এ রাজনীতিগত কর্মতৎপরতা সব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল না; বরং মুসলিম সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখতে যেয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে তা পরিচালিত হয়েছে। সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগই স্ব-সমাজের জন্য সে দায়িত্ব পালন করেছে।

শিক্ষার অবস্থা

ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংকট ও বিপর্যয়ের ফিরিস্তি জানতে হলে প্রথম পরিচিত হতে হবে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে। সুরজিৎ দাশ গুপ্ত তাঁর ভারতবর্ষ ও ইসলাম শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম বাবু সম্প্রদায় বা ভদ্র শ্রেণী, আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়[৫৯]। এদেশে বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করল উল্লেখিত শ্রেণী বিশেষ লোকজন। অপরদিকে মুসলমানরা চিহ্নিত হলো ইংরেজদের বিরাগ ভাজন। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হারাবার পর বাংলার মুসলমান চাকুরী, জমিদারী, জায়গীরদারী প্রভৃতি হারাতে থাকে, ইহাতে তাদের আর্থিক ঐশ্বর্য্য বিলীন হয়ে যায়। আর্থিক দৈন্যতার কারণে তাদের শিক্ষার গুরুতর ক্ষতি হয়। অথচ এই মুসলমানগণই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় সকলের শীর্ষে। জেনারেল শ্লীমান মুসলমান আমলে তাদের শিক্ষার উচ্চ মান সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন।

ভারতীয় মুসলামনদের মধ্যে শিক্ষার যেরুপ প্রসার হইয়াছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরুপ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুড়ি টাকা মাহিনায় চাকুরী করে সে তাহার পুত্রের জন্য সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সমান শিক্ষার

---

[৫৯] সুরজিৎ দাশ গুপ্ত, ভারত বর্ষ ও ইসলাম,পৃ-১৬৯।

ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে সকল বিষয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে সেইগুলি তাহারা আরবী, ফারসি ভাষায় আয়ত্ব করে। অক্সফোর্ড হইতে যুবকগণ সদ্য যে জ্ঞান লইয়া বাহির হইয়া আসে মুসলমান যুবক সাত বৎসরে সে জ্ঞান আহরণ করিয়া মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস, এরিস্টোটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, গেলেন ও ইবনে সীনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে[৬০] এম, এ, রহিম 'দিন ইন্ডিয়ান মুসলমানস'-এর বরাত দিয়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

''মুসলমানদের শিক্ষা পদ্ধতি যদিও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি হইতে নিকৃষ্টতর ছিল, তবু ইহা অবহেলার যোগ্য ছিল না; উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি ও সুরুচির বিকাশ করিবার সামর্থ ইহার ছিল; যদিও তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরাতন ধারায় চালু তবু ইহা মোটামুটি সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই যুগে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতির ফল তাহারা জ্ঞান ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল এবং ইহার মাধ্যমে হিন্দুগণ তাহাদের দেশের শাসনকার্যে ক্ষুদ্রতম অংশ পাইবার যোগ্যতা অর্জন করার আশা করিত''[৬১]।

কোম্পানী-শাসন আমলে শাসকগোষ্ঠী ভারতীয়দেরকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। উইলবার ফোর্স ১৭৯২ সালে ভারতে একবার স্কুলের শিক্ষক পাঠাবার ইচ্ছা করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক তা বাতিল হয়ে যায়। এমনকি কোম্পানীর একজন পরিচালক তাঁর ভাষণের মধ্যে পরিষ্কার উক্তি করেছিলেন যে, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই ইংল্যান্ড আমেরিকাকে হারিয়ে ফেলেছে, ভারতবর্ষে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটুক এটা বৃটিশ বেনিয়ার কাম্য হতে পারে না[৬২]।

আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাঁদের শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করতে সম্ভবপর হয়নি। এম,এ, রহিম এডাম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—প্রত্যেক মসজিদ ও ইমামবারায় আরবী ও ফারসী শিক্ষার

---

[৬০] এম,এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭),পৃ-৯৮

[৬১] পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।

[৬২] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহত্য, পৃ-৩২।

ব্যবস্থা ছিল। তিনি আরো বলেছেন—তখন বাংলা ও বিহারের ৪০০০০০০০ অধিবাসীর জন্য ১০০০০০ প্রাইমারী স্কুল ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ১২ বছর বয়স্ক তিনশত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা করতে পারত[৬৩]।

কোম্পানী আমলে অনেকদিন যাবৎ ফার্সী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা, শিক্ষা ও শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মর্যাদা পায়। এজন্য মুসলমানগণ তাদের আরবী-ফার্সী শিক্ষার ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছিল। ১৮৩৫ সারে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এডামকে বাংলা-বিহারের গ্রামগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা তদন্তের জন্য নিয়োগ করেন। এডাম কয়েকটি জেলার শিক্ষার অবস্থা করে তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম রিপোর্টে তিনি দেশীয়, মিশনারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর বিবরণ দেন। দ্বিতীয় রিপোর্টে তিনি রাজশাহী জেলার নাটোরের শিক্ষার অবস্থা নৈরাশ্যজনক বলে বিবরণ দেন। ১৮৩৮ সারে তৃতীয় রিপোর্টে তিনি কয়েকটি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেন।

এডাম মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতির ও মুসলমান শিক্ষকের প্রশংসা করে বলেছেন, হিন্দু বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অপেক্ষা আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা বেশী ফলপ্রদ ও সাধারণ জ্ঞানের উপযোগী ছিল[৬৪]।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করলে কলকাতা হয় তাদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজরা তখন দলে দলে সেখানে আসতে শুরু করে, সেই সঙ্গে খ্রীস্টান মিশনারীদেরও আগমনঘটে[৬৫]। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার দাযিত্ব গ্রহণ করে খ্রীস্টান মিশনারীরা। সেই সুবাদে ইংরেজী শিক্ষার সূত্র ধরে খ্রীস্টধর্মের সংশ্রব ঘটে। ইউলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ছিলেন মিশনারীদের সর্বপ্রধান কর্মী। খ্রীস্ট ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে আসেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ

---

[৬৩] এম,এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,পৃ-৯৯।

[৬৪] এম,এ রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১০১।

[৬৫] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, ইসলামী দাওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আওয়াল জৌনপুরী-এর অবদান, পি,এইচ,ডি, থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,পৃ-৬৪।

করেন[৬৬]। ১৭৯৪ সালে তিনি মালদহ জেলার সদনহাটি নীলকুঠী সংলগ্ন একটি বাংলা-স্কুল আরম্ভ করেন। উইলিয়াম কেরী ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনারী সোসাইটির কাজে যোগদান করে সেখানে একটি প্রেস স্থাপন করেন এবং সমাচার দর্পন নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মে নামক একজন মিশনারী ওলন্দাজদের উপনিবেশ ১৮১৪ সালে চিনসুরায় একটি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে কয়েক বছরের মধ্যে চিনসুরায় ২৬টি ও ইহার পাশ্ববর্তী স্থানে ১০টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৫ সালে লর্ড হেস্টিংস এই বিদ্যালয়গুলোর জন্য ৬০০ টাকা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৮ সালে এই বিদ্যালয়গুরোতে মোট ৩০০০ ছাত্র লেখাপড়া শিখত। ইংরেজ শাসকগণ এদেশের লোকদের জন্য প্রাচ্য শিক্ষা আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে ১৭৮০ সালে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা আলিয়া মাদ্রাসা এবং বেনারসে রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকানের উৎসাহে ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়[৬৭]।

লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যোগে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ ব্যাপারে আনিসুজ্জামানের উক্তি ঃ

''এ কলেজ যদিও স্থাপিত হয় কোম্পানী-কর্মচারীদেরকে দেশী ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে, তবুও কলেজকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও উর্দু গদ্য—সাহিত্যের জন্ম হয়েছে এবং তার প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী''[৬৮]।

ধর্মীয় গোড়ামী ও বৃটিশ শাসনের প্রতি অবজ্ঞা করে উপমহাদেশের মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার পুনঃবিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়।

১৮২৩ সালের সনদ আইনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতবাসীর শিক্ষার জন্যে কোম্পানীর বাজেটে এক লক্ষ টাকা ধার্য থাকবে[৬৯]। ডিরেক্টর বোর্ড এই টাকা শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যয়ের জন্য অনুমোদন দিয়েছিল, সেখানে ফারসী শিক্ষার কোন

---

[৬৬] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৩।
[৬৭] এম,এ রহিম,বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭,পৃ-১০৪।
[৬৮] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৩।
[৬৯] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৩

উল্লেখ ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য সরকার ১৮২৩ সালে 'General Committee of Public Instruction' গঠন করেন[৭০]।

খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্যে খ্রীস্টান মিশনারীগণ বাংলায় ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৭৩১ সালে Society for the Promotion of the Christian Knowledge নামক ধর্ম প্রচারকদের একটি দল কলকাতায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৭৫৮ সালের সুইডেনের ধর্ম প্রচারক জাকারিয়া কিয়ার নান্ডার কলকাতায় অন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন[৭১]। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত খ্রীস্টান মিশনারী দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোই পর্যায়ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে, সেখানে মুসলমান ছাত্ররাও পড়ত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়[৭২]।

১৮২৪ এর ১৮ ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দেন[৭৩]। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি করার জন্য সুপারিশ করা হয়। অন্য দিকে কলকাতা মাদ্রাসায় ১৮২৯ সারে শুধুমাত্র প্রাইমারী লেবেলে ইংরেজী শিক্ষার অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অবহেলার কারণে ক্যালকাটা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমে অবনতি হতে থাকে। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সেখানে ইংরেজী শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ৮৭ জন[৭৪]।

লর্ড বেন্টিংক (১৮৩৩-১৮৩৮) ফারসী ভাষা বিলুপ্ত করে ইংরেজীকে সরকারী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী-বাংলা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও পরিকল্পিতভাবে প্রতিকূল অবস্থায় ঠেলে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও মুসলমান ছাত্ররা ইংরেজী পড়ার ব্যয়-সংকুলান সামর্থ্যের বাইরে বিধায় ঐ ভাষা শিক্ষার আগ্রহ দেখায়নি। এর ফলে বিচার

---

[৭০] এম,এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ-১০৫।
[৭১] কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ,১৯৬৯,পৃ-৯।
[৭২] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৪৩।
[৭৩] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন সহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা,পৃ-২১।
[৭৪] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-৮১।

বিভাগে, চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮) আইন করেন, যারা ইংরেজীতে পারদর্শী ও ইংরেজীতে ডিগ্রীধারী তারাই কেবল চাকুরীতে যোগ্য বিবেচিত হবে।

এই প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

10 October, 1841, Resolution No.1

-----that in every possible case a preferance shall be given to those who have been educated in institutions thus establishd (Zillah Schools and Central College) and especially to those who distinguished themselves there in of a more than a ordinary degree of merit and attainments.[৭৫] ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিন্টন মেকলের পরামর্শ মোতাবেক আইন পাশ হয়, শুধুমাত্র ইংরেজী স্কুল ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহিত ৭ই মার্চ, ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার প্রস্তাবটি ছিল Giæct Lordship in Council is one of the opinion that great of the British Government ought to be promotion of European Literature and science amongest the natives of India, an all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English educaion alone.[৭৬]

১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৯৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালে সরকারী ভাষার পরিবর্তন আইন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন– পর্যায়ক্রমে এসব আইনের ফলে মুসলমানের দুর্দিনের সীমা অতিক্রম করে; এ সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলকাতার সম্ভ্রান্ত-মুসলমান, শিক্ষক, মৌলবী, মুন্‌শীসহ আট হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র

[৭৫] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৩২।
[৭৬] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩

সরকারের কাছে পেশ করা হয়[৭৭]। ঐ আবেদন পত্রে সরকারের প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়।

সরকারের এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তসমূহ থেকে নীতিগতভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় আলোচনার পথ রুদ্ধ করে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো, মুসলমান ছাত্রকে কোনঠাসা করা এবং নেপথ্যে এ ব্যবস্থাপনার মূল টার্গেট হলো খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা । বলা যায়, খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা এই অবস্থার পরিবর্তনের মূল হোতা। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান জানাচ্ছেন ঃ

''এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁদের (খ্রীস্টানদের) অবদানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও একথা বলা যায় যে, তাঁরা এদেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিলেন। মিশনারীদের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার অনুসঙ্গ হয়তো একনিষ্ঠ মনে বিভ্রান্তি ও বিরুপতার সৃষ্টি করেছিল। এই মনোভাব হিন্দু সমাজের মধ্যেও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু অধিকাংশের আর্থিক সঙ্গতি ছিল বলে বাঙ্গালী হিন্দু ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেন। আর তার অভাবে বাঙ্গালী মুসলমান পিছিয়ে পড়লেন''[৭৮]।

বৃটিশ বেনিয়ার প্রশাসনিক আইন, বাণিজ্যনীতি ও শিক্ষানীতির কষাঘাতে জর্জরিত মুসলমান-অভিজাত শ্রেণী সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সে তুলনায় সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও বিত্তহীন জনতার অবস্থা তো আরো মারাত্বক। অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ-মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘুর্ণিপাকে নিষ্পেষিত হয়ে তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে। বেঁচে থাকার এতটুকু মাধ্যম যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে উচ্চ বেতনে (ইংরেজী) শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন প্রহসনই বলা যায়।

এডামের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম; বর্ধমান, দক্ষিণ-বিহার ও ত্রিহুত এই পাঁচটি জেলায় ফার্সী ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৭১৫ জন। ১৮৭২-৭৩ সালে চব্বিশ পরগনা,

[৭৭] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৪৪-৪৫।
[৭৮] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

নদীয়া, যশোর ও কলকাতায় এই ৪টি জেলায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ ও ৮ জন[৭৯]।

১৮৬৯ সালে অন্য একটি পরিসংখ্যান দেখা যায়, ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটির ঔষধ-বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট উপাধিপ্রাপ্ত মোট চার জন ডাক্তারের মধ্যে তিন জন হিন্দু ও একজন খ্রীস্টান, মুসলমান একজনও নেই। মেডিসিনে ব্যাচেলর ডিগ্রীপ্রাপ্ত মোট ১১ জনের মধ্যে ১০ জন হিন্দু ও ১ জন ইংরেজ; মুসলমান মাত্র ১ একজন। এল.এম.এফ. ডিগ্রীধারী মোট ১০৪ জনের মধ্যে ৬৮ জন হিন্দু, ৫ জন ইংরেজ; মুসলমান মাত্র ১ জন। আইনজীবী হিসেবে যারা সার্টিফিকেটধারী তাদের সংখ্যাঃ ১৮৩৮ সালে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত সংখ্যার সমান, যেখানে ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সালের সনদ প্রাপ্ত ২৪০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ২৩৯ জনই হিন্দু, একজন মাত্র মুসলমান[৮০]।

মুসলমানরা মাতৃভাষা শিক্ষায়ও হিন্দুদের থেকে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। তার সুস্পষ্ট কারণ ও রয়েছে। প্রথমতঃ সংস্কৃত বহুল বাংলা ভাষা তাদের জন্যে অবোধগম্য, দ্বিতীয়ঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল পৌত্তলিকতাপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ, তৃতীয়তঃ হিন্দি-স্কুলের পরিবর্তে বিকল্প স্কুল না থাকায় মুসলমানরা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ রয়ে যায়। উইলিয়াম এডাম মুসলমানদের উর্দু স্কুল চালু করার জন্য এবং মুসলমানদের উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে সুপারিশ করলে সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না[৮১]।

বৃটিশ-রাজের উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ভাবে শিক্ষা নীতিকে ঢেলে সাজানো ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শত্রুতার মানসে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা অনেক পিছিয়ে যায়। ১৮৪১ সালে বাংলার স্কুল-কলেজে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪,০৩৪ জনের মধ্যে হিন্দু ৩,১৮৮ জন ও মুসলমান ৭৫১ জন। ১৮৬৪ সালে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪,৫৩৭ জনের মধ্যে হিন্দু ৩,৮৪৬ জন এবং মুসলমান ৬০৬ জন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫১ সালে ৪,৬৭৪ জনের মধ্যে হিন্দু ৩,৮১৪ জন এবং মুসলমান ৭৯৬ জন। ১৮৫৫-

[৭৯] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৩৩।
[৮০] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-৮৩।
[৮১] A.R Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal, Dhaka, Bangla Academy,1977, P-161-165.

১৮৫৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায়- মোট ৭,২১৬ জন হিন্দু এবং ৭৩১ জন মুসলমান[৮২]।

বৃটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য স্পষ্ট কোন শিক্ষানীতি গ্রহণ না করলেও শাসকগোষ্ঠীর এই আশংকা ছিল যে, শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে ধর্মপ্রাণ জনসাধরণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। তাই, খ্রীস্টান মিশনারীরা এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুললে কোম্পানীর লোকেরা তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি, বরং মিশনারীদের বাঁধা দিয়েছিলেন এই লক্ষ্যে যে, ধর্মভীরু ভারতীয়রা ক্ষিপ্ত হবে[৮৩]। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসক রাজ্যহারা মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত মনে করে বিদ্রোহ দমন করতে তাদের চার কোটি টাকা খরচ করতে হয়। দমননীতির কারণে মুসলমানদের দারিদ্র্যতা, শিক্ষার অভাবে পশ্চাৎপদতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শাসকদের মনোজগতে পরিবর্তন আসে। ঠিক ঐ সময় মেধাবী, বিচক্ষণ ও উদ্যমী পুরুষ, বাংলা থেকে আব্দুল লতিফের পর আমির আলির আবির্ভাব হয়। তাঁদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য থাকলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করেন। আব্দুল লতিফ ও আমির আলি ব্যক্তিগত ভাবে (মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন') সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন[৮৪]।

নবাব আব্দুল লতিফের শিক্ষা-তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, ধর্মানুরাগী মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যৌথ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্যে তিনি ইংরেজী শিক্ষার অপরিহার্যতা একদিকে যেমন গুরুত্বের দাবীদার মনে করেছেন, অন্যদিকে ধর্মীয়-জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনের জন্যে আরবী-ফার্সী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিকীকরণ করে ইংরেজী পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা কায়েম করেন।

---

[৮২] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-৮৫-৮৬।

[৮৩] Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities, Chittagong:The Mehrub Publication.1965, p-2.

[৮৪] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৮১

আব্দুল লতিফ অনূদিত 'এ শর্ট একাউন্ট অব মাই হাম্বল এফার্টস টু প্রমোট এডুকেশন স্পেশালী দি মহামেডানস' (১৮৮৬) গ্রন্থে শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়[৮৫]। হাজী মুহাম্মদ মহসীন ফান্ডের টাকায় (১৮৩৬) স্থাপিত ও পরিচালিত হুগলী কলেজের দুর্দশা উত্তরণে আব্দুল লতিফের অবদান বিশেষ প্রশংসার ভাগী। সেখানে দীর্ঘকাল হিন্দু ছাত্রদের দৌরাত্মা থাকায় মুসলমানদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়।

১৮৬১ সালে আব্দুল লতিফ বিষয়টি অতি বিচক্ষণতার সাথে সরকারকে অবহিত করেন। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী মহসিন-তহবিলের টাকা থেকে সরকার ১৮৭৪ সালে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। মাদ্রাসা সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও স্থাপিত হয়। আব্দুল লতিফের সুপারিশে সরকারে পক্ষ থেকে দেখে সব কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ এই ফান্ড থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারী জিলা স্কুলগুলোতে আরবী ও ফার্সী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়[৮৬]।

আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টার ফল সরকারের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং সেখানে হিন্দু মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্ররা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে তিনি ১৮৭৩ সালে কেন্দ্রীয় টেক্স্টবুক কমিটির সদস্য হিসাবে গ্রন্থ নির্বাচনে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হন। হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম সম্বন্ধে বিষোদাগার করে পাঠ্যসূচি হিসেবে 'দি স্পেস্টর', দি তালিসম্যান', 'রিফ্লেকশন ইন একজাইল' প্রভৃতি রচনার মধ্যে আপত্তিকর বিষয়গুলো বিয়োগ করে দিতে তিনি পরামর্শ দেন[৮৭]।

১৮৮২ সালে লর্ড রিপন উইলিয়ম হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনে আব্দুল লতিফ যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা হলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাধারণ বা নিম্ন

---

[৮৫] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮১।
[৮৬] মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-৯০
[৮৭] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-৪৮২।

শ্রেণীর মাধ্যম হবে বাংলা এবং অভিজাত ও মধ্যবিত্তের জন্য হবে উর্দু[৮৮]। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবাব আব্দুল লতিফ একজন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি সৈয়দ আহমদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। ফলে ১৮৮১-৮২ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে অধ্যয়নরত কলেজের শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলমান ছিল ১০৬ জন, অন্যদিকে মাদ্রাজে ছিল ৩০ জন, বোম্বেতে ৭ জন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ২৯ জন, অযোধ্যায় ৭ জন এবং পাঞ্জাবে ছিল ১৩ জন। আবার বাংলার হাইস্কুল গুলোতে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৮৩১ জন, মাদ্রাজে ১১৭ জন, বোম্বেতে ১১৮ জন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৬৯৭ জন এবং পাঞ্জাবে ছিল ৯১ জন[৮৯]।

উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে ও আব্দুল লতিফের নিরঙ্কুশ অবদান উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

বাংলা-ভারতের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৈয়দ আমির আলির অবদান চির স্মরণীয়। সুযোগ্য পিতা সৈয়দ সা'দাত আলির সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের ইতিহাস তথা ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর মনে অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। আধুনিক শিক্ষার অভাবে সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান এবং ইংরেজ কর্তৃক মুসলমান জনসাধারণের প্রতি অবহেলা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। পূর্ববর্তী মনীষী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আব্দুল লতিফের ইংরেজ তোষণনীতি বা রাজভক্তি নীতিতে তিনি বিশ্বাসী না হয়ে স্ব-গঠিত সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮১৮)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এবং শিক্ষানীতিকে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক শিক্ষা চালু করার জন্য গঠনতান্ত্রিক সংগ্রাম করা তার দায়িত্ব মনে করেন[৯০]। মার্কুইস অব রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকপত্রে' তিনি ফার্সী বা উর্দু ভাষার বিরোধিতা করে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম এডুকেশন

[৮৮] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ-২৫।
[৮৯] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী,১৯৯৩, পৃ-১০৮।
[৯০] পূর্বোক্ত, পৃ-১১১।

কনফারেন্স'র প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি মাদ্রাসাগুলো উঠিয়ে দিয়ে সেই অর্থে আলিগড় কলেজের আদর্শে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন[৯১]।

বাস্তবতার নিরিখে, সৈয়দ আমির আলি ধর্মীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উদারনীতি ও প্রগতিশীল ভাবধারায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য নবাব আব্দুল লতিফ সৈয়দ আমির আলির শিক্ষার-পদ্ধতির প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করলেও ঊনিশ শতকের সাতের দশকের পর মুসলিম-শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

আব্দুল লতিফ ও আমির আলী ব্যতীত আরো যাঁরা মুসলিম-সমাজে শিক্ষার প্রসারে অকুণ্ঠ অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁরা হলেন ওবায়দুল্লাহ ওবায়াদী (১৮৩২-১৮৮৬), সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২), স্যার আব্দুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪), আব্দুল আজিজ বিএ (১৮৬৩-১৯২৬), হেমায়েত উদ্দীন আহমদ বিএ (১৮৬০-১৯৪১) প্রমুখ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ[৯২]। তাঁরা কেউ লেখনীর মাধ্যমে কেউবা সভা-সমিতি করে, আবার কেউ স্কুল কলেজ স্থাপন করে শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

অপরদিকে, ধর্মীয় ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্ব-সমাজের জন্য যারা নিঃস্বার্থ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭), মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুপ আলী (১৮৫৯-১৯২০), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখ সুকণ্ঠে বক্তৃতা দানকারী ব্যক্তিত্বদের নাম অদ্যাবধি উজ্জ্বল হয়ে আছে[৯৩]। তাঁরা সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষের অসুবিধা, সমস্যাবলী অনুধাবন করে সেগুলো থেকে পরিত্রাণের পথ ও পদ্ধতির দিশা দিতেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান দান করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি শিক্ষার যথার্থ গুরুত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করতেন।

---

[৯১] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-১১১।
[৯২] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮৩।
[৯৩] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮৫।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণের জোয়ার দেখা গেল। পরবর্তীতে আর্থিক সংকট উত্তরণ মানসে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ধ্বজাধারী অনেক মুসলমানও খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি শুধু আকৃষ্ট হয়ে ক্ষান্ত হলো না-অবগাহিতও হলো। মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনের মুহূর্তে যে কালজয়ী পুরুষ খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে নেমেছিলেন তিনিই হলেন যশোরের মুনশী মেহেরুল্লাহ। তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের ভন্ডামী ও অসারতার মুখোশ খুলে দিয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও গ্রহণযোগ্যতা আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার পূর্বেই ৪৬ বছর মতান্তরে ৫১ বছর বয়সে এই মুজাহিদ পুরুষটির কর্মময় জীবনের অবসান ঘটলো। এরপর মুনশী মেহেরুল্লাহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করলেন মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন। মুনশী জমিরুদ্দীনের জিহাদের হাতিয়ার এটাম বোমা নয়, নয় কোন পারমানবিক বোমা। খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে তিনি কলমযুদ্ধ ও বাক যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কুপোকাত করতে সার্থক ভূমিকা রাখেন। তিনি মুসলমান সমাজকে জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষাসহ শিক্ষার উপকারিতা, সমাজ উন্নতির উপায়, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ স্থাপন, ধর্মীয় জ্ঞান, ব্যায়ামচর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হন[৯৪]।

ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থা

বাংলা-ভারতে হিন্দু ও মুসলমান আবহমান কাল থেকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। অথচ এই উপমাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়-উদারনীতি, সামাজিক-সাম্যবোধ এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রজা সাধারণ কে প্রভাবিত করার প্রয়াস পায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন নামক একজন পরিব্রাজক মন্তব্য করেছেনঃ

> ইসলাম বাংলার আইন-স্বীকৃত ধর্ম হলেও একজন মুসলমানের অনুপাতে ভিন্ন ধর্মালম্বী লোকের সংখ্যা হচ্ছে একশত জন। সরকারি কাজে উভয় সম্প্রদায় হতে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী

[৯৪] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, পৃ-৪৪।

ধর্মাচরণ করতে পারেন এবং ধর্মের নামে নির্যাতন তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত[৯৫]।

ভারতীয়রা বর্ণগত নিপীড়নের অবসান লক্ষ্যে মহত্তর আদর্শ ও শিষ্টাচারীতার সন্ধানে এবং মুসলমান সুফী-দরবেশদের সারল্য ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ নীতির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিল[৯৬]। ধর্মমত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সকলের মনের পরিবর্তন হয়নি বরং পূর্বকালের অনেক সংস্কার ও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। আনিসুজ্জামান জনৈক ইউরোপীয় গবেষকের উদ্ধৃতি সংকলন করে আরো চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন— ভারতে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের চারটি পথ নির্ণয় করেছেন। এগুলো হচ্ছে ঃ

''হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রীগণ মুসলমানদের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল), মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম— মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির এবং ধর্মান্তর গ্রহণে অসম্পূর্ণতা (ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ)''[৯৭]।

এসব কারণে ইসলাম গ্রহণ করেও নওমুসলিমদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস, ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দিওয়ালীর মত উৎসবে যোগদান এবং মুসলমান ফকিরদের মাথায় চাঁদি কমানো ও সর্ব্বদেহ ভস্মাচ্ছাদিত করার রীতি প্রভৃতি দেখা যায়[৯৮]।

বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমান শাসক, বিজেতা, পীর-দরবেশ, উলামা-মাশায়েখ ও ধর্ম-প্রচারকগণ অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এ

---

[৯৫] ডঃ এম,এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ-৩১২।

[৯৬] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪।

[৯৭] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৪।

[৯৮] Murray T. Titas, Indian Islam, Oxford,1930, P-169.

কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এঁরা প্রধানতঃ সুফী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন[৯৯] ।

যে বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছিল তাঁরা ও ইসলাম-সম্মত সকল আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করেননি। এ দেশের বাসিন্দাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা হাসিলের জন্যে[১০০] তবে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাই যে শুধু স্ব-ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন তা নয়; উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও অনেক সময় রাজপদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করত ।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেনঃ

হিন্দুকুল কেহ যেন হইয়া ব্রাক্ষণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ পর্যটক দুয়াতে বার্বোসা লিখেছেনঃ

‘‘প্রায় প্রতিদিনই কিছু ধর্মহীন লোক শাসকদের অনুগ্রহভাজন, বিশেষ করে অনুগ্রহভাজন হয়ে রাজপদ লাভের জন্য অনেকেই মুসলমান হত। তাছাড়া সুলতান-সুবেদার-নবাবরা অনেকেই সুফী, দরবেশ প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ‘মসজিদ-মাদ্রাসা-দরগা-সরাইখানা’ প্রভৃতি স্থাপন করার জন্য ভূমিদান এবং অর্থ সাহায্য করতেন। সরাইখানা এবং খানকাগুলিতে আশ্রয় ও ভোজনের ব্যবস্থা থাকত। রাজ এবং অভিজাতদের সক্রিয় সহায়তায় পীর-ফকিরেরা অনেক

[৯৯] ডঃ এম,এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড,মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ পৃ-১৪০।

[১০০] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৪ ।

সময় পুকুর কাটতেন, চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন। এসব সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করত''[১০১]।

মোগল শাসনামলে বাংলার সঙ্গে বহির্বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবাদে যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফলে পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকত্বের ব্যাপারে মুসলিম শাসকগণ হিন্দু ও স্ব-সমাজের মধ্যে তেমন কোন তারতম্য করতেন না। নবাব পরিবারে হিন্দুয়ানী আচার-অনুষ্ঠান যেভাবে পালন করত, তা থেকে এ সমন্বয়ের ব্যাপারটা অনুধাবন করা যায়[১০২]। সমসাময়িক কালের জনৈক ইংরেজের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, নবাব আলিবর্দী হিন্দুদের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদার-তদারকী করতেন এবং তিনি তাদের সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিকে নিজের মত করেই মূল্যায়ণ করতেন। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পালনে আগ্রহী ছিলেন। বাংলায় সুবাদার যুবরাজ আজিম-উশ-শান হিন্দু প্রজাদের হোলি উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু রাজাদের মত জাফরানি রং-এর পাগড়ি ও লাল রঙের পোশাক পরিধান করে প্রাসাদে বসতেন[১০৩]। নবাব আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বাংলায় দিওয়ান শাহমত জঙ্গ মতিঝিলের প্রাসাদে সাতদিন যাবৎ জাঁকজমক সহকারে হোলি উৎসব করেন[১০৪]। নবাব সিরাজুদ্দৌলা কলকাতা বিজয় করে প্রত্যাবর্তনের পর হোলি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেন। নবাব মীরজাফর পাটনার হোলি উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্ণিয়ার নায়েব সুবাদার ও নবাব আলিবর্দীর জামাতা সৈয়দ 'বাসন্তী পঞ্চমী'র আনন্দোৎসবে যোগদান করেন[১০৫]। তবে বঙ্গীয় শাসকবর্গ ধর্ম প্রচারে নিজেদেরকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট করেননি সত্য, কিন্তু তাঁরা পীর-দরবেশ-মাশায়েখদেরকে সকল রকম সুযোগ সুবিধা দান করেছেন এবং সম্ভব সব উপায়ে উলামা ও ধর্ম প্রচারকদেরকে তাঁদের আধ্যাত্মিক, প্রচারমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজে উৎসাহ ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন[১০৬]।

---

[১০১] ডঃ নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃ-৯।
[১০২] ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৪।
[১০৩] ডঃ এম,এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ-৯৩।
[১০৪] Jagadish Narayan Sarkar, Islam in Bengal, Calcutta: Ratna Prokashani,1972, P-49.
[১০৫] ডঃ এম,এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড,পৃ-৯৩।
[১০৬] ডঃ এম,এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড,পৃ-১৪০

লখনৌতি বিজয়ী প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী রাজ্য বিজয়াভিযানের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এ মাদ্রাসাগুলোতে মুসলমানদেরকে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। মুসলিম সুফী ও দরবেশদের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে খানকাহও নির্মাণ করেন[১০৭]। যে সকল মুসলমান ধর্ম প্রচারক হিসেবে এদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন এবং যেসব মুসলিম বিজেতা ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসন করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মুসলমান সমাজের কেন্দ্র বিন্দু। একনাগাড়ে সাড়ে পাঁচ শত বছর যাবৎ মুসলমানরা এদেশ শাসন করার সুবাদে তাঁরাই এখানকার শাসনকর্তা, সুলতান-সুবেদার বা নবাব ছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয়ের পর শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। ক্ষমতাচ্যুতির কারণে মুসলমানদের শুধু রাজনৈতিক পতন হয়নি; বরং তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে।

ইংরেজদের একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যে, যে সমস্ত দালাল-গোমস্তা প্রতিনিধির সাহায্যে তারা এদেশের স্বাধীনতা হরণ করে রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করেছে, তাদেরকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে করে মুসলমানরা ভবিষ্যতে আর কোনদিন স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শক্তি অর্জন করতে না পারে। হ্যাস্টিংসের ভূমি ইজারা দান-নীতি ও কর্ণ ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-নীতি তাদের অন্যতম পলিসি[১০৮]। এই নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে হিন্দুরা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অপরদিকে বাঙালী মুসলমানরা একটা বিজেতা জাতি হিসেবে এত সহজে তাঁদের স্বাধীন যুগের পরিবর্তন গ্রহণ করতে রাজী ছিল না[১০৯]। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে গোটা মুসলিম জাতি অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়। দারিদ্র ও শিক্ষা বিমুখতা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী।

---

[১০৭] আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা-আধুনিক প্রকাশনী, পৃ-১৩০।
[১০৮] আববাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা-বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ-৯৮।
[১০৯] উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস,পৃ-১১৭।

শাসন ক্ষমতা হারিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উত্থান রহিত হয়ে, জমিদারীচ্যুত হয়ে, লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়ে, আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে ইংরেজ শাসনামলে বাংলার মুসলিম সমাজ অবলুপ্তির দ্বার প্রান্তে উপস্থিত। এই সর্বহারা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের করুন চিত্র ঊনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত হতাশা গ্রস্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। ফলে হিন্দু-ধর্ম ও সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজে ধর্ম-বিকৃতি, কুসংস্কার, অবিশ্বাস, পৌত্তলিক ভাবধারা, শিরক-বিদআত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ চরমভাবে অনুপ্রবেশ করে।

বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত নও-মুসলিম। একজন পৌত্তলিক ইসলাম না বুঝে মুসলমান হলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে পারে না। পৌত্তলিকতার অসারতা ও তার বিপরীত ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ তার হয়নি। তারা শুধু জানত, মুসলমান হতে হলে ঈমান গ্রহণ করতে হয়, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত আদায় করতে হয়। এর বাইরে ইসলামী মূলনীতি সম্বন্ধে তারা অবহিত নন। তাদের ধারণা ছিল— নতুন ধান উঠলে নবান্ন করতে হয়, পৌষ মাসে পোষলা করতে হয়, কালী পূজার রাতে ভাত না খেয়ে ফল-মূল বা মিষ্টি খেতে হয়। গর্ভবতী নারীদের হনুমান বা বাঁদরের দিকে তাকানো নিষেধ, সন্তানের মঙ্গলের জন্য শীতলাকে সন্তুষ্ট করতো, সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মণসাকে সন্তুষ্ট রাখতো, মশা-মাছির উপদ্রব কমাতে বিজয়া-দশমীর সন্ধায় মোড়ের মাথায় সাঁঝাল দিতো, কলেরার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওলা দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতো, ভূত-প্রেত্নীসহ দুষ্ট শক্তির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝাঁড়-ফুক, তুক-তাক, তাগা তাবিজ, জল পড়া প্রভৃতি হিন্দুয়ানী আচার-বিশ্বাসের ভাবধারা মুসলিম সমাজে প্রচলন হয়েছিল[১১০]। হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অনুকরণে মুসলমানরা মহররমের অনুষ্ঠান পালন করতো। দুর্গোৎসব যেমন দশ দিনব্যাপী চলে এবং শেষ দিন ঢাক-ঢোল-বাদ্যবাজনাসহ পূজারীগণ প্রতিমা নিয়ে মিছিল করতে করতে তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলমানগণও অনুরূপভাবে দশদিন ধরে মহররমের উৎসব পালন করে এবং

[১১০] ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৯।

শেষদিন দুর্গা বিসর্জনের ন্যায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তাজিয়া পানিতে বিসর্জন দেয়[১১১]। জারি গানের মাধ্যমে ফাতেমা, হাসান-হোসেন এবং কারবালার যুদ্ধের কাহিনীর সঙ্গে তারা তাজিয়া গাইত। লাইলী-মজনু, শিরী-ফরহাদ প্রভৃতি রোমান্টিক প্রেমের গল্পও বলত। কিন্তু এগুলোই তাদের গল্পের ক্ষুধা নিবারণ করতে যথেষ্ট ছিল না। মহাভারতের অনুবাদক সে যুগের কবি তাই লিখছেন-তারা রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের অনুবাদক রিখেছেনঃ

হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রাসূলের কথা কেহ না সোঙরে[১১২]।

আল্লাহ-রাসূলের কথা যাতে স্মরণ করে তার জন্যে হিন্দু পুরোহিত শ্রেণীর অনুকরণে মোল্লা শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এরা গ্রামবাসীদের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম সম্মন্ধীয় উপদেশ দিত, বিয়ে-শাদী পড়াতো, ঝাঁড়-ফুঁক দিত আবার মুরগী-ছাগল যবেহ করত।

এই প্রসঙ্গে মুকন্দরামের ভাষায় বলা যায়ঃ

মোল্লা পড়ায় নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়ায়
করে ধরি খর ছুরি কুকুরা জবাই করি
দশ গন্ডা দান পায় কড়ি[১১৩]।

দেওয়ানী কালীপূজার অনুকরণে মুসলমানগণ শবেবরাতে আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়ানোর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতো। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর ও পরবর্তী শাসক-গোষ্ঠী প্রকাশ্যে হিন্দুর পূজা-পার্বনে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি[১১৪]। শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে নয় সাহিত্য-শিল্প চর্চার বেলায় মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম, আচার-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হিন্দু

---

[১১১] Jagadish Narayan Sarkar, Islam in Bengal,p-38.
[১১২] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস,২য় খন্ড, কলকতাঃ ১৯৮৭, পৃ-২৩৫।
[১১৩] পূর্বোক্ত, পৃ-২৩৬।
[১১৪] আববাস আলী খান, পূর্বোক্তি, পৃ-৬২।

শাস্ত্র ও পুরাণ হলো শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, আলাওয়াল প্রমুখ মুসলমান কবির শিল্প-প্রেরণার উৎস[১১৫]।

মুসলমান শাসকগণ রামায়ন-মহাভারত-ভগবতের উক্তির প্রতি ছিলেন অনুরাগী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর বঙ্গানুবাদ হয়। সুলতান রোকনুদ্দিন বরবক শাহ কুলীন গ্রামের মালাধর বসুকে ভগবতের দশম-একাদশ ছন্দের বাংলা অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র জন্য গুণ রাজখাঁ উপাধীতে ভূষিত করেন।

হোসেন শাহের পৌত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ দ্বিজ শ্রীধরকে দিয়ে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়েছিলেন[১১৬]। সুলতানদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের অধীনস্ত রাজা-জমিদার সামন্তরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রভাবিত করতেন।

বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্ম-বিকৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় বাউল-ফকির এবং মরমী গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ তার অন্যতম। বাউল সম্প্রদায় কোন শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী নয়। তারা বাছ-বিচার মানে না।

তাই লালন ফকিরের ভাষায় বলতে হয়ঃ

সব লোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারেতে?
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না দু'চোখেতে[১১৭]।

মসজিদ ও মন্দিরকে তারা তাদের সাধন পথের অন্তরায় জ্ঞান করেন। বাউল শ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০)[১১৮] মতে প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই প্রেমাস্পদ-পরমাত্মা (যাকে 'মনের মানুষ' বলেছে) বাস করে। তার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলনের অনুভূতি হয়।

বাউল কবি প্রেমাস্পদকে বলেন-

তোমার পথ চাইকাছে মন্দিরে মসজিদে,

---

[১১৫] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজ চিন্তা, পৃ-৪৮।
[১১৬] জগদীশ নারায়ণ সরকার, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক,পৃ-২১।
[১১৭] ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৯১।
[১১৮] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ-৪৮।

তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুখে দাঁড়াই গুরুতে মুরশেদ[১১৯]।

বাউলের সাধনা, মনের মানুষের খোঁজের সাধনা। অচিন পাখির পায়ে বেড়ী পরানোর সাধনা।

বাউল কবির আবৃত্তি উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন বেড়ী খান
দিতাম তাহার পায়[১২০]।

এই সাধনায় কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। তাই বাউলের কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী নয়। তারা হিন্দুও না, মুসলমানও না- তারা শুধু মানুষ। কেননা মানব ধর্ম তাদের কাছে মূখ্য বিষয়।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইংরেজ শাসনের ঊষালগ্ন থেকে বাংলার মুসলমানগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। তাঁরা মুসলমান হয়ে ও ধর্মীয় সংস্কারের অভাবে অন্য ধর্মের (হিন্দু) রীতিনীতি তাঁদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসে। অনেক মুসলমান পরিব গা গার 'মা শীতলা দেবীর'র পূজা করতে কুণ্ঠাবোধ করতে না[১২১]। ১৯১১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে; যারা না হিন্দু না মুসলমান, উভয় ধর্মাশ্রিত তাদের আচার-অনুষ্ঠান[১২২]।

সেকালে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ও বিশেষ করে গ্রাম্য স্কুল-পাঠশালায় হিন্দু গুরু-মহাশয়ের আধিপত্য ছিল প্রবল। পাঠ্য পুস্তকে ইসলামী চেতনা সম্বলিত কোন গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ ছিল না বললেও চলে। স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে মুসলমান ছাত্রদেরও বিভিন্ন দেব দেবীর স্মরণ করতে হতো। বিশেষ করে দেবী সরস্বতীর বন্দনা আবৃত্তি ও কণ্ঠস্থ করত।

---

[১১৯] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত,পৃ-২৭২।
[১২০] ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৯১।
[১২১] A.R Mallick, op cit, P-7.
[১২২] Cnsus of India Rport,1911, Vol-1, Part-1, P-118, A.R Mallick, op,cit, P-7.

সরস্বতী দেবীর উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের বলতে হতোঃ

সরস্বতী ভগবতী মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব মোরা যাই ঘর।
ঝিকিমিকি ঝিকিরে সবর্ণের চক,
পাও দোও নিয়ে চল জয় গুরুদেব[১২৩]।

স্কুল ছুটি হওয়ার সময় গুরুদেবকে নমস্কার জানিয়ে সবাইকে ঘরে ফিরতে হতো। কেউ সালাম-আদাব জানালে তাকে কঠিন উত্তম মধ্যম দেওয়া হতো। এমনকি হিন্দু গুরু-মশাই ও জমিদার বাবুদের প্রবল আধিপত্যের দরুন মুসলমান ছেলেমেয়েদের নামও পরিবর্তন হতে থাকলো। ইসলাম ও মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত হানতে লাগলো আধিপত্যবাদী হিন্দুরা[১২৪]। মুসলমানরা তাদের সন্তানদের পাঠ শুরু করার লক্ষ্যে 'বিসমিল্লাহখানী' অনুষ্ঠানের পরিবর্তে হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের আনজাম দিতো এবং আল্লাহর নামের স্থলে স্বরস্বতী দেবীর নাম উচ্চারণ করতে হতো[১২৫]। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান এভাবে শবে বরাত উৎসবে কালীপূজার আচরিক প্রভাব, ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম অনুষ্ঠানে জন্মাষ্টমীর প্রভাব, মুসলমান কর্তৃক মক্কেশ্বর শিবের পূজা, নিঃসন্তান মুসলিম মহিলার সন্তান লাভের আশায় চৈতন্য মেথুন মেলায় যোগদান ও শিবের ভোগ প্রদান প্রভৃতি আচরিক প্রভাব ধর্মীয় অবক্ষয়ের রূপ পরিগ্রহ করে[১২৬]।

উপমহাদেশের মুসলিম-সমাজ জীবনে 'শাস্ত্রীয় ইসলামে'র পরিবর্তে ' লৌকিক ইসলাম' অনুপ্রবেশ করেছিল পীরবাদের প্রবর্তনায়। আরব-ইরান-আফগান-তুরস্ক থেকে আগত বিদেশী মুসলমান কর্তৃক আনীত বাংলায় অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পীরমুরীদ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠার ফলে এদেশে প্রাচীন সূফী-মতবাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পীরবাদ জন্মলাভ করে। বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পীর-বাদ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, ইহাকে আজ শাস্ত্রীয় ইসলামের পরিপন্থী জ্ঞান করলে লৌকিক-ইসলামপন্থী বঙ্গীয় মুসলমানের

---

[১২৩] মেসাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃ-২৪৯
[১২৪] আবুল গফুর সিদ্দীকি, শহীদ তিতুমীর, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ-৮-৯।
[১২৫] মোঃ আফাজ উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ-৫০।
[১২৬] আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, পৃ-৩০।

নিকট তা মনে হয় ধর্মদ্রোহীতার শামিল। এ ব্যাপারে জেমস ওয়াইজের উক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়ঃ

১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত-এ পঞ্চাশ বছর পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ছিল রাখালবিহীন মেষ পালের মত। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস হতে বহু দূরে হিন্দু-ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন[১২৭]।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অদ্যাবধি পীর-পূজার, পীর-সেবার, পীর আচারের যেসব প্রথা প্রচলিত আছে সেগুলো বৌদ্ধদের চৈত-পূজার আনুষঙ্গিক আচারের প্রতিরূপ। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) সকল পীর পূজা, দরগা-পূজা ও গোর-পূজার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পৌত্তলিকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন[১২৮]।

যেসব মুসলমান মানসে প্রকৃত শাস্ত্রীয় ইসলামের শিক্ষায় উজ্জীবিত ও উন্মুক্ত হয়নি, ঐসব সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ যে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য উদার-মতাবলম্বী সূফী ও পীরদিগের পূজায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে তা নয়, বরং তারা এমন কতগুলো পীরের পূজায় ও আত্মনিয়োগ করেছে যাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। সোজা কথায় তাদেরকে কাল্পনিক পীর বলে অভিহিত করা যায়[১২৯]। কাল্পনিক পীর সম্পর্কে মুহাম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য একেবারে ফেলে দেয়া যায় না। তিনি উক্তি করেছেন– 'সম্ভবতঃ স্থানীয় হিন্দুদের গ্রাম্য দেব-দেবীগুলি মুসলমানদের হাতে পড়িয়া ইসলামী-পোশাক পরিয়া এই [কাল্পনিক-পীর] শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি কতিপয় বঙ্গীয় কল্পিত পীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও তুলে ধরেছেন। এসব কল্পিত পীরকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো খাজা-খিজির, বদর পীর, সত্যপীর, গাজীপীর, পঞ্চপীর প্রমুখ। জীবনের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং সকল সমস্যার সমাধানের জন্য উপরোক্ত পীরদেরকে ভজন করা হতো, নজর-নেওয়াজ প্রদান করা হতো[১৩০]। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঐতিহাসিক ভাবে সত্য অনেক পীর, ওলী-দরবেশের

---

[১২৭] James Wise, Notes on the Races Castes and Trades of Eastern Bengal, London: 1883,P-21.
[১২৮] মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাদী, সমাজ সংস্কার, আল এসলাম, মাঘ ১৩২৫, পৃ-৫৫২।
[১২৯] মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৮।
[১৩০] Jagadish Narayan Sarkar, op.cot, P-35.

আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের মাজার ও দরগাহকে কেন্দ্র করে আজো একশ্রেণীর মুসলমান পূজাপার্বন তথা শিরক-বিদআত করে থাকে। তাঁদের মধ্যে বাগেরহাটের খান জাহান আলী, রাজশাহীর শাহ মখদুম, সিলেটের শাহজালাল, মীরপুরের শাহ আলী বাগদাদী, সোনার গাঁয়ের খোন্দকার মুহাম্মদ ইউসুফ, বিক্রম পূরের আদম শহীদ, ঢাকার শাহজালাল, চট্টগ্রামের পীর বদর, মুন্নাশাহ দরবেশ প্রমুখ খ্যাতনামা পীর-ওলী-দরবেশ ও মাজার-দরগাহ লৌকিক ইসলামের জন্য প্রসিদ্ধ[১৩১]। চট্টগ্রামে হযরত বায়জীদ বোস্তামীর নামে একটি কল্পিত দরগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য সেখানে ফুলশির্নি ও নজর-নিয়াজ দিতো[১৩২]।

পতনযুগের শেষ দশকের দিকে বাংলার মুসলিম সমাজ ধর্মীয় অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার এমন এক শোচনীয় স্তরে নেমে যায় যে, বৈষ্ণবদের বিষ্ণুপদ পূজার মত মুসলমানরা ও মুহাম্মদ (সা) ও পীর-ফকীরের পদচিহ্নের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করত। ঢাকার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত একটি দরগায়, পান্ডুয়ার কদম রসুল এবং মুর্শিদাবাদের ইমাম বাড়ায় মুহাম্মদ (সা)-এর পদচিহ্ন (কদম রসূল) অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে[১৩৩]। 'কদম রসুল' নামে অনেক অট্টালিকা, ঢাকার নারায়ণগঞ্জের উল্টোদিকে নবীগঞ্জের কদম রসূলের অট্টালিকা, চট্টগ্রামের কদম মোবারক মসজিদও বাগিচাহাট মসজিদ প্রসিদ্ধ[১৩৪]।

ইসলামী শরীয়তে বৈরাগ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ অথচ সংসার বিরাগী হিন্দু সন্নাসীদের ন্যায় একশ্রেণীর তথাকথিত পীর-ফকির জীবন-যাপন করে থাকে। তারা ইসলামের নিষিদ্ধ গাঁজা-ভাং-আফিম-মদ প্রভৃতি নেশা করে। তাদের অনেকগুলো দল আছে। অর্জুন শাহী, জালালী, মাদারী এবং বেনওয়াজ এই চার শ্রেণীর ফকিরের দল বাংলায় আছে বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়[১৩৫]।

---

[১৩১] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৩-৫৪।
[১৩২] আববাস আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৩।
[১৩৩] ডঃ নজরুল ইসলাম খান, পূর্বোক্ত, পৃ-৬০।
[১৩৪] ডঃ আব্দুল করিম , বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস,পৃ-২৪২।
[১৩৫] Jagadish Narayan Sarkar, op.cot, P-37.

মুসলিম-বাংলার এই অধঃপতন যুগে যুগে শাস্ত্রীয় ইসলামকে পরিহার করে মুসলমানেরা লৌকিক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মরিচিকার ন্যায় হিন্দুদের অধিকাংশ অনুষ্ঠানাদির অনুকরণে নিজেদের ঐতিহ্য মানমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে কলংকিত করেছে। "শ্রীকৃষ্ণ যখন ষোল সহস্র গোপিনীর সঙ্গে প্রেমলীলা করেন তখন নারী গঙ্গা স্বরুপিনী এবং পুরুষ তাতে স্নানার্থী তীর্থযাত্রী। যখন তারা সঙ্গমে মিলিত হয় তখন তারা এক ও অভিন্ন।" এই লাম্পট্য প্রবৃত্তির সূত্র ধরে বাংলার একশ্রেণীর তথাকথিত পীর-ফকির আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতির জন্য তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ যৌন সঙ্গমকে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য যথেষ্ট মনে করে না। তাই তারা প্রকাশ্য ও গোপনে যত অধিক সংখ্যক বারাঙ্গনা কুলনারীর সঙ্গে তাদের ইচ্ছা পূরণ করে[১৩৬]। এসব অনাচার ও কদাচার থেকে নারীরাও বাদ পড়েনি। ফকির দলের পুরোহিত বা পীরেরা যখন তার মুরীদানের গ্রামে আগমন করেন তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমারী নারীরা উত্তম পোশাকে সজ্জিতা হয়ে পীরের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মদপানসহ নাচ-গানে মত্ত হয়ে যায়। তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল বন্যায় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে একাকার করে দিয়েছিল, যা প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। কারণ তখনকার মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল এই পৌত্তলিকতাবাদ ও বৈষ্ণববাদের প্রতি।

তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত যৌতুক প্রথা ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শরীয়াহ পরিপন্থী। অবশ্য হিন্দু সমাজের প্রভাবে এ প্রথা মুসলিম সমাজে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যৌতুকের দাবী অপূর্ণ থাকলে স্বামী গৃহে অনেক স্ত্রীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং কুমারী মেয়ের পিতামাতা কন্যা দায়গ্রস্থ হয়ে কন্যাকে অন্যায় পথে পা বাড়াতে সহযোগিতা করে। 'রায়হান' উপন্যাসের আমেনা স্বীয় শ্বশুরালয়ে যৌতুকের কারণে অমানুষিক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে ও নীরবে সহ্য করে নেয়[১৩৭]। এজন্য

[১৩৬] মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃ-১১৯

[১৩৭] ডঃ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, রায়হান, পৃ-৬১।

অনেকে মুসলমান কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে মেনে নিতে পারত না। ফলে হিন্দুদের অনুকরণে বহু মুসলমান কন্যা-দায়মুক্ত হতে কন্যা-সন্তানকে মেরে ফেলত।

বাংলার মুসলিম-সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল একটা ক্ষতিকর দকি। অপরিণত বয়সে মেয়েদের বিবাহের কারণে একদিকে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকত অপরদিকে সাংসারিক জীবন পরিচালনা করতে যেয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তো। সঙ্গত কারণে অকাল বৈধব্যের সংখ্যা ছিল আনুপাতিক হারে অনেক বেশী। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বাল্যবিবাহ প্রথার প্রতি চরম অনীহা প্রদর্শন করেছেন এবং এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বলেছেনঃ

''ইসলামে বাল্য বিবাহের অনুমতি থাকলেও তা আবশ্যিক নয়। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই কদর্য প্রথার অবসান হওয়া প্রয়োজন''[১৩৮]।

বহুবিবাহ প্রথা তখনকার সমাজের আরেকটি অভিশাপ। ইসলামী শরীয়াহ একাধিক বিবাহ অনুমোদন সাপেক্ষে যে মূলনীতি প্রণয়ন করেছে তার পূর্ণ নিশ্চয়তা না দিয়ে কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ-নীতি আলোচনা করতে যেয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পাত্র-পাত্রীর স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ ক্ষেত্রে পারস্পারিক মনোয়নের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন তিনি ঃ

''পাত্র পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর মনোনয়ন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান সম্মত। এরূপ মনোনয়ন বিবাহ ইসলামে অনুমোদিত।..... স্ত্রী যদি বন্ধা বা চিররুগ্ন হয়, তাহা হইলে একাধিক বিবাহ করা সঙ্গত। নতুবা একাধিক বিবাহ ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখের কারণ। বহুবিবাহ সহসা কোন ও সমর্থনযোগ্য নয়।.... পাঠ্য জীবনে কদাপি বিবাহ করিবে না। ..... যুবকদের পক্ষে ২৩/২৪ বৎসরের পূর্বে এবং মেয়েদের পক্ষে ১৪/১৫ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করা যুক্তি সঙ্গত নহে''[১৩৯]।

---

[১৩৮] ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা, পৃ-১৪৫ ।

[১৩৯] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'বিবাহ নীতি' আল ইসলাম, পৃ-৩৮২-৩৮৩।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার অনুকরণে মুসলিম সমাজের শ্রেণীভেদ প্রথার অশুভ ব্যবস্থাপনায় বাংলার মুসলমানেরা বিধবা বিবাহ ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার অনুমান করত[১৪০]। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মতে পুনঃবিবাহের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের উদাসিনতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমকালীন সমাজের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বহু সংখ্যক বিধবা নারী অগত্যা ব্যভিচারের পথ বেছে নেয়। এই প্রথার প্রতি কটাক্ষ করে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার' নামে একটি প্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি কয়েকজন বিধবা নারীর মানসিক যন্ত্রণা ও প্রচলিত সমাজের প্রতি তাদের অনাস্থার অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন[১৪১]। ভারতবর্ষে যারা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তন্মধ্যে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নাম শীর্ষে অবস্থান করেছে। এছাড়া মুনশী রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ সংগ্রামী পুরুষ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে অকুণ্ঠ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে তৎকালীন সময়ে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে আপন ছেলেকে বিধবা নারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[১৪২]। বংশ মর্যাদাবোধ সেকালের মুসলমান সমাজে একটি নিন্দনীয় অধ্যায় সৃষ্টি করে। অথচ ইসলামীয় শরীয়াহ বংশীয় কৌলিন্যকে "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের ঐ রবের ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন"[১৪৩] আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল বিদেশাগত কিছু সংখ্যক তুর্কী, আফগানী, ইরানী, আরবী মুসলমানদের হাতে। তারা নিজেদেরকে শরীফ বা আশরাফ বলে পরিচয় দিত। অন্যদের উল্লেখ করত আতরাফ বা আজলাফ-অনভিজাত হিসেবে। সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান এই চার শ্রেণীর লোকদের নিয়ে আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণী গঠিত ছিল[১৪৪]। হিন্দুদের বর্ণ-

---

[১৪০] আবুল হোসেন, 'আদেশের নিগ্রহ' আবুল হুসেনের রচনাবলী, পৃ-৭১।
[১৪১] মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার, পৃ-১৬৩।
[১৪২] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-৬১।
[১৪৩] মহাগ্রন্থ আল কুরআন, ৪ঃ১।
[১৪৪] খন্দকার ফজলে রাব্বি, বাংলার মুসলমানের উৎপত্তি, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত,পৃ-১৩০-১৩৯।

বৈষম্যবাদের সূত্র ধরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উপরোক্ত চার আশরাফ শ্রেণীকে বলা যায় একই গোল টাকার এপিঠ আর ওপিঠ[১৪৫]। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অনুকরণে মুসলিম উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেরা নিজেদেরকে আশরাফ বা অভিজাত মনে করত এবং কাজে কর্মে, ওঠা-সবায় সর্বক্ষেত্রে আতরাফদের নিকট থেকে দূরত্ব বজায় রাখতো। উচ্চ পেশাজীবীরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের পেশাজীবীদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতো। এরূপ উঁচু-নীচু বা ছোট-বড় ভেদাভেদ তৎকালীন সমাজ জীবনে এক দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টির করে।

মর্যাদার বৈষম্য সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রে সৈয়দরা সমগোত্রীয় সৈয়দ বরের অভাবে নিজ কন্যাদের চিরকুমারী করে রাখার উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়[১৪৬]।

হযরত মুহাম্মদ (সা) তথা আরবীয় বংশের দাবিদার মুসলমানগণ সৈয়দ নামে পরিচিত। বাংলায় এখনো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধর আছে কি না, সন্দেহ তবে সৈয়দ আছে। সম্মানীয় বংশ বলে অনেকেই সৈয়দ বলে পরিচিত হতে আগ্রহী। আফগান স্থানের লোকদের পাঠান বলা হতো— তাদের উপাধী হলো খাঁ। এদের অনেক ধর্মান্তরিত মুসলমানও খাঁ উপাধী নিয়ে পাঠান বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতো[১৪৭]।

অনভিজাত (আতরাফ) মুসলমানদের মধ্যেও অনেক গোত্র ছিল, যেগুলো বৃত্তিভিত্তিক বা বিভিন্ন কর্মজীবী। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ধর্মান্তরের পূর্বে তাদের যে বৃত্তি ছিল তা সাধারণত পরিবর্তন না করে বৃত্তির নামানুসারে সমাজে গোলা, জোলা, তাঁতী, দর্জি, হাজাম, নাপিত, কসাই, চাষী, মাঝি, মোল্লা, কামলা প্রভৃতি নামে অভিহিত হতো এবং তারা একে অপরকে নিজেদের অধঃস্তন মনে করতো[১৪৮]। মূলতঃ আশরাফ-আতরাফ যে বিভাজন ছিল তাও অপরিবর্তনীয় নয়। যে সব সম্ভ্রান্ত হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করতো তারাও আশরাফ শ্রেণীভূক্ত হতে পারতো। আবার নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে আতরাফ হতো; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা তারা

---

[১৪৫] ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, পৃ-১২।
[১৪৬] মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২।
[১৪৭] ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৬১-৬২।
[১৪৮] T.W Arnold, Preaching of Islam, London: 1935, P-218-253.

আশরাফ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারতো[১৪৯]। সেকালে নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে ওঠার প্রবণতা ছিল প্রবল। এই প্রবল প্রবণতা মুসলিম সমাজে বহুল আলোচিত, বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটির কথা শোনা যায়-গত বছর আমি একজন জোলা ছিলাম, এই বছর আমি একজন শেখ, আগামী বছর ভাল দর পেলে আমি একজন সৈয়দ হবো।

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের নামেরও সঙ্গে বড় বড় পদবী সংযোজন করা হতো। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে চলতি

এটি কথার প্রচলন রয়েছে-

আগে থাকে উল্লা শেষে থাকে উদ্দিন,
তালের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন[১৫০]।

কপাল ফিরলে যেমন নীচের তলার মানুষ উপরে যায় তেমনি কপাল পুড়লে ওপরের মানুষ নিচে চলে আসে। অবস্থার উন্নতির ফলে যেমন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করতো তেমনি অবস্থা পড়ে গেলে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হতো। এভাবে ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের পতন হচ্ছিল। এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে আলোকবর্তৃকা মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের আবির্ভাব হয়।

[১৪৯] ডঃ নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২-৬৩।
[১৫০] অমলেন্দ দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকতাঃ ১৯৯১, পৃ-১২৪।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম জাগরণের স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের চিন্তা জগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা মূলত: শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম দিকেই। একই সময়ে বিশ্ব রাজনীতি এবং চিন্তাধারায়ও দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯১১-১২ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে যে বিশাল আলোড়নের সূচনা হয়েছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণু তুর্কী সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন। তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়নি। জার্মানী, রাশিয়া ও ইতালীর লক্ষ্য ছিল, যে বলে বৃটিশ সাম্রাজ্য বলীয়ান, সেই বল ধ্বংস করা এবং যেহেতু সে পথে অন্তরায় ছিল তুর্কী সাম্রাজ্য সেহেতু এর বিলোপ সাধন করা। আবার যেহেতু তুর্কী সাম্রাজ্য ইসলামের অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীক 'খিলাফত' বক্ষে ধারণ করে আছে, সেহেতু বিশ্বের মুসলিম চেতনাতেও এক আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। তুর্কী সুলতান মুসলিম বিশ্বের খলিফা, অন্যদিকে খিলাফত ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইসলামকে ধ্বংস করাই যে ইঙ্গ-জার্মান-রুশ মতলব, মুসলিম বিশ্বে এ ধারণা উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু প্রমুখ মুসলিম পন্ডিতবর্গের সমগ্র মুসলিম বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ আন্দোলন 'Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ' নামে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে , 'Pan-Islamism' বা 'বিশ্ব ইসলামবাদ' বলতে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একই খলিফার অধীনে ন্যস্ত থাকবে অর্থাৎ একক খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে– এ কথা মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে বহু মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তথা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মুসলিম একই

সমাজভূক্ত থাকবে এবং তাদের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য মৌলিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট থাকবে, এটাই 'Pan-Islamism–এর মূল কথা[১]।

তুর্কী সাম্রাজ্য তথা খিলাফত ধ্বংসের উপরোক্ত পাশ্চাত্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে যখন পৃথিবীর অন্যসব তথাকথিত মুসলিম দেশ নিষ্ক্রিয়, তখন বৃটিশ শাসন-শৃঙ্খলিত ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। বাংলা-ভারতে শুরু হয়েছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলিম জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে এ প্রাণ চাঞ্চল্য ও সচেতনতাবোধ হঠাৎ করেই মুসলিমদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। অনেক সময়ের ব্যবধানে বহু ধাপ অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে তারা এ পর্যায়ে পৌঁছে। এতদ্‌বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে নব নব আদর্শ ও ভাবধারা জন্ম লাভ করে, সেগুলির প্রভাব এদেশেও পরিলক্ষিত হয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রধানতঃ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। হিন্দুরা বাস্তবমুখী মনোভাব গ্রহণ করে উৎসাহের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করেছিল, যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অভূতপূর্ব উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই তারা ইংরেজদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি ও নেক্‌নজর অর্জন করতে সক্ষম হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কলকাতার নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কিছু সংখ্যক উদারমনা ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ১৮১৬-১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে হিন্দুদের পরিচিত করা। বস্তুতঃ এই কলেজে ইংরেজির মাধ্যমে বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু যুবক সমকালীন ইউরোপীয় উদার নৈতিক ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু

[১] ডঃ প্রফেসর মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা-একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ", পৃঃ ৩৬-৩৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর এম,ফিল/পি,এইচ,ডি সেকসন হতে সংগৃহীত।

সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যা হিন্দু সমাজের অগ্রগতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার সাথে সাথে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলারও চর্চা করতে থাকে সমানভাবে। কলকাতার হিন্দুদের এই নতুন শিক্ষা-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে মফঃস্বল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।[২]

কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তারা ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ দিতে পারেনি। অবশ্য তাদের এ অমনোযোগিতার কারণ হিসেবে তাদের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, তারা ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি বাংলা ভাষার প্রতিও তারা ছিল উদাসীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- মুসলিমগণ কি সত্যি সত্যিই ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল? জবাবে বলা যায়- এমন ধারণা পোষণ করলে তাদের প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হবে। কারণ মুসলিমগণ জন্মগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হতেও অন্য যেকোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষানুরাগী ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো চুর্ণ-বিচুর্ণ হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। ইংরেজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইংরেজি স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করা ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, যা ঐ মুহূর্তে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এ ব্যাপারে তারা সরকারের সামান্যতম সহানুভূতিও আকর্ষণ করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজেও মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিলনা।[৩] মুসলিমদের প্রতি তাদের এ বিমাতাসুলভ আচরণই মূলতঃ এর জন্য দায়ী।

অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিমদের উদাসীনতার মূল কারণ ছিল অন্যত্র। এ প্রসঙ্গে A.R. Mallick-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, উইলিয়াম ক্যারীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। এ কলেজ

---

[২] সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১, সহ দ্রঃ A. F. Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835, Leiden, 1965, PP. 187-90.

[৩] W.W. Hunter, The Indian Mussalmans, op. cit., PP. 152-53.

স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের লোকজনকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। এতে সংস্কৃতি-ব্যাকরণ জ্ঞানলব্ধ এমন বাংলাভাষা শিক্ষা দেয়া হত, যা মুসলিমদের বোধগম্য ছিল না। তাই এ কলেজে তখন কোন মুসলিম ছাত্র ভর্তি হয়নি। এতদ্ব্যতীত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ সাল)-এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য ছিল। উক্ত সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় যেসব পাঠ্য পুস্তক ছিল, তার সবগুলোই ছিল হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত। যেমন-গুরু দক্ষিণা, অমর সিংহ, চাণক্য, সরস্বতী বন্দনা, দান লীলা, দধি লীলা প্রভৃতি। এতে প্রতীয়মান হয়, মুসলিমদের শিক্ষাঙ্গণ হতে দূরে রাখার জন্য কীভাবে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতবহুল শব্দ ও হিন্দুয়ানীতে পরিণত করা হয়েছিল। আর এটাই ছিল বাংলা ভাষার প্রতি তাদের উদাসীনতার মূল কারণ। অন্য কথায় মুসলিমদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যে বৃটিশ শাসক, খৃষ্টান মিশনারী[৪] ও এদেশীয় হিন্দু দালালদের এ ছিল এক ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা, যা মুসলিম শক্তি ধ্বংস করার সুদূরপ্রসারী নীল নক্সা হিসেবে বিবেচিত।[৫] ফলে মুসলিমগণ মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে যায়। এ অবস্থায় ড. Adam মুসলিমদের জন্য উর্দু ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদের উপযোগী বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এদিকে কোন দৃষ্টি দেয়নি।[৬]

উনিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে কলকাতার হিন্দু সমাজে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তখন কলকাতার শীর্ষস্থানীয় মুসলিমগণ নীরব থাকলেও গ্রামাঞ্চলের মুসলিমগণ বেশ সক্রিয় ছিল। সে সময় গ্রামাঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণ স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও এসব অভ্যুত্থানের মূল উৎস ছিল কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ, অচিরেই এগুলো ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এ বিবর্তনের কারণ খুঁজতে গেলে সেকালের মুসলিম ধর্ম-চিন্তা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সালাহ উদ্দীন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে,

---

[৪] খৃষ্টান মিশনারী বিষয়ক বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'বৃটিশ বাংলায় খৃষ্টান মিশনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলন-২০০৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণিকা', পৃঃ ৩৪-৩৫; সহ দ্রষ্টব্য ঃ Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857), Chittagong, 1965.

[৫] N. Chatterjee, Life of Mahatma Raja Rammohon Roy, P. 394.

[৬] A. R. Mallick, op.cit., PP. 161-65.

তখন এ উপমহাদেশের ধর্ম-চিন্তায় দুটি পরস্পর বিরোধী ধারা সক্রিয় ছিল। একটি ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে সুসংবদ্ধ ও সুসংরক্ষণ করার ধারা। অপরটি ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের মূলসূত্র ও বাণীর সমন্বয়ের ধারা। দিল্লীর বিখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) (১৭০৩-১৭৬৩) ইসলামের বিশুদ্ধবাদী ধারাকে সমকালীন প্রয়োজনের তাগিদে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন।[৭]

ইংরেজ পদানত বাংলার মুসলিম জাগরণ আন্দোলন সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ)-এর চিন্তাধারার দ্বারা। মুজাদ্দিদ-ই আল্ফ-ই-সানীর (রঃ) বিশিষ্ট খলিফা শাহ আদম বিন্নৌরীসহ (রঃ) বহু বিশিষ্ট আলিমের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই মনীষীর কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, ইসলামের মূল সত্য হতে বিচ্যুতিই মুসলিমদের বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। তাই তিনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাজ ছিল ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মুসলিমদের চিন্তা-চেতনার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মুসলিমদের জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হন। তিনি মুসলিমদের মাযহাবী বিরোধ মিটানোর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করেন এবং ইজতিহাদকে 'ফরযে কিফায়া' বলে উল্লেখ করেন। তিনি ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি এবং শর্তাবলীও রচনা করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) আল্ কুরআন ও আল্ হাদীস ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন দর্শন, ইসলামের নৈতিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি জনসাধারণের কাছে লিখিত আকারে পেশ করেন। মুসলিমদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক রীতি-নীতি, বিচার ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তৃতীয় পর্যায়ে সঠিক ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পরিবর্তে একটি নতুন ও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী গণবিপ্লবের কর্মসূচিও তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেশ করেন। কিন্তু চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠন —— এ দুই পর্যায়ে তাঁকে

[৭] সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। ফলে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। [৮]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহ্লাভী (রঃ)-এর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে উপমহাদেশের আনাচে-কানাচে পরিচিত করে তোলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয (রঃ) (১৭৪৬-১৮৩৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় আলিমদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ দেশকে নির্ভয়ে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধরত এলাকা বা শত্রুশাসিত এলাকা বলে ফাত্ওয়া জারী করেন[৯] এবং জিহাদ করে এদেশকে 'দারুল ইসলাম' (ইসলাম শাসিত এলাকা)-এ পরিণত করার আহবান জানান। তাঁর এ বিপ্লবী ঘোষণা মুসলিমদের মনে জিহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার হিল্লোল প্রবাহিত করে। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন, যা ইতিহাসে 'তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ছিল যেসব ইসলাম বিরুদ্ধ কুসংস্কার, চাল-চলন ও রীতি-নীতি সাধারণ মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রবেশ লাভ করেছে, সেগুলির মূলোৎপাটন করা ও খাঁটি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এ আন্দোলনের ফলেই বহু লোক ইসলামের সত্যিকার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারূপ অনৈসলামিক ও কুসংস্কারমূলক অভ্যাস পরিত্যাগ করতে শিখে। কালক্রমে এ আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে অত্যাচারী শিখ ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'আজাদী আন্দোলন' বা 'জিহাদ আন্দোলন'-এ পরিণত হয়।[১০] বাংলার মুসলিম জাগরণে এ আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রঃ)। তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন শাহ্ ইসমাইল শহীদ (রঃ)।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ) স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলেন যে, বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস হওয়ার পথে। অন্যদিকে ইংরেজগণ গোটা ভারতবর্ষের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও পাঞ্জাবের একটি বিরাট অঞ্চলে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমগণ শুধু রাষ্ট্রই হারায়নি, বরং ইসলামের মূলনীতি হতে অনেক দূরে সরে গেছে। উত্তর ভারতে শরীয়াহ্ বিরুদ্ধ

---

[৮] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫-৩৬; সহদ্রষ্টব্য : আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুন ২০০২, পৃঃ ২৪২-৪৩ এবং আবদুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ১২৩।

[৯] আব্বাস আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।

[১০] আব্দুল মওদূদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩-৩৪।

রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত বক্তব্য হতেই তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন ঃ

> "নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুআনীতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছি। আমরা দু'রকম জাতি ভেদের কবলে পড়েছি —— মাযহাবী বিভেদ ও সামাজিক জাতিভেদ। আমরা এসব হিন্দুদের থেকে শিক্ষা করেছি, না হয় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটিই হচ্ছে একটি নীরব উপায়, যার দ্বারা বিজিত জাতি বিজেতার উপর চরম প্রতিশোধ নেয়।"[১১]

মুসলিমদের জাতীয় জীবনের এমনি এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রঃ) তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করেন। তিনি দেখলেন তাঁর সম্মুখে মাত্র তিনটি পথই উন্মুক্ত রয়েছে। প্রথমতঃ হক্ব পরিত্যাগ করে বাতিলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ হক্ব পরিত্যাগ না করে বরং এর সঙ্গে জড়িত থাকতে যেয়ে যেসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে, তা নীরবে সহ্য করা। তৃতীয়তঃ পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্যবীর্য সহকারে বাতিলের মোকাবেলা করতঃ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা —— যাতে করে হক্বের জন্য বিজয়-সাফল্য সূচিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাইয়েদ সাহেব এ তৃতীয় পথটিই বেছে নিলেন। এ পথে চলার সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।[১২]

পবিত্র হজ্জ সুসম্পন্ন করে তিনি সার্বিকভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অমুসলিমদের অধীনে আসে, তাহলে সে দেশের প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ 'ফরযে আইন' হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর জিহাদ হয়ে পড়ে 'ফরযে কিফায়া'। তাঁর মতে, জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তা বিনষ্ট করা।[১৩]

জিহাদের ব্যাপক প্রস্তুতিকল্পে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও বাংলাতে কতিপয় বিশ্বস্ত খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পাটনাতে জিহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপন করতঃ সেখানে তিনি চারজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন– মাওলানা বেলায়েত আলী, মুহাম্মদ হোসেন, এনায়েত আলী এবং ফরহাদ

---

[১১] উদ্ধৃত : আবদুল মওদূদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।
[১২] আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[১৩] আবু জাফর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।

হোসেন। ভারতের সর্বত্র জিহাদের প্রচারণা ও প্রস্তুতি শেষ করে তিনি ১৮২৬ সালে নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলী ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে সর্বশেষে নওশেরার নিকট উপস্থিত হন। সেখানে এক নৈশ যুদ্ধে মাত্র নয়শত মুজাহিদ বৃহৎ শিখ বাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে অসংখ্য সীমান্তবাসীসহ বহু স্থানীয় সরদার এবং বিশেষ করে ইউসুফজায়ীরা সাইয়েদ আহমদের সাথে যোগ দিল।

নওশেরায় শিখদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর হতে বালাকোটের যুদ্ধ পর্যন্ত ছোট-বড় এগারটি বা ততোধিক যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শত্রুদের মোকাবেলা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) চেয়েছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্তে তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। এ কারণেই তিনি সীমান্তকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সীমান্তের যেসব মুসলিমের সাহায্য-সহযোগিতার আশা হৃদয়ে পোষণ করে সাইয়েদ সাহেব তাঁর জিহাদের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। এর প্রমাণ হল বালাকোটের বিপর্যয়। মুজাহিদ বাহিনী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকলেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সাইয়েদ আহমদ, শাহ ইসমাইল ও তাঁর অন্যান্য প্রধান সহকর্মীগণ বালাকোটের যুদ্ধে শেষপর্যন্ত ১৮৩১ সালের ৬ই মে প্রচণ্ড জিহাদে করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। [১৪]

বালাকোটের বিপর্যয় আকস্মিক নয়, অভাবনীয়ও নয়। বরং তা ছিল কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার মতই পূর্ব-নির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। মুজাহিদদের জিহাদ আন্দোলনের প্রায় পৌনে একশতক ব্যাপী কর্মতৎপরতার প্রথম বিপর্যয় ঘটে বালাকোটে। দ্বিতীয় বিপর্যয় ঘটে ১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রামে। আর তার শেষ পরিণতি হয়েছিল ১৯১৯ সালের খিলাফত আন্দোলনে।[১৫]

সাইয়েদ আহমদ শহীদ যখন শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সংকল্প ঘোষণা করেন তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে

---

[১৪] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : আবদুল মওদূদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-৪৮।
[১৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯।

শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ কি? এ প্রসঙ্গে তাঁর জবাব ছিল এরকম- প্রথমত; ইংরেজরা এখানে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু শিখেরা প্রত্যক্ষভাবে মুসলিমদের ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করছে। দ্বিতীয়ত, এদেশে ইংরেজ আধিপত্য মজবুত করার পেছনে শিখদের সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তৃতীয়ত, সীমান্তে মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশকে সর্বপ্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা সহজ হবে। [১৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনকে কেহ কেহ 'ওয়াহাবী আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও সত্যিকার অর্থে একে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ কথিত 'ওয়াহাবী আন্দোলন' এবং 'জিহাদ আন্দোলন' সম্পূর্ণ পৃথক দুটি আন্দোলন এবং এদের প্রেক্ষাপটও সম্পূর্ণ ভিন্ন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজ্‌দী আরবে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এর নাম দিয়েছেন 'Wahabism' বা 'Wahabi Movement বা ওয়াহাবী আন্দোলন। কিন্তু জিহাদ আন্দোলনের সাথে একে একাকার করা সমীচীন হবে না। কারণ জিহাদ আন্দোলনকারীরা কখনও নিজেদের 'ওয়াহাবী'দের সঙ্গে চিহ্নিত করেননি। তাছাড়া বাংলা-ভারতের মুসলিমদের জিহাদ আন্দোলনের সাথে আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের তেমন কোন সামঞ্জস্যও ছিলনা। [১৭]

সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনে বাংলা হতে কয়েক সহস্র মুজাহিদ ও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রেরিত হয়। বাংলার মুজাহিদদের অনেকেই বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছেন এবং অনেকে গাজীর মর্যাদা লাভ করেছেন। গোলাম রসূল মেহের প্রদত্ত তালিকা অনুসারে, বালাকোটে সর্বমোট একশত পঁয়ত্রিশ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাংলার অধিবাসী। তাঁরা হলেন আলীমুদ্দীন, ফয়েজউদ্দীন, লুৎফুল্লাহ্,

---

[১৬] মওলানা জাফর থানেশ্বরী, আত্মজীবনী, উদ্ধৃত : মুহিউদ্দীন খান, 'জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা', আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৮৬।

[১৭] বিস্তারিত দেখুন: R. C. Majumdar, History of Freedom Movement, III; উদ্ধৃত : আবদুল মওদূদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

শরফুদ্দীন ও মুজাফ্ফর হোসেন। [১৮] কিন্তু মুহিউদ্দীন খানের বিবরণ হতে জানা যায় যে, বালাকোট যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিক। তন্মধ্যে নেতৃস্থানীয় একশ একচল্লিশ জনের নাম যুদ্ধের রোজনামচা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের তালিকায় বাংলার অন্ততঃ নয়জন মুজাহিদের নাম স্থান পেয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন- উপর্যুক্ত পাঁচজনসহ মুন্সী মুহাম্মদ আনসারী, মুন্সী ইব্রাহীম, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ এবং করিম বখ্শ।[১৯]

মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীসহ বাংলার যেসব মুজাহিদ গুরুতর আহত হয়ে গাজীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মত বলা হয়। কিন্তু তাঁদের তালিকা অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বালাকোটের ময়দানে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও অন্যান্য শীর্ষনেতৃবৃন্দ শাহাদাতবরণ করলেও জিহাদ আন্দোলন স্তব্ধ বা স্তিমিত হয়ে যায়নি। আহত মুজাহিদগণ নেতৃবৃন্দের আকস্মিক শাহাদাতের শোক ভুলতে না পারলেও অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে পুনঃগঠিত হয়ে পশ্চিমাঞ্চলে গভীর পার্বত্য এলাকায় সরে গিয়ে সিতানায় কেন্দ্রস্থাপন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলার মুজাহিদ গাজীগণ মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীর নেতৃত্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইমামুদ্দীন বাঙালী নোয়াখালীর হাজীপুরে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখলেন। সুফী নূর মোহাম্মদ সীতাকুন্ড পাহাড়ের পাদদেশে নিজামপুরে আস্তানা স্থাপন করলেন। সুফী নূর মোহাম্মদের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন কলকাতার সুফী ফতেহ আলী। তাঁর খলিফা ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী এবং তাঁর খলিফাগণের মধ্যে শর্ষিণার মাওলানা নেছারউদ্দীন ও চব্বিশ পরগনার মাওলানা রুহুল আমীনের দ্বীনি খিদমত এদেশে সর্বজনবিদিত। মাওলানা আব্দুল হাকিম স্থান নির্বাচন করলেন চট্টগ্রাম থেকে আরো দূরে আরাকান সড়কের পার্শ্বে গভীর অরণ্যানী ঘেরা চুনতী গ্রামে। এদিকে ঢাকার বংশাল এলাকায় গড়ে তোলা হল আন্দোলনের গোপন কেন্দ্র। এখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে পাটনা এবং পাটনা থেকে বাহওয়ালপুরের খানপুর হয়ে মুজাহিদদের কাফেলা ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ

[১৮] গোলাম রসূল মেহের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩২-৩৪।
[১৯] মুহি উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

নিয়মিত সিতানায় প্রেরিত হত। প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী এ কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর আন্দোলন ছিল মূলতঃ সংস্কারধর্মী। সীমান্তে মুজাহিদ অভিযান ছিল এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়মাত্র। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি মুজাহিদদের কাফেলাকে সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের মুসলিমগণ আগ্রাসী শিখ শক্তির নির্যাতন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। উপরন্তু পেশোয়ার কেন্দ্রিক একটি ইসলামী খিলাফত কায়েম করে চার বছরাধিক কাল তা পরিচালনা করার মাধ্যমে পরবর্তী যুগের ঈমানসমৃদ্ধ মুসলিমদের সামনে নবুওয়্যতের আদর্শে খিলাফতের এমন এক বাস্তব নমুনা তিনি পেশ করে গেছেন, যা আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। [২০]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, পলাশীর যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত হওয়ার ছয় বছর পর মীর কাসিমের দেশীয় সৈন্যরা যখন পাটনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করছেন, তখন বাংলা ও বিহারের ইংরেজ ও তার দালাল জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরেন ফকীর মজনু শাহ। জমিহারা, গৃহহারা নিরন্ন চাষী, দিনমজুর, শিল্প ধ্বংসের ফলে বিভিন্ন পেশা থেকে বঞ্চিত কারিগর, বেকার তাঁতী, চাকুরীচ্যুত বুভুক্ষু সৈনিক ইত্যাদি সকল স্তরের অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন। এক জন দরবেশের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রথম গণসংগ্রাম ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আটত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। । এ সময় একের পর এক সংঘটিত হয় ত্রিপুরা জেলার শমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপে আবু তোরাবের বিদ্রোহ (১৭৬৯), ফকীর করম শাহের নেতৃত্বে মোমেনশাহী ও শেরপুর জমিদারী এলাকায় গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাড়ি ও অন্যান্য অধিবাসীদের জাগরণ (১৭৭৫), শের দৌলত

[২০] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মুহিউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২-৯২।

খাঁ, রামু খাঁ ও জান বখ্শ খাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুম চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৯), রংপুর ও দিনাজপুরে কোম্পানীর ইজারাদার 'রাজা' দেবী সিংহ ও 'দেওয়ান' হরে রামের বিরুদ্ধে নূরুদ্দীনের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), মোমেনশাহী ও জাফরশাহী পরগনায় জমিদার যুগোল কিশোর রায় চৌধুরী, গোবিন্দ চাকি, পাঁচু বসু ও রামচন্দ্র মুখার্জীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২) প্রভৃতি । এসব গণবিদ্রোহের মধ্যদিয়ে পরাধীনতার মসিলিপ্ত ইতিহাস রক্তরঙিন, গৌরবময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অসামান্য।

পলাশী উত্তর যুগে বাংলার অবক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজে আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অক্ষম ছিল। তাই মুসলিম উচ্চ শিক্ষিত স্তর থেকে নেতৃত্বের উন্মেষ না হওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণ এ শূন্যতা পূরণ করে এবং তাদের জীবনবোধের ভিত্তিতে নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এ পর্যায়ে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রীঃ) সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্য থেকে ১৮১৮ সালে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ধর্মীয় ফরজ কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উপর জোর দেন। তাই এ আন্দোলন 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি গ্রাম-গঞ্জের জনসাধারণের দুঃখ মোচনের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। [২১]

উল্লেখ্য যে, ফারায়েজী আন্দোলনের সাথে আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের অনেক মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আহমদ মোস্তফা আবু হাকীমা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাবের একত্ববাদের ভিত্তি ছিল অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয় আল্লাহ্র একত্বের ধারণা। শয়খ মুহাম্মদের এ ধর্মনীতিতে কোন নতুনত্ব ছিলনা অথবা তিনি নতুন কিছু করতেও চাননি। একজন সংস্কারক হিসেবে শয়খ মুহাম্মদ তাঁর

[২১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড, (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃঃ ২৩৮।

সহচরদের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র বাণী আল্-কুরআনের নির্দেশের প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর পূন্যবান সহচরদের নির্দেশ কার্যকর করার দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। [২২] মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাবের সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে— ধর্মানুষ্ঠানে যে কোন প্রকার বিদ্‌আত বা নতুন আচার-আচরণ সংযোজন করা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে এবং মূল অনুষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে এবং পরস্পর সহযোগিতা ও বিরামহীন জিহাদের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলিক নীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। [২৩]

অন্যদিকে ফরায়েজীরাও মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশুদ্ধ ধারণার প্রতিফলন কামনা করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসরণে মানব জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার ঘোষণা করে, ইসলামের বিশ্বজনীন ন্যায়পরায়ণতা ও জুলুমহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেদন বাস্তবে রূপায়িত করার সংকল্প ব্যক্ত করে। তারা বিশুদ্ধ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কর্মময় অঙ্গণে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে শির্‌ক, বিদ্‌আত, কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুসংহত, আনন্দদায়ক ও সুখময় করে তোলার আদর্শে নিবেদিত ছিল।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ইংরেজ শাসিত এ দেশকে 'দারুল্ হর্‌ব্' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং যতদিন পর্যন্ত এ দেশ 'দারুল ইসলামে' পরিণত না হবে ততদিন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা এবং জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন।[২৪] তিনি হিন্দুদের পূজা-পার্বণে কোন প্রকার আর্থিক বা দৈহিক সাহায্য-সহযোগিতা করাকে শির্‌ক ও হারাম বলে অভিহিত

---

[২২] Ahmad Mustafa Abu Hakima, History of Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and Kuwait, Beirut, 1965, P. 125.

[২৩] মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন', বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১।

[২৪] Muin ud-Din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement, Karachi, 1965, P. 243.

করেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ সমাজ থেকে বিভিন্ন ভেদনীতি, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শ্রমের মর্যাদা ভিত্তিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে ফরায়েজীদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলেন। তিনি জমির আবাদকারী বা চাষীকেই জমির প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর মতে, জমির ফসল চাষীরই প্রাপ্য এবং তাতে জমিদারের কোন অধিকার নেই। তিনি জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি স্তরের করের অবৈধ 'আবওয়াব' প্রদান করতে চাষীদের নিষেধ করেন।[২৫] তাঁর এ আহ্বানে শোষিত, বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলিমগণ সম্বিত ফিরে পেল এবং নতুন প্রাণ সঞ্চারণ অনুভব করলো। ফলে তারা দলে দলে এসে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল এবং বৃটিশ, হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল দশ-বারো হাজার, যা হিন্দু জমিদারদের জন্য এক মহা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এ প্রসঙ্গে Dr. James Wise বলেন ঃ æThe Zaminders were alarmed at the spread of the new creed which bound the Mussalman peasantry together as one man.''[২৬]

এদিকে ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্র ইন্তেকালের পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহ্সিন্ উদ্দীন আহ্মদ ওর্ফে দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতা এত প্রবল ছিল যে, তাঁর আদেশ পালনে ষাট হাজার কর্মী সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো। [২৭] তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ফারায়েজী সমাজ ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন। তাঁদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহবান করা, কর্মী

---

[২৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০।

[২৬] Dr. James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1884, P. 22.

[২৭] আবদুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এভাবে যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী হল, এর শীর্ষে দুদু মিয়া অবস্থান নিলেন।[২৮] তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থা ছিল রাষ্ট্রাভ্যন্তরে একটি 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র' সদৃশ। তাঁর পঞ্চায়েত ও খিলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে Muin Uddin Ahmad Khan বলেন ঃ

> æThus he (Dudu Miah) recreated alongside the Khilafat system, traditional panchayet system of the villages, which united the rural people of all classes irrespective of status. By his hierarchic gradation of officers in the Khilafat leadership and on the basis of neutrality, equity and justice in the village arbitration arranged for the settlement of disputes and litigations of the Muslims, Hindus, Buddhists and Christians. To counter the corruption of the courts, false witnesses and bribes, his arbitration system was organised and it became so successful that in the Faraidi dominated areas filing of cases in the formal court nearly came to an end."[29]

দুদু মিয়া একটি ফারায়েজী ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি সাধারণ তহবিল গঠন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনীর মোকাবেলায় পাল্টা একটি স্বেচ্ছাসেবক ফারায়েজী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি ১৮৪০ হতে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দাঙ্গা এবং যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কঠোরভাবে দমন করেন। ফলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে বৃটিশ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে কলকাতার আলীপুর

---

[২৮] *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. LXIII, Pt. II, No. 1, 1894, P. 50; *Encyclopaedia of Islam*, Vol-II, P. 58.

[২৯] Muin Uddin Ahmad Khan, 'Religious Reform Movements of the Muslims', History of Bangladesh, 1704-1971; Sirajul Islam (ed.), Social and Cultural History, Vol. Three, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, PP. 286-87.

জেলে আবদ্ধ রাখে। হাজী শরীয়ত উল্লাহর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তা ছিল মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে সীমিত। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে এ আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

সাইয়েদ (মীর) নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের একজন একনিষ্ঠ শিষ্য। পবিত্র মক্কা নগরীতে সাইয়েদ সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি হজ্জব্রত পালন শেষে ১৮২৭ সালে বাংলায় ফিরে এসে চব্বিশ পরগণা জেলার নারিকেল বাড়িয়ায় বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারকর্ম শুরু করেন। মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার সাহচর্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তিতুমীর সহজে প্রতিষ্ঠা পান। সফদরপুরে তীতুমীরের শিষ্যরা একটি ভগ্নপ্রায় পুরনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ মেরামত করে তাতে তাদের প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এখানে তারা জমিদারদের অন্যায় তৎপরতা প্রতিরোধকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে জমিদারগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্বক কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৩০]

হিন্দু জমিদারদের সাথে তিতুমীরের শিষ্যদের বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ফলে তিতুমীরের আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও রানাঘাট এলাকায় সাতজন বৃহৎ হিন্দু জমিদার একজোট হয় এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা, শান্তিভঙ্গ, মুসলিম রাজত্ব তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, হিন্দু ধর্মের ক্ষতি সাধন ও পবিত্রতাহানি এবং হিন্দুজনগোষ্ঠীর উপর বিদ্বেষমূলক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের অজুহাতে কলকাতার হিন্দু পত্র-পত্রিকায় এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এক দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করে। অন্যদিকে নীলকররাও তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে তিতুমীরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠে এবং তাঁর দলকে ধর্মীয় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। এভাবে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও রানাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার জোটবদ্ধ হিন্দু জমিদারদের চক্রান্ত, দাড়ি ট্যাক্স,

---

[৩০] বিস্তারিত দেখুন: মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫১।

কোর্টে মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি, লাঠিয়ালদের আক্রমণ এবং ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের কারণে কোনঠাসা হয়ে অবশেষে তিতুমীরের শিষ্যগণ নারিকেল বাড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লা' প্রতিষ্ঠা করে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ৭ই নভেম্বর, ১৮৩১ সালে লাউ ঘাটিতে তিতুমীরের বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় এবং তিতুমীরের শিষ্যদের সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রগতির মুখে জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের সম্মিলিত বাহিনী চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়এবং ঐ বিস্তীর্ণ এলাকায় তিতুমীরের শিষ্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম হয়।[৩১]

লাউঘাটির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষে অসংখ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় ও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ নভেম্বর, ১৮৩১ সালে মেজর স্কট হার্ডিং-এর নেতৃত্বে এক রেজিমেন্ট পদাতিক বাহিনী এবং ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী সৈন্য, এক ব্যাচ গোলন্দাজ সৈন্য ও দুটি ভারী কামান সম্বলিত একটি সৈন্যবাহিনী কলকাতা থেকে নারিকেল বাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হয়। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে ঘনঘন কামান দেগে সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তিতুমীরের বাহিনীর ছিল না। তবুও তাঁরা আত্মসমর্পণ না করে শাহাদাত বরণ করেন। নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা পরিণত হয় রক্ত, লাশ আর পোড়ামাটির এক বিধ্বস্ত জনপদে। তিতুমীর তাঁর মহান দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু যে ধর্মীয় ও নৈতিক অনাচার এবং হিন্দুজমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অন্যায়-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক সংগ্রাম শুরু করেছিরেন, তা পরবর্তীকালে

---

[৩১] Muin Uddin Ahmad Khan, Titu Mir and His Followers, Dacca, 1980, PP. 18-21.

মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আজাদীর পথে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে[৩২]।

এখন প্রসঙ্গক্রমে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামকে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বৈদেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সত্যিকার আযাদী সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রাম। সমগ্র ভারতবর্ষে অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সর্ব ভারতীয় পড়ম স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৪৭ সালের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। প্রথম দু'টিতে মুসলিমদের চরম বিপর্যয় হলেও তৃতীয়টিতে তাঁরা সফলতা অর্জনে সক্ষম হন। সুতরাং প্রথম দু'টি ছিল তৃতীয়টিতে সফলতা অর্জনের প্রেরণার উৎস। ১৮৫৭ সালে সারা ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণ যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিল, তার কারণ ছিল নানাবিধ। শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আক্রোশ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়েছিল এ সংগ্রামে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ আবদুল আজিজ, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিয়া, তিতুমীর প্রমুখ বীর-মুজাহিদগণ যে জিহাদী প্রেরণার সঞ্চার করে রেখেছিলেন, তা যেন বারুদের স্তুপে দিয়াশলাইয়ের কাজ করলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যে যেখানে ও যেভাবে পেরেছে সংগ্রামে যোগদান করেছে। সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়েছে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের সাধারণ মানুষ - কৃষক, মজুর, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী। ফলে কোথাও কোথাও নিয়ম-নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে, হয়েছে লুটতরাজ ও অপ্রয়োজনীয় হত্যাকান্ড। কোন আদর্শবান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। অথচ বৃটিশরা এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের একচেটিয়াভাবে দায়ী করে এবং পৈশাচিকতার সাথে এর

[৩২] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।[৩৩] এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্ বলেন ঃ

> "বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ... মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যেই অর্ধ-লক্ষাধিক নর-নারী মধ্যভারত ও নেপালের জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোত্তরকালে প্রথম আঘাত পড়িয়াছিল তাহাদেরই উপর। বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। ... কতজনের যে ফাঁসি হইল, কত হাজার হাজার লোকের প্রতি যে স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল তাহার হিসাব এক্ষণে পাওয়া দুষ্কর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে যাঁহারা দন্ডিত হইয়াছিলেন, শুধু তাঁহাদেরই সংখ্যা ছিল দশ হাজারের উর্ধ্বে। ... বিদ্রোহে উস্কানি, ইংরেজ নরনারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আর্থিক সাহায্য দান, বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-জমি, তালুকদারী, জমিদারী, নগদ টাকা পয়সা ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহার সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু কিছু হিন্দুদের মধ্যেও বিলি-বন্টন করিয়া দিয়া নূতন আর একটি রাজভক্তের দল সৃষ্টির প্রয়াস পান"।[৩৪]

আনিসুজ্জামান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বটাই ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসক মহলে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার

---

[৩৩] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : আব্দুল মওদূদ, সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, শতাব্দী পরিক্রমা, ঢাকা, ২০০২; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০২; R.C. Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, Calcutta, 1957; R.C. Dutta, *Economic History of India in the Victorian Age*, Calcutta, 1906; J. E. Kaye, *A History of the Sepoy War in India*, 1857-58, London, 1877, Vol. I;

[৩৪] মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ্, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ১২৪-২৭।

জন্যেই মুসলিমরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।[৩৫] এ সম্পর্কে মাওলানা ফজ্‌লে হক খয়রাবাদী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো। কিন্তু পালাতে পারেনি এমন মুসলিম সেদিন বাঁচেনি।[৩৬] শুধু ফাঁসীতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয় বাংলা-ভারতের প্রায় ৭০০ জন আলিমকে। তাছাড়া শত শত আলিমকে পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপ্লবের জের চলে আরো কয়েক বছর। ১৮৬৪ সালে আম্বালায়, ১৮৬৫ সালে পাটনায় এবং ১৮৭০ সালে মালদহে পরিচালিত সরকার উৎখাত সংক্রান্ত মামলাগুলো সে সময়কার জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের সক্রিয় তৎপরতার প্রমাণ বহন করে। এসব মামলার বেশীর-ভাগ অভিযুক্তকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

স্বাধীনতা বিপ্লব-পরবর্তী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। বিদ্রোহ দমনের নামে ইংরেজদের ব্যাপক দমননীতির ফলে মুসলিম সমাজ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো ইংরেজদের সাথে মুসলিমদের আপোসের একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠে। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) (১৮০০-১৮৭৩) এ ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে যে তিনজন মহান ব্যক্তি বাংলায় মুসলিমদের সামগ্রিক সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী। তিনি (জৌনপুরী) শাহ আবদুল আজিজ(রঃ)-এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদের (রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩৭] সাইয়েদ আহমদ শহীদ ভারতবর্ষকে 'দারুল হর্‌ব' ঘোষণা করে প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা

---

[৩৫] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৪৩।

[৩৬] দেখুন : সানা উল্লাহ্ নূরী, *'স্বাধীনতা সংগ্রাম : শেরে বাংলা ও লাহোর প্রস্তাব'*, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আবদুল গফুর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯-৭১।

[৩৭] James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Estern Bengal*, op. cit., P. 29; J. C. Jack, Bengal District Gazetteer, Bakerganj, Calcutta, 1918, P. 34.

করেন।[৩৮] তাই মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগ দেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর ১৮৩৫ সালে তিনি বাংলায় হিজরত করেন এবং বাকী জীবন সমাজ-সংস্কার কর্মে অতিবাহিত করেন।[৩৯] অন্য বর্ণনা অনুসারে, তিনি জিহাদ আন্দোলনে শরীক হতে মুর্শিদের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে জিহাদে যোগদান না করে বাংলায় ধর্ম প্রচারের আদেশ দেন। মুর্শীদের নির্দেশ মোতাবেক তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সপরিবারে বাংলায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন।[৪০]

প্রথমে তিনি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন।[৪১] তবে পরবর্তী সময়ে তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ধর্ম প্রচারের অন্তরায় এবং মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন[৪২] এবং সাইয়েদ আহমদ শহীদের পথ ও মত থেকে সরে যান।[৪৩] কারণ তিনি মনে করতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ১৮৬৭ সালে তিনি জিহাদ আন্দোলনের মূল spirit হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের মধ্যে 'ভিতর থেকে সংস্কার' (reform from within) তথা অন্তর্বিপ্লবের ধারণা প্রচার করেন। তিনি প্রচার যুদ্ধের মাধ্যমে অশিক্ষিত গ্রামীণ জনসাধারনের অনৈসলামী আচার-বিশ্বাস ও হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি দূর করে বাংলায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ইংরেজদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে তিনি জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের নিয়ম-নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এখানে জুমআ ও ঈদের নামাজ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন [৪৪]

---

[৩৮] Mohiuddin Ahmad, *Saiyid Ahmad : His Life and Mission*, Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow, P. 128.

[৩৯] আবদুল মওদূদ, *ওহাবী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮-২৯।

[৪০] ড. এম.এস.এ. ইব্রাহিমী, 'কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)', ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, ই.ফা.বা. ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ ৩৩০; ইছমত আলী (অনূদিত), মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৬-৩৭।

[৪১] আবু জাফর শামসুদ্দীন, আত্মস্মৃতি (১), ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ৭।

[৪২] Abdul Hai, Nuzhatul Khawater, Vol. II, Hyderabad, 1947, PP. 394-96.

[৪৩] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫।

[৪৪] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।

এবং স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বক্তব্য উদ্ধৃত করেন।[৪৫]

ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৮৭০ সালে কলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতিফ আয়োজিত Mohamedan Literary Society'-এর সভায় মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে তাঁর ঐ মনোভাবের জোরালো প্রতিধ্বনি মেলে।[৪৬] উক্ত সভায় মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইংরেজ শাসিত এ দেশে জিহাদ করা আইনসঙ্গত হতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত 'ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরী'তে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৭] মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর এ ফাত্ওয়া প্রদানের ফলে বৃটিশদের সাথে বাংলা-ভারতের মুসলিমদের সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। বরং তাঁর পুত্র মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[৪৮] ইংরেজদের সপক্ষে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তিনি ইংরেজ সরকার থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। এমনকি ইংরেজ সরকার তাঁর প্রশংসা করে সার্টিফিকেটও প্রদান করে।[৪৯]

উনিশ শতকের শেষ দিকে মাওলানা কারামত আলীর সনাতনপন্থী অনুসারীদের সাথে জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের কর্মীদের মাজহাবী বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে 'বাহাস' বা তর্কযুদ্ধ মুসলিম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়। 'বাহাস'-এর খোলাখুলি ও যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের মধ্যদিয়ে মুসলিমগণ জিহাদসহ ইসলামী

---

[৪৫] মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ্, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ২৫৮ ।

[৪৬] মুহা. আবদুল বাকী, 'মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর রাজনৈতিক মানস ও চিন্তার বিবর্তন', বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস', পঁয়ত্রিশ বর্ষ প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৮ বাংলা, পৃঃ ৭১।

[৪৭] W. W. Hunter, The Indian Mussalmans, এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৯৪ ।

[৪৮] রিপোর্ট, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি, ১৯১০, পৃঃ ৭ ।

[৪৯] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৫,পৃঃ ১৬৪-৬৫ ।

জীবন বিধানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়।[৫০] মুসলিমদের বিভিন্ন চিন্তা ও মতকে কেন্দ্র করে পরিচালিত 'বাহাস' পরবর্তীকালে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যকার বাহাসে রূপ নেয়। এ ক্ষেত্রে মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৫১] এ পর্যায়ে মুসলিমদের বিভিন্ন দলের মধ্যকার বিভেদ অনেকাংশে প্রশমিত হয় এবং তাঁরা আত্ম-পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন।

ঢাকা, কলকাতা, হুগলী ও চট্টগ্রামের উচ্চতর মাদ্রাসাগুলো থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটগণ এসময় মুসলিম জাগরণে মুখ্য ভূমিকায় এগিয়ে আসতে থাকেন । ৫০ শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিমগণ জিহাদ ও ফারায়েজী আন্দোলনের মৌলিক পুনর্গঠন এবং তাঁদের ইংরেজ বিরোধী নিরাপোস সংগ্রামের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। ইসলামের পূর্ব গৌরব বা ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যদিও তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু সেই সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যেও তাঁরা গৌরব খুঁজেছেন। তাই তাঁরা ইংরেজদের সাথে আপোস করেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারার চাকচিক্যে বিমোহিত এই শহুরে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলীর মত 'Enlightened' বা 'আলোক প্রাপ্ত' ব্যক্তিবর্গ। দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এ তিনজনই ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে 'আধুনিকীকরণ' ছাড়া মুসলিমদের পক্ষে ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদেরকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষায় উন্নতি লাভের মাধ্যমে সামাজিকভাবে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা ছিলেন। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী নৈতিক পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিমদের সঙ্গত দাবী আদায়ের কথা

---

[৫০] পূর্বোক্ত।

[৫১] এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান ও কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো।

বলেছেন। মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্ত অংশই ছিল তাঁদের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন।[৫২]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩ খ্রীঃ) মনে করতেন, আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার স্বার্থে মুসলিমদের অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষা ও এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।[৫৩] তিনি ১৮৬৩ সালে 'Mohamedan Literary and Scientific Society প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে নতুন জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বিতরণ করা।[৫৪] এ সম্পর্কে Dr. Sufia Ahmed বলেন ঃ

> To impart useful information to the higher and educated classes of the Mahomedan community by means of Lectures, Addresses and Discourses on various subjects in literature, science and society, which are delivered, at the monthly meetings, in the Urdoo, Persian, Arabic and English languages'.[55]

শাসক শ্রেণীর প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার ফলে আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে

---

[৫২] পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬।

[৫৩] Enamul Haque (ed.), Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 193.

[৫৪] আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড', বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৮৬।

[৫৫] Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal: 1884-1912; বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় : ১৮৮৪-১৯১২, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ ৮৪।

'সি.আই.ই.' এবং ১৮৮৭ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।[৫৬] ফলে মুসলিম নেতারূপে তাঁর খ্যাতি কেবল বাংলাতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একজন সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা হিসেবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন।[৫৭]

মুসলিম সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আবদুল লতিফের প্রথম কাজ ছিল ইংরেজদের প্রতি মুসলিমদের যে বিরূপ মনোভাব রয়েছে, তা দূর করে সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করে তোলা। তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচি ছিল মুসলিম সমাজে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। কারণ ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দু সম্প্রদায় ইতোমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তাঁর তৃতীয় কর্মপন্থা ছিল চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সরকারের নিকট হতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। সাংগঠনিক চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রয়াসের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চতুর্থ কর্মসূচি হিসেবে সভা-সমিতি স্থাপন করেন। উচ্চবিত্তের সাথে মধ্যবিত্তের মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল সভা-সমিতির মাধ্যমে।[৫৮] শিক্ষার উন্নয়নকল্পে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা তিনি ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা ও ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। ধর্ম শিক্ষার জন্য মুহ্সিন ফান্ড ও অন্যান্য ওয়াক্ফ সম্পত্তির অর্থ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হোক - এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করেছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। তাই সরকারী খরচে প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৪) স্থাপিত হলে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সমান প্রবেশাধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁর উদ্যোগে মুহ্সিন ফান্ডের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে

---

[৫৬] ওয়াকিল আহমদ,উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা,প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১০২।

[৫৭] আ. ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।

[৫৮] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে (১৮৭৪)। এর সাথে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি-ফার্সী বিভাগ খোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন : 'দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত করেছি'।[৫৯]

Mohamedan Literary Society-এর সভায় তিনি ১৮৭০ সালে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীকে আহবান করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নওয়াব আবদুল লতিফ উক্ত বক্তৃতার ধারা বিবরণী নিজে প্রণয়ন করে তার পাঁচ হাজার কপি ভারতের মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।[৬০]

আবদুল লতিফ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরালোভাবে সমর্থন করতেন এবং এটাকে তুলে দিয়ে এর স্থানে মুসলিমদের জন্য আধুনিক ইংরেজি স্কুল-কলেজ স্থাপন করার যে প্রস্তাব সৈয়দ আমীর আলী করেছিলেন, তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। অবশ্য সরকার আবদুল লতিফের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই প্রভাব ও সুপারিশের ফলে বাংলাদেশে দু'টি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা - একটি আধুনিক এবং অপরটি ঐতিহ্যিক অর্থাৎ মাদ্রাসা—স্থায়ীভাবে টিকে আছে।[৬১]

নওয়াব আবদুল লতিফ সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ এরকম - তিনি অত্যাধিক রাজভক্তি দেখিয়েছেন, তাঁর কর্ম প্রয়াস আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারে কাছেও যাননি, তিনি রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রেখে শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছেন, তিনি বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে

---

[৫৯] ওয়াকিল আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।

[৬০] Bradley-Birt, F.B. op. cit., P. 131.

[৬১] বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৫৭।

প্রাধান্য দিয়েছেন ইত্যাদি।[৬২] উক্ত সব মন্তব্য তাঁর ক্ষেত্রে আংশিক সত্য হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি যা করেছেন তা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, বরং তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের স্বার্থেই তা করেছেন। অবশ্য বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর মনোভাব এমনটি না হলে আরও ভাল হত। কলিকাতার ক্ষয়িষ্ণু, ভগ্ন, জরাগ্রস্ত সামন্তবৃত্তের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে যদি বাংলার জনগণের সাথে একাত্ম হতে পারতেন, তাহলে তাঁর কর্মের সুফল সম্ভবতঃ অধিক ফলত। এতদ্সত্ত্বেও বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য।

আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) বাংলায় মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি ও জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৯০-১৯০৪ খ্রীঃ) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। ইতোপূর্বে আর কোন ভারতীয় এ সম্মান পাননি। তিনি ১৮৬৪ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নবাব ও ১৮৮৭ সালে সি.আই.ই উপাধি লাভ করেন।[৬৩]

> জ্ঞানগর্ভ, তথ্য ভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন সৈয়দ আমীর আলীর অবিস্মরণীয় কীর্তি। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিত্তিক রচিত গ্রন্থসমূহ তিনি যে উদ্দেশ্যে রচনা করেন তা হচ্ছে— মুসলিম চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ সাধন, আত্ম-জিজ্ঞাসার

---

[৬২] দেখুন : আ. ফ. সালাহ উদ্দীন আহমদ, 'উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭; W. S. Blunt, India Under Ripon, London, 1909, P. 97; সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৭; ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

[৬৩] আ. ফ. সালাহ উদ্দীন আহমদ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, পৃঃ ২৮৮; বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাগ, পৃঃ ৫৮-৫৯; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১২-১৩।

উদ্বোধন এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণ ত্বরান্বিত করা।

তাঁর মতে, মুসলিম জাতির পতনের মূল কারণ ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করা এবং ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই মুসলিমদের পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৬৪] স্যার সৈয়দ আহমদের ন্যায় সৈয়দ আমীর আলী ইসলামকে উনিশ শতকের ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ণ ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। একদিক দিয়ে তিনি স্যার সৈয়দকেও ছাড়িয়ে গেছেন। স্যার সৈয়দ আহমদ যেখানে বলেছেন যে, ইসলাম প্রগতির পরিপন্থী নয়, সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামই প্রগতির প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিমদের উচিত 'ইজ্‌তিহাদ্' প্রয়োগ করে সমকালীন অবস্থার আলোকে এবং যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের পুনর্মূল্যায়ণ করা।[৬৫]

উনিশ শতকের মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন এবং ১৮৭৮ সালে National Muhammedan Association নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[৬৬] অবশ্য কেহ কেহ উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৭ সাল বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] তবে প্রথম মতটি সঠিক বলে মনে হয়।

এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন করা এবং অতীতের সুমহান ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা লাভ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সমকালীন যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে

---

[৬৪] Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, London, 1955 (8th edition), P. VII (Preface).

[৬৫] Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Ibid, P. 184.

[৬৬] সুফিয়া আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

[৬৭] ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০; সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৮৯।

একটা সমঝোতা সাধন করা।[৬৮] এর অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল - ভারতীয় মুসলিমদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ, তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় করা। ভারতের অমুসলিম অধিবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও ছিল এ সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৬৯] ১৮৮৩ সালে সংগঠনটিকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে এর নাম পরিবর্তন করে Central National Muhammedan Association রাখা হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর কমপক্ষে পঞ্চাশটি শাখা স্থাপিত হয়।

১৮৮২ সালে সংগঠনের পক্ষথেকে বড়লাটের কাছে একখানা 'স্মারকলিপি' পেশ করা হয় এবং এতে মুসলিমদের কতগুলি দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা হয়। এদের মধ্যে একটি ছিল বাংলাতে অন্ততঃ সরকারী চাকুরীর এক-তৃতীয়াংশ যাতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[৭০] সংস্থার ১৮৮২ সালের স্মারক পত্রে সরকারের নয়া শিক্ষানীতিকে গতিশীল বলে অভিনন্দিত করা হয়। এই নীতি ছিল মূলতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি। স্মারকলিপির ভাষায়-

> æEvery hope for the regeneration of India depends at present upon the spread of English education and the diffusion of Western ideas through the medium of the English language."[71]

১৮৮২ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Nineteenth Century নামক পত্রিকায় A Cry from the Indian

---

[৬৮] The Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association with a list of the members, Calcutta, 1882; K. K. Aziz (ed.), Ibid, P. 46.

[৬৯] আ. ফ. সালাহ উদ্দীন আহমদ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।

[৭০] Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism : Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century, Cambridge, 1968, P. 312 (foot note).

[৭১] K.K. Aziz (ed.), op.cit., P. 38.

Mohamedans নামক প্রবন্ধে সরকারের কাছে সংস্থার দাবিগুলোর পুনরুল্লেখ করেন, যদিও নওয়াব আব্দুল লতিফের বিরোধিতার ফলে তা নাকচ হয়ে যায়।[৭২]

সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাশীল কর্মধারা ও মননশীল রচনাবলী বাংলার মানুষের কাছে যদি সরাসরি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হত, তা হলে সম্ভবতঃ তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোয়ার আনতে পারতেন। তবে তিনি সমাজের বদ্ধ মুখ, রুদ্ধ গতি অপসারিত করে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে খানিকটা হলেও সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[৭৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের শেষপাদে উত্তর ভারতে দু'টি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। একটি দেওবন্দে (১৮৬৭ খ্রীঃ) এবং অন্যটি আলীগড়ে (১৮৭৫ খ্রীঃ)। প্রথমটির নেতা ছিলেন মাওলানা আবুল কাশেম নানুতুভী (১৮৩২-৮০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়টির স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ)। দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে প্রথমোক্ত আন্দোলন ও মতবাদ গড়ে উঠে। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মূলতঃ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ)-এর মতাদর্শের অনুসারী। প্রথম দিকে তাঁরা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। Moin Shakir-এর বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা প্রচন্ড বৃটিশবিরোধী ছিলেন, তবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমর্থক ছিলেন।[৭৪] প্রথমে তাঁরা আধুনিক শিক্ষারও বিরোধিতা করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণ করলে মুসলিমগণ খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। তাই বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং ইসলামী চেতনার বিকাশ সাধন ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।

---

[৭২] সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।
[৭৩] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৬।
[৭৪] Moin Shakir, Khilafat to Partition, 1919-1947, Delhi, 1970, P. 40.

দেওবন্দপন্থীগণ মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। [৭৫] তাঁরা আধুনিক চিন্তা-চেতনা বা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় পশ্চাদ্‌গামী ছিলেন।[৭৬]

অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম জাতির পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। মুসলিম সমাজের উন্নয়নকল্পে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এই যে, তিনি ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে 'আলীগড় মোহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন। এ কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে কবি আলতাফ হুসায়ন হালী, মুহ্‌সিনুল্‌ মুল্‌ক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেন।[৭৭]

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন সাহসী, উদারমনা ও বৃটিশ সমর্থক নেতা হিসেবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন কংগ্রেস বিরোধী মুসলিম নেতা হিসেবে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি বৃটিশ সরকারকে এ যুক্তিতে সমর্থন করেছিলেন যে, বৃটিশ রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই বাংলা-ভারতের অধিবাসীগণ আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে এবং বিভিন্নদিকে অভূতপূর্ব উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৮৫৮ সালে তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করেন,[৭৮] যেখানে তিনি এ মত ব্যক্ত করেন যে,

---

[৭৫] Z. H. Faruqi, 'Muslim Opposition to Pakistan', T. W. Wallbank (ed.), The Partition of India : Causes and Responsibilities, Boston, 1966, P. 59.

[৭৬] S. Abid Hussain, The Destiny of Indian Muslims, Bombay, 1965, PP. 43-44.

[৭৭] আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৪-৫।

[৭৮] পুস্তকটির উর্দু নাম 'আসবাব'-ই বাগাওয়াত-ই হিন্দ' এবং ইংরেজি নাম 'On the causes of the Indian Revolt'.

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের মূল কারণ হল বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ ও পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব। তাই তিনি সুপারিশ করেন যে, অনতিবিলম্বে ভারতীয় আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।[৭৯] বৃটিশ সরকার তাঁর এ সুচিন্তিত সুপারিশকে স্বাগত জানায়।

সুতরাং বলা যায় যে, স্যার সৈয়দ এদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া প্রথম দিকে তিনি মনে করতেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলিম প্রকৃত অর্থে এক জাতি এবং তিনি তাদের এক হওয়ার জন্য মনে প্রাণে আহবান জানিয়েছিলেন।[৮০] ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত Indian Association -এর সভায় তাঁকে যে মানপত্র দেয়া হয়, তার উত্তরে তিনি বাঙালীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। [৮১]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) স্থাপিত হওয়ার প্রায় এক বছর পর ১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'United Indian Patriotic Association'. কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে। অপরদিকে Patriotic Association-এর সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন নবাব ও জমিদার শ্রেণীর লোক এবং এঁরা ছিলেন বৃটিশদের একান্ত অনুগত। কংগ্রেসের মতো হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই এ সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এ সমিতির একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, যেখানে এর উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ পুস্তিকায় দেখা যায় যে, Patriotic Association-এর হিন্দু সদস্যগণ যেমন

---

[৭৯] G. F. L. Graham, The Life and Works of Sir Syed Ahmad Khan, London, 1909, 2nd ed., PP. 27-28; আরও দ্রঃ, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ'র ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকা,, ১৯৮২, পৃঃ ৩৬১-৬২।

[৮০] The Moslem Chronicle, Calcutta, June 4, 1896.

[৮১] Ibid; A. F. Salahuddin Ahmed, 'Political Thought and Activities in the Ninetheenth Century' in History of Bangladesh, Vol. one, Sirajul Islam (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992, P. 258.

কংগ্রেসকে হিন্দুবিরোধী সংস্থা বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি আবার এর মুসলিম সদস্যগণও কংগ্রেসকে মুসলিম বিরোধী দল হিসেবে মনে করতেন। মুসলিম স্বার্থের প্রতি স্যার সৈয়দের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেস ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রণয়নের দাবি করছিল, তা পূরণ হলে এদেশের মুসলিমগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেহেতু সাধারণ নির্বাচনের ফলে তারাই ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে এবং মুসলিমরা বঞ্চিত ও অবহেলিত থেকে যাবে। বস্তুতঃ ১৮৯২ সালে Indian Councils' Act অনুযায়ী দেখা গেল, খুব কম সংখ্যক মুসলিমই নির্বাচিত হতে পেরেছে[৮২]।

তাছাড়া বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০)-এর ন্যায় কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম জনসাধারণের মনে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এ সময় হিন্দুত্বের পুনরুত্থান আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তিলক ও তাঁর অনুসারীরা এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের উদ্যোগে ঘটা করে 'শিবাজী উৎসব' পালন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গো-হত্যা নিবারণের জন্য গো-রক্ষা সমিতিও গঠিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক হিন্দু নেতার এই ধরনের কার্যকলাপ এবং সেই সঙ্গে থিওডোর বেক ও থিওডোর মরিসন প্রমুখ কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্ররোচনায় ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়[৮৩]।

উনিশ শতকের উক্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিশ শতকে আরো তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম নেতা উভয় সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন-১৯১৬ সালের কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লখ্‌নৌ চুক্তি, ১৯২৩ সালে সম্পাদিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে মুসলিম নেতাদের বেঙ্গল প্যাক্‌ট, ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক

[৮২] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।
[৮৩] পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬৯।

নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতার স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের প্রস্তাব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মুসলিম জাগরণের নব-পর্যায়ে ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত 'নসিহতনামা' বিষয়ক বহু বইপত্র প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্খার চেয়ে সমাজ সংশোধনের প্রেরণাই এসব বই লেখার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এসব বই-পুস্তক বাংলার মুসলিমদেরকে তাদের আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে নিজেদের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত আলিম মুহাম্মদ নঈমুদ্দীনের (১৮৩২-১৯০৮) 'জুবদাত আল্ মাসাইল', শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১)-এর 'হজরত মোহাম্মদের (স.) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭), 'ইসলাম' (১৮৯৬), 'নামাজ তত্ত্ব' (১৮৯৮) ও 'হজ্ব বিধি' (১৯০৩); একীনুদ্দীন আহমেদের 'ইসলাম ও ধর্ম-নীতি' (১৯০০); সমিরুদ্দীন আহমদের 'মুহাম্মদীয় ধর্ম সোপান' (১৯০২) এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 'ঈদুল আযহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে লেখকগণ মুসলিম জাগরণের যে প্রয়াস চালান, তা মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক অবদান রাখে। এতদ্ব্যতীত আরও যেসব গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয়, সেগুলো হচ্ছে– রিয়াজ উদ্দীন আহমদের 'সূর্য বিজয়' (১৮৯৫) এবং 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯-১৯০৮); আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮); মুইজুদ্দীন আহমদের 'তুরস্কের ইতিহাস' (১৯০৩); শেখ আবদুল জব্বারের 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৬) ও 'মদীনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭); নওশের আলী খান ইউসুফ জাঈয়ের 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১);

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২)-এর 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫) ও 'মহাশ্মশান কাব্য' (১৯০৪) ইত্যাদি[৮৪]।

এ সময়ে মুসলিম সমাজে একদল প্রখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশ্হাদী (১৮৫৯-১৯১৯), মুন্শী জমীর উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), দেলোয়ার হোসেন আহমদ মীর্জা (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জাঈ (১৮৪৫-১৯১০), মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮৫]

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার মফস্বল এলাকায় বিশেষতঃ নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের বইপত্রে ইসলাম, মুসলিম ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অপপ্রচার চালায়। তাদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে নব্যশিক্ষিত মুসলিম ও আলিম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসেন।[৮৬]

---

[৮৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০

[৮৫] বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। এঁদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং হাকিম হাবিবুর রহমানের জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদান সম্পর্কে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা হল। উল্লেখ যে, হাকিম হাবিবুর রহমানের অবদান উর্দু সাহিত্যকে ঘিরে এবং অন্যদের বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে আবর্তিত হয় - গবেষক।

[৮৬] খ্রীষ্টান মিশনারী বিষয়ক বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে; Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857), Chittagong, 1965; সহ দ্রঃ Sunil Kumar Chatterji, Srerampore

খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সে সময় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন যশোরের মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেন- ১. ওয়াজ-নসিহত, ২. লেখালেখি, ৩. পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার, ৪. বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ৬. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণকে আত্মসচেতন করে তোলা। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত প্রতিটি কর্ম-কৌশল মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ খ্রীষ্টানদের সাথে বেশ কিছু বাহাসে (তর্ক যুদ্ধে) অবতীর্ণ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেন। তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, খ্রীষ্টানদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পরাভূত করার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হল মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রচার। তাই তিনি গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের Muslim Educational Conference-গুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার জন্য তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। আবার গ্রামাঞ্চলের ওয়াজ মাহফিলগুলিতেও তাঁর আকর্ষণ ছিল অতুলনীয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী ছিলেন শেখ জমিরুদ্দীন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে স্বধর্মে ফিরে যান এবং মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকারীরূপে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৮৭] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শেখ জমিরুদ্দীন পুনঃইসলাম গ্রহণ করলে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁকে লিখেছিলেন ঃ

Missionaries and Christian Muslim Interaction in Bengal, Calcutta, 1981; K.P. Sengupta, The Christian Missionaries in Bengal, Calcutta; মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'বৃটিশ বাংলায় খৃষ্টান মিশনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৪-তম বার্ষিক সম্মেলন-২০০৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণিকা'; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১; নাসির হেলাল, মুসলিম জাগরণে মুন্‌সী মেহের উল্লা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ জুন, ২০০২।

[৮৭] যশোর জেলায় খ্রীস্ট মন্ডলী, পৃঃ ৪২-৪৩; উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, মুসলিম জাগরণে মুন্সী মেহের উল্লা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ জুন, ২০০২।

"প্রিয় ভ্রাতঃ আচ্ছালামু আলায়কুম। পরে জানিবেন- আপনার ১৪ই বৈশাখের পত্র পাইলাম। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সুধাকরে' প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করুন, যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহন করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকটে পরিচিত হইলে আমরা দূর দারাজহস্ত ধর্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই মুসলমান সমাজের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে ইসলাম প্রচার করিয়া প্রতিপিত্তি লাভ করিতে পারিবেন। আজকাল বঙ্গদেশে বাঙ্গালা অভিজ্ঞ ইসলাম প্রচারকের এতই আবশ্যক হইয়াছে যে, আপাততঃ ২০/২৫ জন ভাল প্রচারক হইলেও সে অভাব পূরণ হয় না।"[৮৮]

এমনিভাবে তাঁর উৎসাহে গড়ে উঠেছিল একটি দক্ষ ওয়ায়েয গোষ্ঠী। এঁরা হলেন শেখ (মুন্‌শী) মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, শেখ ফজলুল করিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মনীষী। ওয়ায ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে তিনি এতটাই সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে, তৎকালীন সময়ে বাংলা, বিহার ও আসামে তাঁর সমকক্ষ কোন ওয়ায়েয ছিল না। তাই তাঁকে 'বাগ্মীকুল তীলক', 'বক্তাকুল শিরোমনি', 'যশোরের চেরাগ', 'বাংলার মার্টিন লুথার', 'মুসলিম জগতের রামমোহন' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৮৯]

উক্ত সময়ে মুসলিম গণজাগরণের ক্ষেত্রে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের লেখালেখি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত

---

[৮৮] উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, মুন্সী মেহের উল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪।
[৮৯] পূর্বোক্ত, মাসিক বাসনা, কলিকাতা, চৈত্র, ১৩১৫ বাংলা।

পুস্তিকা 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৭)। খৃষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় শেখ জমিরুদ্দীনের 'আসল কুরআন কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধখানা প্রকাশিত হয়, যাতে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন 'আসল কুরআন' কোথাও নেই। এ লেখাটির জবাবে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ লিখেন 'ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোকা ভঞ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধখানা, যা কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকার ১২৯৯ ও ১৩০০ সালের চৈত্র-বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বের হয় এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এর পরই জমিরুদ্দীন পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসেন। এভাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একে একে রচনা করেন- ১. রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম-১ম খন্ড (১৮৯৫), ২. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮), ৩. খ্রিস্টান ও মুসলমান তর্কযুদ্ধ (১৯০৮), ৪. ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮), ৫. জওয়াবোন্নাছারা (১৯০৯), ৬. বাবু ইশান চন্দ্র মন্ডল ও চার্লস্ ফাঙ্কের ইসলাম গ্রহণ (সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রন্থ।[৯০] এসব পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর প্রগাঢ় ধর্ম জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যে কেবল নিজেই লিখেছেন তা নয়, বরং লেখালেখির ক্ষেত্রেও তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি লেখকগোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন কেউ কেউ সরাসরি কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যরা ছিলেন সাংবাদিক। তাঁর অনুসারী সাংবাদিকগণ ইতিহাসে 'সুধাকর দল' নামে সুপরিচিত। অন্যদিকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী কবি-সাহিত্যিকরা হলেন- শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ ফজলুল করীম বিদ্যাবিনোদ, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পশ্চাৎপদ মুসলিমদের জাগরণের লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রচারের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'মিহির', 'মিহির ও সুধাকর' 'সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার সাথে

---

[৯০] নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১; অধ্যাপক আবদুল গফুর (সম্পা.) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

জড়িত থেকে কাজ করেছেন, এমনকি পত্রিকার গ্রাহক বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন মাহফিলে ঘোষণা প্রদান করেছেন।

মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য, তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্য, ইসলামের দাওয়াত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি বক্তৃতা, লেখা-লেখি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। যেমন তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক সংগঠন, নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি, আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম, যশোরে 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাসহ বহু স্কুল-মক্তব, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন[৯১]।

বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন না হলে কোন কিছুতেই যে কল্যাণ হবে না, এ বিষয়টা মাথায় রেখেই তিনি ওয়ায মাহফিল ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতেন। তাঁর জীবনীকার আসির উদ্দীন প্রধান এরূপ একটি জলসার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> "চার সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতিতে স্বনামধন্য বক্তা বাগ্মীকুল তীলক মুন্‌শী সাহেব মাগরেবের নামাজ অন্তে দন্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব-মাদ্রাসা ও স্কুল স্থাপন, শিল্প-শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।"[৯২]

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের দেয়া বিবরণ হতে জানা যায় যে, মেহেরুল্লাহ্ মুসলিম সমাজে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষিকাজ করার জন্য। তাঁর চেষ্টা বহু স্থানেই

---

[৯১] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।
[৯২] উদ্ধৃত : নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

ফলবতী হয়েছিলো।[৯৩] এক কথায় বলতে গেলে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন এবং বিস্ময়কর। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র সহকর্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীও (১৮৭৯-১৯৩১ খ্রীঃ) মুসলিম জাতিকে আত্ম-পরিচয়ে উদ্ধুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ পড়ে সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর স্বাধীনচেতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

স্বসমাজের স্বার্থের অথবা আদর্শের বিরুদ্ধে যখন কোন আঘাত এসেছে, তখনই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন আল্‌-কুরআনকে সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে স্বীকার করতে চাননি; বরং তিনি উক্ত সভায় শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, মার্টিন লুথার, রামমোহন রায় প্রমুখকে প্রেরিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন। সিরাজী গিরিশ চন্দ্রের এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন।[৯৪] অনুরূপভাবে বনোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় ও 'গোক্ষিণী সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পন্ডিত যাদব চন্দ্র তালুকদার গো-হত্যার বিরোধিতা করে বক্তৃতা করলে সৈয়দ সিরাজী হিন্দুশাস্ত্র হতে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, পূর্বকালে আর্যরা গো-হত্যা সমর্থন করতেন। [৯৫] তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে এসব প্রতিবাদ খুব দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল।

বনোয়ারী লাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত অপর একটি জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌। সৈয়দ সিরাজী উক্ত সভায় 'অনল-প্রবাহ' নামক একখানা কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি স্বদেশানুরাগ ও ইসলামের ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত হয়েছিল। মুন্‌শী

---

[৯৩] শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, কর্মবীর মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্‌, পৃঃ ৮৮।

[৯৪] ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬০।

[৯৫] দেখুন, মোহাম্মদ সেরাজুল হক, সিরাজী চরিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩০-৩৩।

মেহেরুল্লাহ্ ইসলামী ভাবধারায় মুগ্ধ হয়ে ১৮৯৯ সালে নিজ ব্যয়ে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। সৈয়দ সিরাজী পরের বছর অনল-প্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ; ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা- এই নয়টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। স্বজাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় মুক্তি ও উন্নতি সাধনের উদাত্ত আহবান ধ্বনি 'অনল-প্রবাহে'র প্রায় প্রতিটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।[৯৬] 'ইসলাম প্রচারক'-এ এর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, কবিতাগুলি মহাওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলিমদের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়, তাই পাঠ করলে মুগ্ধ হতে হয়।[৯৭]

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭) ও 'উদ্বোধন' (১৯০৭) একই ভাবধারায় রচিত। তিনি এক্ষেত্রে ইসলামের গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করে ভারতীয় মুসলিমদের নবজাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি তুরস্ক ভ্রমণের পর তুরস্কের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেছেন 'তুরস্ক ভ্রমন' (১৯১৩), 'তুর্কী নারী শিক্ষা' (১৯১৩) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ। এরপর তিনি 'স্পেন বিজয়' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জিবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলি' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'রায় নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ', 'নূর-উদ্দীন' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এসব রচনায় প্রধানতঃ ইসলামী ভাববৃত্তেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।[৯৮]

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বসমাজের সমালোচনায়ও তিনি ছিলেন নির্ভীক ও অকপট। 'মোল্লা চিত্র' কবিতায় 'কাট-মোল্লা' শ্রেণীকে সিরাজী কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি উক্ত সময়ের মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার

---

[৯৬] পূর্বোক্ত।
[৯৭] ইসলাম প্রচারক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩০৭।
[৯৮] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২।

এবং সেখানে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তাফসীর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্ভুতজ্ঞান বিশিষ্ট 'কাটমোল্লা' ব্যতীত প্রকৃত আলিম তৈরি হওয়ার কোন আশা নেই।[৯৯]

'আত্মশক্তি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> "উন্নত জাতি অধঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কাহিনীই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করিতে পারে। প্রাচীন গৌরব কথাই তাহাদিগের কর্ণে অমৃতবাণী উচ্চারণ করে। আজ আমরা, বঙ্গের মুসলমান, যদি পূর্বপুরুষদিগের শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত থাকিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের দুঃখ-দুর্দশা-দীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত।"[১০০]

সমাজের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় যে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-নির্ভরতা, সৈয়দ সিরাজী সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে, বিশ্ব সংসারে সর্বদা যোগ্যের পূজা, উপযুক্তের আদর ও শক্তিশালীরই প্রতিষ্ঠা হয়।[১০১]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হতে থাকে। এ সময় থেকে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বাংলার মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

১. আঞ্জুমানে ইসলামী, কলিকাতা (১৮৫৫) হচ্ছে মুসলিমদের প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শ্রেণী-গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলিমের

---

[৯৯] ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩।
[১০০] ইসলাম-প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪।
[১০১] পূর্বোক্ত।

স্বার্থসংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান করা ছিল এর মূল লক্ষ্য।[১০২] Hindu Intelligencer এবং Hindu Patriot পত্রিকা দু'টি আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছিল। [১০৩]

২. নবাব আবদুল লতিফ কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে Mahomedan Literary Society প্রতিষ্ঠা করেন[১০৪]

৩. সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৮ সালে 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৮৮৩ সালে 'Central National Mahomedan Association নামে অভিহিত হয়। [১০৫] এর উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক উপায়ে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি বিধান করা এবং মুসলিম মানসকে গোঁড়ামিমুক্ত করার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করা।[১০৬]

৪. মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ আল্ উবায়দী সুহ্রাওয়ার্দী (১৮৩৪-৮৫)-এর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে ঢাকায় মুসলিমদের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'সমাজ সম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় উন্নতি ও হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি সাধন ছিল সমাজ সম্মিলনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য। [১০৭]

---

[১০২] Jayanti Maitra, Muslim Politics in Bengal, Calcutta, 1984, P. 76.
[১০৩] Ibid, PP. 75-76.
[১০৪] নওয়াব আবদুল লতীফ খান সি.আই.ই., মুসলিম বাংলা : আমার যুগে (অনুবাদ : আবুজাফর শামসুদ্দীন), ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৭; Enamul Haque (ed.), Nawab Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968, P. 142.
[১০৫] 'The Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association with a List of the Members, Calcutta, 1882', in K. K. Aziz (ed.), Ameer Ali : His Life and Works, Lahore, 1968, P. 46.
[১০৬] Ibid, P. 8
[১০৭] ঢাকা প্রকাশ, ২৩ চৈত্র, ১২৮৬।

৫. ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় মুসলিমগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করাই এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০৮]

৬. সমাজ সংস্কার ও মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধনার্থে ১৮৮০ সালে চট্টগ্রামে 'ইসলাম এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। আমান আলী ও কাজেম আলী মাষ্টারদ্বয় এ সমিতির কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন।[১০৯]

৭. ১৮৯১ সালে চট্টগ্রামে 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জনহিতকর কর্ম ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এর অবদান ছিল অপরিসীম। মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, আর্থিক সাহায্য প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সোসাইটি পরবর্তী কয়েক যুগ পর্যন্ত কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। খানবাহাদুর আবদুল আজিজ এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন।[১১০]

৮. ১৯০১ সালে সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'নূর-আল্-ইমান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১১] তবে ওয়াকিল আহমদ এর প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করেছেন ১৮৮৪ সাল।[১১২] ইসলাম প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার এ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১১৩]

৯. ১৯০২ সালে কলিকাতায় 'মোসলেম ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা এবং সমাজসেবা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১১৪]

১০. ১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ও সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যেই এর জন্ম হয়।

---

[১০৮] ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ঢাকা, ১৮৮৪, পৃঃ ১; মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, মাহে নও, বৈশাখ, ১৩৭৪।

[১০৯] মাহবুবুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১ম খন্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, পৃঃ ১৩।

[১১০] আবদুর রহমান, যতটুকু মনে পড়ে, চট্টগ্রাম, ১৯৭২, পৃঃ ১৬, ২৬, ২৭৬, ৩৫৭, ৫৯৪।

[১১১] ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

[১১২] উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

[১১৩] মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ১৩২।

[১১৪] ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

মির্জা সুজাত আলী বেগ, দেলোয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ এর সাথে জড়িত ছিলেন।[১১৫]

১১. ১৯০৭ সালে কলিকাতায় 'খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা।[১১৬] কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯০৯ সালে পুনরুজ্জীবিত হয়। [১১৭]

১২. ১৯০৭ সালে 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' নামে একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয়। গরীব মুসলিম জনসাধারণের উন্নতি বিধান, ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা ছিল এ সমিতি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য।[১১৮]

১৩. জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯০৯ সালে মুর্শিদাবাদের নওয়াবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আঞ্জুমানে বাঙালী' প্রতিষ্ঠিত হয় ।[১১৯]

১৪. মুসলিম সমাজের এতিম সন্তানদের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ১৯১০ সালে নওয়াব সুলতানুল আলম কর্তৃক 'বীরভূম আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' ও 'কলিকাতা মুসলিম এতিমখানা' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২০]

১৫. ১৯১১ সালে বীরভূমে 'আঞ্জুমানে মোজাক্কেরীয়া ইসলাম' নামক একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সাথে এ সংগঠনের সম্পৃক্ততা ছিল।[১২১]

১৬. জনসেবামূলক কার্যপদ্ধতি এবং দেশাত্মবোধ উদ্রেককারী সাহিত্য ও শরীর চর্চার লক্ষ্যে ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে মাওলানা মনিরুজ্জামান

---

[১১৫] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।
[১১৬] দি মুসলমান, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭।
[১১৭] পূর্বোক্ত, ১৭ ডিসে. ১৯০৯।
[১১৮] পূর্বোক্ত, ১২ এপ্রিল, ১৯০৭
[১১৯] পূর্বোক্ত, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৯।
[১২০] পূর্বোক্ত, ২৯ এপ্রিল, ১৯১০।
[১২১] পূর্বোক্ত, ২৮ এপ্রিল, ১৯১১।

ইসলামাবাদীর উদ্যোগে 'খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি'-এর একটি শাখা স্থাপন করা হয়।[১২২]

১৭. ইসলাম প্রচার, ইসলামের সত্যিকারের দিক নির্দেশনা জনগণের সামনে তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯১১ সালে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙালা' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৩]

১৮. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', যা সমাজে অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[১২৪]

১৯. ইসলাম মিশন, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা ইসলামাবাদী ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে 'আঞ্জুমানে ওলেমায়ে বাঙ্গালা' নামক প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লাভ করে। 'আল্ এসলাম' নামক একটি পত্রিকাটি এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়।[১২৫]

২০. ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়।[১২৬] এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল- "...বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান।"[১২৭] এর মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৬) মুসলিম সমাজের গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।[১২৮]

---

[১২২] পূর্বোক্ত, ২৫শে আগষ্ট, ১৯১১; আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮, ৮৯।
[১২৩] দি মুসলমান, ৫ নভেম্বর, ১৯২০; ইসলাম দর্শন, চৈত্র, ১৩২৭।
[১২৪] আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।
[১২৫] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১৭; আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, অতীতের কথা, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১০; আল্-এসলাম, পৌষ, ১৩২৭ এবং আষাঢ়, ১৩২৭ সংখ্যা।
[১২৬] বার্ষিক বিবরণী, শিখা, ১ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃঃ ২১।
[১২৭] কাজী আবদুল ওদূদ, শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ নিবেদন অংশ।
[১২৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত , পৃঃ ৪৪৭।

২১. উত্তর ভারতে ড. সাইফুদ্দিন কিচ্লুর নেতৃত্বে গঠিত 'তান্জিম্' কমিটির অনুকরণে ১৯২৬ সালে বাংলায় 'বেঙ্গল তান্জীম কমিটি' গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও সমাজের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা।[১২৯]

২২. মজিবর রহমান খাঁ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীনসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ১৯৪২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩০] সমাজের অগ্রগতি ও মঙ্গলের জন্য বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার রাজ্য থেকে নৈরাজ্য দূরীকরণই ছিল এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য।[১৩১]

উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও এ জাতীয় আরও বেশ কিছু আঞ্জুমান ও সমিতির পরিচয় পাওয়া যায, যেগুলো মুসলিম সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তথা বাংলায় মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। যেমন- আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে কওম, আঞ্জুমানে মইদুল ইসলাম, আঞ্জুমানে জাহেদুল ইসলাম, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, আঞ্জুমানে আহলে হাদীস, আঞ্জুমানে আহমদী প্রভৃতি।[১৩২]

সমাজ হিতৈষীর ক্ষেত্রে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। দেশ, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির উন্নতি, সংস্কার, পরিবর্তন একান্তভাবেই সংবাদ-সাহিত্য সাপেক্ষ। সংবাদ-সাহিত্যের প্রচার কালে এখন দল ভাঙ্গে গড়ে, নেতৃত্বের হয় উত্থান-পতন, দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের কথা বিবেচনা- এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং পতনও এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কাজেই একে বলা হয় - চতুর্থশক্তি ।[১৩৩]

---

[১২৯] দি মুসলমান, ২৮শে মে, ১৯২৬ এবং ৪ঠা জুন, ১৯২৬ সংখ্যা।

[১৩০] মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫১।

[১৩১] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ২২৪-৪৪।

[১৩২] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪-২৪২ (সভা-সমিতি)।

[১৩৩] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'মুসলিম বাঙলার সংবাদ-সাহিত্য', মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০।

বাঙালী মুসলিম কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ পাদে। ১৮৮৯ সালে 'সুধাকর'-এর প্রকাশকাল থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। মুন্‌শী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখ বুঝতে পারেন যে, বাংলার মুসলিমদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-বেদনা ব্যক্ত করার জন্য প্রয়োজন বাংলা ভাষায় একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র। আর তাই এঁদের প্রচেষ্টায়ই 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়।[১৩৪]

সুধাকরের পূর্বেও বেশকিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হত।[১৩৫] হানিফি (১৯০৩), আহলে হাদীস (১৩২২), আল্ বুশ্‌রা (১৯২১), শরীয়াত (১৯২৪), আহমদী (১৯২৫), হানাফী (১৯২৬) প্রভৃতি সাময়িকী বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে পরিচালিত হত। এ সময়ের পত্র-পত্রিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাঙালী মুসলিম সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্র 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন মন্তব্য করেন যে, তৎকালে বাংলার মুসলিম সমাজে যেসব পত্র-পত্রিকা চালু ছিল তার অধিকাংশই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হত। সেই যুগে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতবাদ প্রচার করা ছিল বিপদজনক।[১৩৬]

অন্যদিকে আখবারে ইসলামীয়া (১৮৮৪), ইসলাম প্রচারক (১৮৯১, ১৮৯৯), নূর-আল ইমান (১৯০০), আল্ এছলাম (১৯১৮), ইসলাম দর্শন (১৯২০), আইনুল ইসলাম (১৯২৩), তবলীগ (১৯২৭), আল্ মুসলিম (১৯২৮), মক্তব (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকা ইসলাম ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল আদর্শ প্রচার করত। আবার কিছু কিছু পত্রিকা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করতো। পূর্বোক্ত 'নূর আল-ইমান' ও 'আল্ এছলাম' ছিল যথাক্রমে 'নূর আল্ ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে

---

[১৩৪] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত।
[১৩৫] ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
[১৩৬] মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ২৬, ২৭।

ওলেমায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র। তাছাড়া ইসলাম দর্শন (১৯২০) আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙালার, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির, সাম্যবাদী (১৯২৩) আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে কওমের, লাঙল (১৯২৫) শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলের, গণবাণী (১৯২৬) বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের, শিখা (১৯২৬) মুসলিম সাহিত্য সমাজের, মোয়াজ্জিন (১৯২৮) খাদেমুল এনছান সমিতির এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদী ১৯৩৭ সালের পর মুসলিম লীগের মুখপত্ররূপে কাজ করেছিল। কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকাও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। যেমন, আজাদ (১৯৩৬) মুসলিম লীগের, কৃষক (১৯৩৮) কৃষক-প্রজা পার্টির এবং নবযুগ(১৯৪৬) এ. কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রচার করত। ইংরেজি দৈনিক 'স্টার অব ইন্ডিয়া' ও 'মর্নিং নিউজ' মুসলিম লীগের মুখপত্র ছিল।[১৩৭] নিম্নে আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল ঃ

১. মিহির ও সুধাকর : শেখ আবদুর রহীম ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ও ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত এ সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো।

২. কোহিনূর : এ.কে.এম. রওশন আলী সম্পাদিত শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক এ মাসিক পত্রিকাখানা তিনটি পর্যায়ে যথাক্রমে ১৮৯৮, ১৯০৩ ও ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার এবং সমাজের হিন্দু-মুসলিমদের মিলন ও সমঝোতাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত হত, যা নিঃসন্দেহে একটি সমাজসেবামূলক পদক্ষেপ।[১৩৮]

৩. সোলতান : মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত প্রথমে মাসিক ও পরে সাপ্তাহিক হিসেবে তিনটি পর্যায়ে যথাক্রমে ১৯০১ সাল, ১৯০২ সাল ও ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এ পত্রিকাখানার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার। এটি

---

[১৩৭] দ্রঃ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, প্রাগুক্ত; আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত; আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত; ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত।

[১৩৮] মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

রাজনীতিতে ছিল জাতীয়তাবাদের সমর্থক এবং হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াসী। সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়[১৩৯]।

৪. মোহাম্মদী : মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক এ সৃজনশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকাখানা ১৯০৩ সালে মাসিক ও ১৯০৮ সালে সাপ্তাহিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন ঃ ''কত মুসলিম সংবাদপত্র এলো গেলো; কিন্তু সাপ্তাহিক মোহাম্মদী এখনও দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধরে ঘড়ির কাঁটার নিয়মানুবর্তিতার মতো বাংলার মুসলমানদের দুয়ারে তার সাপ্তাহিক হাজিরা দিয়ে আসছে —— এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তার একদিনও ব্যত্যয় ঘটেনি।''[১৪০] তখন মোহাম্মদীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বাঙালী মুসলিমদের নানা অভাব-অভিযোগ, উহার প্রতিকারের উপায় এবং দাবী।[১৪১] স্বতন্ত্র বাঙালী মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে একটানা দীর্ঘকাল তত্ত্বগত প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।[১৪২]

৫. আল-এসলাম : মাওলানা আকরম খাঁ ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত এ মাসিক পত্রিকাখানা ১৯১৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৪৩] পত্রিকাখানা সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে।

৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত এ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯১৮ সালে ১ম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য ও সমাজ চিন্তায় প্রগতিশীল ও উদার এবং ভাষাগত প্রশ্নে বাংলা ভাষার সমর্থক এ পত্রিকাখানা সমাজে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় প্রশংসনীয় অবদান রাখে।[১৪৪]

---

[১৩৯] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৮৪।
[১৪০] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত।
[১৪১] মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, যুগবিচিত্রা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ২৭৬।
[১৪২] অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩০৫।
[১৪৩] আল্-এছলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।
[১৪৪] সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গভাষা ও মুসলমান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭. সওগাত : মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন সম্পাদিত উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত এ মাসিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে ১৯২৮ সালে এর সাপ্তাহিক ও বার্ষিক সংস্করণ বের হয়। এটি ছিল মুসলিম পরিচালিত বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটিতে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন-চিন্তাসমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত এবং সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকদের লেখা প্রকাশ করে তাদের উৎসাহিত করা হত।[১৪৫]

৮. সাম্যবাদী ঃ মোঃ ওয়াজেদ আলী ও আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী সম্পাদিত এ ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানা সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য ছিল।[১৪৬]

৯. শিখা ঃ আবুল হুসেন (পরে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ) সম্পাদিত উদার, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল এ বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯২৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মূল বাণী ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।[১৪৭] পত্রিকাটি প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন'।[১৪৮]

১০. বুলবুল ঃ হাবীবুল্লাহ্ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ সম্পাদিত এ প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকাখানা ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নিরপেক্ষ সাহিত্যচর্চা ও বাঙালী সংস্কৃতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা ও অবদান রাখে। এটি শিখার সাথে তুলনীয়। মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও জাগরণের লক্ষ্যে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালায়।

উপর্যুক্ত সংবাদ সাময়িকীসমূহ ছাড়াও বাংলার আনাচে-কানাচে আরও বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, যেগুলো মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে মূলবান অবদান রাখে। দু'টি ইংরেজি পত্রিকা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম

---

[১৪৫] মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
[১৪৬] সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০।
[১৪৭] 'প্রকাশের নিবেদন, শিখা, চৈত্র, ১৩৩৩।
[১৪৮] পূর্বোক্ত।

সমাজের কল্যাণার্থে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল। প্রথমটি 'দি মোসলেম ক্রনিকল এন্ড দি মোহামেডান অবজার্ভার' এবং দ্বিতীয়টি 'দি মুসলমান'। এ দু'টি ছাড়া ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা হল- শাহ বদিউল আলমের 'মোহামেডান অবজার্ভার' (১৮৮২), স্যার আবদুর রহিমের 'মুসলিম স্টান্ডার্ড' (১৯৩২), মুজিবর রহমানের 'কমরেড' (১৯৩৭), খাজা নাজিমুদ্দীনের 'স্টার অব ইন্ডিয়া' (১৯৩৭), 'মর্নিং নিউজ' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বাঙালী মুসলিমদের সম্পাদনায় বেশ কয়েকটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলো মুসলিম সমাজের অবস্থা অনুধাবন ও প্রতিকারের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- দৈনিক নবযুগ (১৯২০), দৈনিক সেবক (১৯২২), দৈনিক ছোলতান (১৯২৬), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬), দৈনিক কৃষক (১৯৩৮) ইত্যাদি। অধঃপতিত বাঙালী মুসলিম সমাজের জাগরণে এগুলোর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ[১৪৯]।

উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিমরা ছিলেন গোষ্ঠী ও অঞ্চলে বিভক্ত। আরো সূক্ষ্মভাবে দেখলে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বর্ণবিভক্তি ছিল তখনকার এক প্রচ্ছন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য। মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছিল নিজেদের গোষ্ঠী কিংবা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফারায়েজী ও জিহাদ আন্দোলন তাদেরকে সেই বদ্ধ সামাজিক গন্ডী থেকে বের করে আনতে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে পরিচালিত আন্দোলন মুসলিম সমাজের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়। এই পরিবর্তন সৃষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ভূমিকা মূল্যায়ণ করে ১৯০৫ সালে 'ইসলাম প্রচারক' মন্তব্য করেছে- "বৃটিশ শাসনের সার্বিক পরিণতি সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা পুরোপুরি বুঝে উঠার আগেই ধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন"।[১৫০]

দেরীতে হলেও নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অংশ গ্রহণের ফলে মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। উনিশ শতকের শেষ

---

[১৪৯] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।
[১৫০] ইসলাম প্রচারক, চৈত্র, ১৩১২।

বছরগুলোতে ইসলাম প্রচারক আলিম সমাজ এবং নব্যশিক্ষিত মুসলিমদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই—

ক) মুসলিম সমাজের বিরোধীভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ ও মতানৈক্য প্রশমিত হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

খ) গ্রামের মুসলিমগণ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগধারায় মিলিত হতে শুরু করেন।

গ) মুসলিমদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম এক অভিন্ন ধারায় পরিচালিত হতে শুরু করে।

ঘ) বহু নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠন এবং আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ) বিপুল সংখ্যক নসিহতমূলক, ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও ঐতিহ্যধর্মী, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরবমূলক এবং নিজস্ব জাতিসত্তাভিত্তিক বই-পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়।

চ) বাংলা ভাষায় মুসলিমদের বেশ কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ-সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

ছ) মুসলিম সমাজ জীবনে ওয়ায-মাহফিল নামক শান্তিপূর্ণ দ্বীনী সম্মেলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ফলে মুসলিমগণ আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হন। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে তাঁদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য-চেতনা সৃষ্টি হয়। এক কথায়, উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুসলমিদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সংঘাত ও স্ববিরোধিতার বহু উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থের দু'টি ধারা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সমস্বার্থের এককেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। বিশ শতকের শুরু থেকে বাংলার মুসলিমগণ পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে এ যুগ শুরু হয়। কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে মুসলিমদের উন্নতির সুযোগ আবার বন্ধ হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর কঠোর প্রতিবাদ জানালে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী বড়লাট ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করলে তাদের এ সংকীর্ণ হিন্দু মানসিকতা মুসলিমদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধকে প্রবলতর করে। ভারতীয় মুসলিমদের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে কালক্রমে ১৯৪৭ সালে মুসলিমদের স্বাধীন আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে[১৫১]।

[১৫১] প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, পৃঃ ৮৭-৮৯। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত বিষয়ে প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী স্যারের পি, এইচ,ডি, থিসিসের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় সর্বাধিক সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জীবন

জন্ম, বংশ ও পরিবার পরিচিতি

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত বর্তমান সদর গাংনী থানাধীন গাঁড়াডোব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন[১]।

উপরিউক্ত গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর গ্রামে ১২৭৭ সালে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) ১৫ মাঘ সোমবার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন[২]। তাঁর পিতার নাম শেখ আমির উদ্দীন, মাতার নাম লফিরন বিবি। জমিরুদ্দীনের পিতামহের নাম শেখ মোহাম্মদ বাকের উদ্দীন। এ প্রসঙ্গে 'শরিয়ত' পত্রিকায় মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন—

আমার নাম শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। আমার পিতার নাম সুফী মোহাম্মদ আমির উদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেব। দাদাজির নাম শেখ মোহাম্মদ বাকের উদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেব[৩] তৎকালীন সময়ে তাঁর পিতা ও পিতামহের বেশ নাম ডাক ছিল। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের পিতা শেখ আমিরুদ্দীন যথেষ্ট ধর্মানুরাগী ও আল্লাহভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন।

মুনশী মনিরুদ্দীনের ভাষায়ঃ

''বাবাজান তাঁর শেখ আমিরুদ্দীন নামে।
ছিল অতি দিনদার পাক্কা মোছলমান।।
সরা শরিয়ত কাম দস্তুর মতন।
করিতেন বার মাস ভেবে নিরাঞ্জন।।
নামাজ রোজাতে ভারি ছিল ওস্তরায়।
নেকেতে ছিলেন রাজি বদেতে বেজার।।
বেদাত বেসারা চাল দেখিলে নজরে।
নছিহত দিত লোকে হরেক প্রকার''[৪]।।

---

[১] ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের বিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-২৯১।
[২] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, নতুন সংস্করণ, রাজশাহীঃ ১৯৬৭, পৃ-১ ।
[৩] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, খ্রীস্টিয় সমাজে আট হাজার, পৃ-৪৯।
[৪] আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা, কলিকাতাঃ ১৩০৮, পৃ-৩।

জমিরুদ্দীন নিজে তাঁর পিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ

তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ধর্মের নিয়মানুসারে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের পিতা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবি অপরদিকে একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী[৫]।

ধর্মপ্রাণ পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে জমিরুদ্দীনের বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। পিতা মাতার প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের উভয়ের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে তিনি দু'টি কবিতা রচনা করেন যা তাঁর 'শোকানল' পুস্তকে স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত 'আসল বাঙ্গালা গজল' পুস্তকটি পিতা মাতার নামে উৎসর্গ করেছিলেন[৬]।

মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের সমকালীন প্রায় সকল মনীষী তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর চরিত্রের অলঙ্কার ছিল বিনয় ও নম্রতা; ব্যবহার মাধুর্যে শত্রুকেও জয় করা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। জ্ঞান রাজ্যের প্রতিটি শাখায় তিনি বিশেষ উৎকর্ষ অর্জন করেন। যুগ প্রসিদ্ধ অনেক বিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছেন। সেকালে তিনি ১০/১২টি ভাষার উপরে দক্ষতা হাসিল করেন। তিনি এ দেশের মুসলমানদের অধঃপতনকে লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন এবং এই মহান পুরুষ হতভাগ্য মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন[৭]।

শিক্ষা জীবন

শৈশবে জমিরুদ্দীনের শিক্ষার সূত্রপাত হয় গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকটে। এর কিছুদিন পরে তিনি গ্রামের একটি মক্তবখানায় ভর্তি হন। শিশু জমিরুদ্দীন তাঁর প্রতিভা বলে অতি অল্প দিনের মধ্যে কায়দা, আমপাড়া ও কোরআন

---

[৫] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ-১৭।

[৬] পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।

[৭] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, ঢাকাঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৫), পৃ-৬১।

শরীফ আয়ত্ত্ব করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে শুরু করেন। তিনি শিশু বয়সেই রোজা রাখা অভ্যাস করেছিলেন। জমিরুদ্দীনের মেধা, স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা ছিল উল্লেখ করার মত। মক্তবের শিক্ষক তাই গর্ব করে বলতেন, জমিরুদ্দীনের প্রতিভার বিকাশ একদিন হবেই[৮]।

এর অল্পকাল পরে জমিরুদ্দীনের পিতা তাঁকে বাংলা ভাষা শিক্ষা করণার্থে বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেখানে ভর্তি হয়ে তিনি শিক্ষকের দেওয়া নির্দেশ অনুসারে গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কেবল বাংলা ভাষা জ্ঞানে নয়, ধর্মীয় বিষয়ে তথা ইসলাম ধর্মের সাধারণ জ্ঞানও আয়ত্ব করে ফেলেন। এভাবে মক্তব ও স্কুলে ছাড়াও আশে পাশের গ্রামে সর্বত্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

কবির ভাষায়,
''স্কুলে ওস্তাদ কাছে কোশেশ করিয়া।
লেখা পড়া শিখিতে লাগিল দেল দিয়া।।
জেহেন আছিল তেজ তাহার কারণে।
যাহা ধরে তাই শেখে ভোলেনা জীবনে।।
করিতে লাগিল খুব ওস্তাদের পিয়ার।
গেরামেতে নাম বড়া হইল তাহার''[৯]।।

জমিরুদ্দীনের জীবনী রচয়িতাকারীদের কারীদের মতে-অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, ফার্সি ভাষা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন, এমনকি তিনি সমভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান ও বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞানের সমুদয় শাখায় পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে পাঠ্য বিষয়াবলী ছাড়াও জমিরুদ্দীন অনেক জ্ঞানী-গুণী গ্রন্থকারের শত শত বই অধ্যয়ন করেন।

জমিরুদ্দীন ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ী হতে দু' মাইল দুরে আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান ছাড়া প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু ছাত্র। দু'-একজন অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রও ছিল। সুতরাং এই স্কুলে এসে তিনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রদের সাথে মেশার সুযোগ পান। তিনি আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে

[৮] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-১-২।
[৯] পূর্বোক্ত, পৃ-১১।

পাশ করার পর মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। এখানে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় তিনি জেলা সদর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন[১০]।

কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুল এতদাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সেখানে পাঠ শিখতে। যেহেতু এই স্কুলের লেখাপড়ার মান ছিল তুলনামূলকভাবে ভাল তাই সেখানকার পরিবেশ জমিরুদ্দীনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এই স্কুলের প্রভাব তাঁর দিক পরিবর্তনের সহায়ক ভূমিকা রাখে।

জমিরুদ্দীনের স্মৃতিশক্তির দীপ্তি যেন তাঁর চোখে মুখে প্রস্ফুটিত হতো; বিষয়টি স্কুলেও ছাত্র শিক্ষক সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে জমিরুদ্দীন একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ইতোমধ্যে নাম করে ফেলেছিল। নিজ ক্লাস ছাড়াও অন্যান্য ক্লাসের মেধাবী ছাত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বেশ ভাল। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে তিনি তাদের সাথে খোলা-মেলা আলাপ আলোচনা করতেন। তিনি এই স্কুলে পড়াশুনা কালে স্কুলের পাশের হোস্টেলে থাকতেন। হোস্টেলে তাঁর রুমে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আসতেন এবং জমিরুদ্দীন নিজেও তাঁদের বাড়িতে যেতেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হতো। কখনো ক্লাসের পড়াশুনা, স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যবহার এমনকি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা।জমিরুদ্দীনের বাল্য জীবনের একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা থেকে একবারে মুক্ত ছিলেন[১১]।

কালের কুটচক্রান্ত জমিরুদ্দীনের মনজগতকে চরমভাবে আন্দোলিত করে তোলে। এমনই একসময়ে খ্রীষ্টানদের বড়দিনের উৎসব চলছিল। তাঁদের গির্জাগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। অনেক মানুষের ভীড় সেখানে। শুধু খ্রীস্টান নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকজনেরও সমাগম দেখে জমিরুদ্দীন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে গেলেন বড় দিনের উৎসব পর্যবেক্ষণ করতে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা-বাজার পরিদর্শন করে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। ইত্যবসরে তাঁর সাথে জনৈক মিশনারীর আলাপ হলে তিনি তাঁর নিকট তাদের ধর্ম

[১০] মুহাম্মদ রবীউল আলম, মুন্সী শেখ জমির উদ্দীনঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৯৪, পৃ-১২।
[১১] পূর্বোক্ত, পৃ-১৩।

সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জমিরুদ্দীনের কথায় তিনি খুব খুশী হন এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে জমিরুদ্দীনের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। পরিশেষে খ্রীস্টান মিশনারী সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তাকে পুনরায় দেখা করতে বলেন।

জমিরুদ্দীন প্রায়শ মিশনারীদের কাছে যেতেন। মিশনারীরা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এমনকি তাঁকে বিভিন্ন বই পড়তে দিতেন। তন্মধ্যে বাইবেল, ইসলাম দর্শন, Prophet's Testimony of Christ, Muhammeden Ceremonies, Reasons for not being Mussalman প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত বইগুলি তিনি পড়তে থাকেন। বই পড়ার সময় তিনি যখন যে স্থানে বুঝতে পারতেন না সে স্থানে পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন করে রাখতেন। সময় ও সুযোগ অনুসারে মিশনারীদের কাছে যেয়ে বুঝে নিতেন। জমিরুদ্দীন যখন উক্ত পুস্তকগুলি তাদের নিকট বুঝে নেয়ার জন্য যেতেন, তখন তারা বড়ই সন্তুষ্ট হতেন ও অতি যত্নের সাথে তা বুঝিয়ে দিতেন[১২]।

এ সব গ্রন্থ পড়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু জমিরুদ্দীনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং গ্রন্থগুলো তাঁর কাছে মহামূল্যবান বলে মনে হয়। গ্রন্থগুলোতে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে চরমভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে। খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁর মনের গহীন কোন্দরে স্থান পেতে থাকে, এক পর্যায়ে তিনি খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি বেশ ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর বালক সুলভ মনে এ কথাটাও বদ্ধমূল হয়ে বসে যে, পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম, আর তা হলো খ্রীস্ট ধর্ম। খ্রীস্ট ধর্মে বলা হয়েছে, ব্যাপ্টিস্ট (বাপ্তাইজ) না হলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। এই বিশ্বাসে তিনি ব্যাপ্টিস্ট হতে চান। একদিন তিনি মিশনারীদের কাছে গিয়ে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন[১৩]।

মুনশী জমিরুদ্দীনের খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ

[১২] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৩

[১৩] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, ঢাকাঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৫), পৃ-৬৩।

আর্থিক দৈন্যতা মানব জীবনের এক চরম সমস্যা। যে সমস্যার কষাঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে মানুষের নৈতিকতাবোধ নিঃশেষ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। পলাশী যুদ্ধোত্তর সময়ে (১৭৫৭ খৃঃ) নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের ফলে বাংলার মুসলমানদের উপর যে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে তা কখনো মুছে যাওয়ার নয়। মুসলমানরা সেদিন শুধু মাত্র শিক্ষাদীক্ষায় নয় আর্থিকভাবে এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল যে, বিত্তবানেরাও ভিখারীতে পরিণত হয়।

ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় খ্রীস্টান মিশনারীরা মুসলমানদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগ ধর্মান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল চরমভাবে। বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খ্রীস্টান মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে অনেক মুসলমান খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তন্মধ্যে মীর হাদী ছিলেন অন্যতম। খ্রীস্টান হওয়ার পর তিনি 'পাদ্রী মীর হাদী' নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন[১৪]।

ইসলাম ধর্মের এই প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করে আরো অনেকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে কাজি আইনদ্দীন ও মুনশী নাসিরদ্দীন মিশনারীদের তাম্বুতে বাস করে গাঁড়াডোর অঞ্চলে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করেন। তাছাড়া মুনশী মফিজদ্দীন ও সুফী মধু মিয়া প্রমুখ কয়েকজন মিশনারী প্রচারক কাজ করেন[১৫]।

"পিতা, পুত্র ও পবিত্র-আত্মা এই তিন জনই ঈশ্বর, একে তিন তিনে এক যিশুকে বিশ্বাস করলেই একেবারে স্বর্গে যাওয়া যাবে।" খ্রীস্টান পাদ্রীদের মনোমুগ্ধকর এই মধুর বক্তব্য তথা স্বর্গে যাওয়ার এই সস্তা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে খ্রীস্ট ধর্মের দিকে আহ্বান করা হতো। আর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র গরল রাশি উদগীরণ করতো। এই সমস্ত ত্রিত্ত্ববাদের হেয়ালী লোকে যতটা বুঝুক আর না বুঝুক, বাইরের আড়ম্বর দেখে এবং যিশুকে বিশ্বাস করলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে এই প্রলোভনে বহুলোক খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করত। পাদ্রীদের নানা কুহেলিকাপূর্ণ বিতর্কিত প্রচার ধীরে ধীরে মুন্সি মোহাম্মদ

[১৪] শরিয়তে এসলাম, সম্পাদনেঃ হাজী আহমদ আলী এনয়েতপুরী, ২য় বর্ষ-৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩ কলিকাতা, পৃ-৫২
[১৫] পূর্বোক্ত, ২য় বর্ষ-৯ম সংখ্যা, পৃ-২০০।

মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭)-এর অন্তরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল[১৬]। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের ভুল বুঝতে শিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়- ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম।

তদানীন্তন বাংলার আনাচে কানাচে খ্রীস্টানদের আক্রমণ এতই প্রবল আকার ধারণ করেছিল-যার প্রতিবাদে কলম ধরার কেউ ছিল না। মুসলমান সমাজে ধর্মীয় ভাঙ্গণ রোধ কল্পে বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়ার ও মত তেমন কারো আবির্ভাব ঘটেনি। প্রকৃত অর্থে, সে সময়ে খ্রীস্টান ধর্মের ব্যাপক আগ্রাসনের মুখে মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তাঁর খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করা তেমন কোন আশ্চার্যজনক ছিল না। শেখ জমিরুদ্দীনের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি মুস্তফা নূর উল ইসলামের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়ঃ

‘‘পিতার একান্ত সদিচ্ছায় জমিরুদ্দীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ইংরেজী শিক্ষার্থে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ‘আমঝুপি খ্রীস্টান স্কুলে’ ভর্তি হলেন। কিন্তু তিনি সেখানে কিছুকাল পড়াশুনা করে কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হলেন। এ সকল মিশননারী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প কোন স্কুল কলেজ না থাকায় এখানে লেখাপড়ার সময় তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস ও খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাস জন্মে। অবশেষে তিনি ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর চাপড়া গির্জায় পাদৃ সালিভান সাহেবের নিকটে বাপ্তাইজ হয়ে খ্রীস্টান সমাজভুক্ত হন’’[১৭]।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরাগী মুসলিম সন্তানেরা যখন এক প্রকার যৎসামান্য আরবী-ফার্সী-উর্দুর গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল, বিশাল পৃথিবীর বিরাট কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়নি বললেই চলে, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ঠিক সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বাংলার মুসলমান তখন অধঃপতিত দুর্দশাগ্রস্ত। মুসলমান বলে পরিচয় দিলে লোকে তাকে অনেক ক্ষেত্রে অসভ্য নোংরা জীব বলে মনে করত। অপরদিকে ভিন্ন দেশীয় খ্রীস্টান পাদ্রীরা স্বধর্ম প্রচারের জন্য

[১৬] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহেরুল ইসলাম, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতাঃ ১৩৭৪ বাংলা, পৃ-২।
[১৭] মুস্তফা নুর উল ইসলাম, মুনশী জমিরুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৬বাংলা, ঢাকা,পৃ-৩।

আপ্রাণ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিল। বাংলার শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মুসলমান যখন তাদের বাক বন্যায় ভেসে "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" অবস্থায় উপনীত এমন সময়ে আরো অনেকের মতো মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ধর্মান্তরের অভিশাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাঁর মনে তখন নানা চিন্তার উদ্রেক হচ্ছিল-তবে কি ইসলাম ধর্ম মিথ্যা বা আসার? ক্রমান্বয়ে ভেবে তাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। এই সন্দেহ থেকে উদ্ধার করার জন্য এমন কোন ত্রাণকর্তা ছিলেন না যিনি খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা সম্বন্ধে জমিরুদ্দীনকে বুঝাতে পারেন। তাই তিনি তাঁর জীবন বৃত্তান্তে লিখেছেন-

''এই সময়ে যদি আমি 'রদ্দে খৃষ্টিয়ান' পুস্তক ও শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সদৃশ প্রচারক পাইতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই খ্রীস্টান হইতাম না। অতঃপর অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া খৃস্টান হওয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। স্নেহময়ী জননী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রিয় পিতা ও প্রাণসম ভ্রাতা কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্যেরা কত নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ আমাকে এমন উপদেশ দিয়া বুঝাইতে পারিলেন না যে, খ্রীস্টান ধর্ম মিথ্যা আর মুসলমান ধর্ম সত্য''[১৮]।

সমাজের আলেম-উলামা এমন কোন ভূমিকা রাখেননি যা খ্রীস্টান পাদ্রীদিগকে পরাস্ত করতে পারে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর শাস্ত্রীয় এবং জ্ঞানগর্ভ তর্কসমরে প্রবৃত্ত হওয়ার যোগ্যতা এদেশের সাধারণ আলেমের তখনো ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞান থাকলেও ভাষার অভাবে হয়তো বা প্রকাশের সাধ্য ছিল না। ইংরেজী এবং অন্য নানা ভাষায় পারদর্শী খ্রীস্টান পাদ্রীগণ অগাধ পান্ডিত্য নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে অনেক সত্যকে এমন ভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে, তাতে সাধারণের তো দূরের কথা অনেক মৌলভী, মাওলানা বা বিচক্ষণ পন্ডিত ব্যক্তিরও ধাঁ ধাঁ লেগে যায়। ধর্ম সম্বন্ধীয় জটিলতা নিরসন কল্পে এদেশের আলেম সমাজ সেদিন দায়িত্ব পালন করতেন, তবে জমিরুদ্দিনের মত অনেক ইসলাম ধর্মানুরাগী ব্যক্তিত্ব হয়তো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতেন না[১৯]।

---

[১৮] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৪।
[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ-৫।

খ্রীস্টান সমাজভুক্ত হওয়ায় শেখ জমিরুদ্দীন হলেন রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন। মুসলমান সমাজের অনেক নিন্দা-তিরস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। বাড়ীর সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছে থাকতে লাগলেন। সেখানে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্রে মিশনারীরা যথেষ্ট মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে তাঁরা কাছে রাখতে চাইলেন। এরপর মিশনারীরা জমিরুদ্দীনকে মিশন কাজে নিযুক্ত করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি এত তাড়াতাড়ি উহাতে রাজি হলেন না। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি আরো অনেক লেখাপড়া করে বড় পন্ডিত হবেন। জমিরুদ্দীন তাঁর ইচ্ছার কথাটা মিশনারীদের জানালে তাঁরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও কিছুটা নিরাশ হলেন। জন জমিরুদ্দীন ভালভাবে লেখাপড়া করে যেতে লাগালেন[২০]।

বাপ্তাইজের পর জন জমিরুদ্দীন কিছুদিন চাপড়ার মাইনর স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন। পরে পাদ্রী পার্শ্বনস সাহেব তাঁকে নিজ ব্যয়ে কলকাতার সি, এম, এস, হাইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন তথায় পড়াশুনা করে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজ বাড়ী গাঁড়াডোবো গমন করে ৫/৬ মাস অবস্থান করলে মেহেরপুরের সাধারণ মুসলমান সমাজে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল যে, খ্রীস্টান নিয়ে আহারাদি করলে আমাদিগের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে তারা ভালভাবে ওয়াকিবহাল ছিল না যে, এই জমিরুদ্দীনই একদিন গোটা খ্রীস্টান মিশনারীর অপতৎপরতার কুপকাত করে ছাড়বেন। যেমনটি হয়েছিল হযরত মুসা (আ) এর ক্ষেত্রে। তিনি শিশু অবস্থায় ফেরাউনের বাড়ীতে লালিত পালিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু ফেরাউনী রাজত্ব খতমের মূলেইতো মুসা (আ)। আল্লাহপাকের কিছু নিয়ম আছে যা মানুষের বোধগম্যের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। আল্লাহ তা'আলা তাই এভাবেই বলেছেন– "তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"[২১]

---

[২০] মুহাম্মদ রবীউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।
[২১] আল-কুরআন, ৩ঃ২১৬।

এরপর তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পুনরায় ভর্তি হন। নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন পাদ্রী এ, জে, স্যান্টার সাহেব। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে পাদ্রী স্যান্টার সাহেব ইংল্যান্ডে গমন করলে পাদ্রী ই, টি, বাটলার এম, এ, সাহেব নর্মালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন[২২]।

[২২] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, খ্রীস্টিয় সমাজে আট বছর, ''শরিয়ত'', পূর্বোক্ত, পৃ-৫০।

কলেজ জীবন

জমিরুদ্দীন স্কুল জীবন সমাপ্ত করলেন। আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বঙ্গ বিদ্যালয়, মেহেরপুর ইরেজী উচ্চ বিদ্যালয়, চাপড়ার মাইনর স্কুল, মির্জাপুর বোডিং স্কুল ও কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে স্কুল-জীবন অতিবাহিত হলো। এর পর তিনি কলেজ জীবনে পা রাখেন। ১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি এলাহাবাদের সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজে ভর্তি হন। মূলতঃ এই কলেজে ভর্তি ও লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন রেভারেন্ড জানি আলী এম. এ (কেম্ব্রিজ) ও রেভারেন্ড বাটলার বি,এ সাহেব[২৩]।

জন জমিরুদ্দীন এই কলেজে স্বীয় ইচ্ছা পূরণের যথেষ্ট সুযোগ পেলেন। কারণ কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধুর ব্যবহার, কলেজ লাইব্রেরীর পর্যাপ্ত বই-পত্র, বন্ধু-বান্ধবের সুন্দর আচরণ তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। এই কলেজে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ পেলেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি মাত্র কয়েক বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং ভাতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার উপর বেশ খানিকটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন[২৪]।

বলা বাহুল্য যে, এসকল ভাষা জ্ঞান জমিরুদ্দীনের পান্ডিত্য অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। কারণ খ্রীস্টান মিশনারীদের বিচিত্র ভাষার পুস্তকগুলো পড়ার সুবাদের আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল ধর্ম হিসেবে এবং খ্রীস্টান ধর্মকে বুঝেছিলেন অলীক ধর্ম হিসাবে।

এই কলেজে অধ্যায়ন কালে জমিরুদ্দীন মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কয়েক বছর পড়াশুনার পর কলেজের শেষ পরীক্ষায় (B.T.H. Bachelor of Theology) কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হণ এবং ১৮৯২ খৃস্টাব্দে তিনি মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে Higher Grade of Reader বা

[২৩] আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতাঃ১৯৭১, পৃ-৩০৫।
[২৪] আনিসুজ্জামান, ''মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন'', সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকাঃ বাংলা একামেী, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭ বাংলা, পৃ-৮৭।

'পাঠক রত্ন' উপাধী লাভ করেন[২৫]। অবশ্য এই পরীক্ষায় তিনি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। জমিরুদ্দীনের উপাধিপত্রটি এভাবেই সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রখর মেধাবী ও তাক্ষ্ণধীসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, একবার কিছু মুখস্ত করলে সহজে তা ভুলতেন না। জ্ঞান পিপাসু ও বিচিত্র জ্ঞানে পারদর্শী তাঁর খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত যা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এলাহাবাদ সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জমিরুদ্দীন যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হতে তার বিদ্যা চর্চার ইতিবৃত্তের পাশাপাশি মিশনারীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়[২৬]।

খ্রীস্টিয় সমাজে অবস্থান করে খ্রীস্টান বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে খ্রীস্টান মিশনারী ও পন্ডিতদিগের সাহচর্যে থেকে জমিরুদ্দীন জ্ঞানস্পৃহা, পাঠ প্রবণতা, তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রচার কৌশল, ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মত সকল গুণ আয়ত্ত করেন। তাঁর জীবন, চিন্তা শক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে খ্রীস্টান সমাজের অবদান যথেষ্ট ছিল।

খ্রীস্টান পন্ডিতেরা পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। কলেজের অধ্যাপকেরা তাদেরকে বক্তৃতা শিক্ষা দিত। প্রত্যহ শনিবারে হাট-বাজারে নিয়ে যেয়ে শিক্ষা প্রণালীর পরীক্ষা করত। হিন্দু-মুসলমানের নিকট গমন করে প্রচার করতে হবে, তর্ক করতে হবে, এ সমস্ত বিষয়ে অভ্যাস করবার জন্য সফরে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে সকল ছাত্রকে তাম্বুতে বসবাস করতে হতো[২৭]।

ছাত্রদেরকে বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মিশনারী তৎপরতার অন্যতম একটি কৌশল যা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল। তজ্জন্য খ্রীস্টান ছাত্রদের অঞ্চলভিত্তিক প্রচারকার্যে অংশ গ্রহণ করতে হতো। শেখ জমিরুদ্দীন ও এ

[২৫] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবন ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৮।
[২৬] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, শরীয়ত, ২য় বর্ষ-৫ম সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৫-১০৭।
[২৭] শরিয়ত, ২য় সংখ্যা,৬ষ্ঠ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৬।

তৎপরতার থেকে বাদ পড়েননি। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের লেখনী প্রত্যক্ষ করা যায়[২৮]।

শিক্ষকদের চারিত্রিক ও আদর্শিক প্রভাব সাধারণতঃ ছাত্রদেরকে পরিবেষ্টিত করে। জমিরুদ্দীনের পুরো শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টি ছিল খ্রীস্টান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। মুষ্টিমেয় দু'একজন মুসলমান শিক্ষক, তাঁরাও ছিলেন খ্রীস্টান আদর্শে প্রভাবিত। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকে তাঁর কলেজ জীবন অতিবাহিত হয়। এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজে যাঁরা পাঠদান করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন খ্রীস্টান পন্ডিত। কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে কে কোন বিষয়ে পড়াতেন মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের আত্মজীবনীতে তা বর্ণিত আছে[২৯]।

জমিরুদ্দীন যেহেতু পিতা-মাতার সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাই ছাত্রজীবনে পড়াশুনার ব্যয়-ভার বহন করতে তাঁকে দারুন ভাবে বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি লেখাপড়ার খরচ কিভাবে মেটাতেন তা তাঁর স্মৃতি চর্চায় উল্লেখ পাওয়া যায়[৩০]।

বহু ভাষাবিধ শেখ জমিরুদ্দীন আরো উচ্চ শিক্ষার প্রবল আকাংখা থাকলেও পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা তাঁকে বাঁধাগ্রস্থ করেছিল। তবে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, জমিরুদ্দীন সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতার সি, এম, এস ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে লেখাপড়া করার পর এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সমাপ্তি ঘটে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হলেও জমিরুদ্দীন আজীবন নানা সূত্রে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, তাঁর এই অন্বেষণ জীবন জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছিল। এই নিরন্তর অন্বেষণ ক্ষণিকের জন্য তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে বটে, তবে এই বিভ্রান্তই দিয়েছে তাঁকে সঠিক পথের দিশা তথা 'সিরাতুল মুস্তাকিম'। তিনি তাঁর জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য একটি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

---

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৬।
[২৯] মুনশী শেখ জমিরদ্দীন, খ্রীস্টিয় সমাজে আট বছর, শরিয়তে এসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৫২।
[৩০] ফাল্গুন ১৩৩২, পূর্বোক্ত, পৃ-৪০।

গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ ছিল তাঁর এই ব্যক্তিগত সংগ্রহ। শুধুমাত্র প্রাজ্ঞ পন্ডিতের নয়, একজন ভাষাবিদের বিরল সম্মানও তাঁর প্রাপ্য[৩১]।

বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় তার বুৎপত্তি ছিল। ইংরেজী ভাষাজ্ঞানে তিনি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ইংরেজী থেকে অনেক রচনা বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং ইংরেজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছেন। স্বাভাবিকজ্ঞান-তৃষ্ণার কারণ ছাড়াও তাঁর কর্মজীবনের বিশেষ প্রকৃতির জন্যেও তাঁকে আমৃত্যু নিয়মিত অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করতে হয়েছে[৩২]।

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জমিরুদ্দীন 'পাঠকরত্ন' উপাধী পেলেন। ইহাতে মিশনারীরা খুব খুশী হয়ে তাঁকে মিশনারী কাজে নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি তাদের কথায় রাযী হয়ে গেলেন। এখন তিনি হলে পাদ্রী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন। তিনি মিশনারী হিসেবে প্রথমেই কাজ শুরু করেন এলাহাবাদ মিশনে। সেখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এবং খ্রীস্ট ধর্মের স্বপক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বক্তৃতা ও লেখনী শৈলীর দক্ষতায় খ্রীস্টানেরা বিমোহিত হয়ে গেল এবং অতি অল্প সময়ে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল[৩৩]।

কলকাতার মিশনারীরা জমিরুদ্দীনকে কলকাতায় আনয়নের চেষ্টা করেন। তিনি কলকাতাস্থ মিশনারীদের আহ্বানে সেখানে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তথায় তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। কারন সেই সময় নদীয়া জেলায় মুসলমানদের সাথে খ্রীস্টান মিশনারীদের একটা গোলযোগ হয়। সেই মুহুর্তে নদীয়া জেলায় মুসলমান মিশনারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। খ্রীস্টান মিশনারীরা ধারণা করলেন, নদীয়া অঞ্চলে মুসলমান মিশনারী পাঠালে ফল ভাল হবে। তাই কলকাতার

[৩১] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২, পৃ-৯৫।
[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ-৯৫।
[৩৩] মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

সি,এম,এস, কনফারেন্সের আদেশানুসারে তাঁকে নদীয়ার শিকারপুরে আসতে হয়[৩৪]।

এই শিকারপুর মিশনে পাদ্রী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন পাদ্রী লেঙ্কিবার সাহেবের নেতৃত্বে আল্লার দর্গা, হলুদ বাড়িয়া, মীরপুর সোনাইকুন্ডি, ভেড়ামারা, মহিষাডেরা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। এর পর পাদ্রী শল সাহেবের সঙ্গী হিসেবে মুরুটির মাধপুর, বানিয়াডাঙ্গা, কাথুলি, আউদিয়া, জিগল কান্দী প্রভৃতি স্থানে প্রচারের কাজ করেন[৩৫]।

এলাহাবাদের ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রচার সফরে জমিরুদ্দীন অনেক স্থানে গমন করেছেন। এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজ থেকে সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে খুশী হয়ে জমিরুদ্দীনকে সার্বক্ষণিক মিশনারী বা প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন। জমিরুদ্দীনের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকা কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পাদ্রী এডওয়ার্ড বাটলার তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর জন্য "মিশনারী প্রচারকার্য স্কিম" তৈরী করে রেখেছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তিনি তাঁকে উক্ত কাজে নিযুক্ত করবেন। পরীক্ষা পাশের সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাটলার সাহেব তাঁকে কৃষ্ণনগরে ডেকে নিয়ে নতুন মিশনের দায়িত্ব অর্পন করেন। পাদ্রী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন ক্রমশঃ খ্রীস্টান সমাজে একজন প্রথিতযশা মিশনারীর ভূমিকা রাখেন। এই সময়ে তিনি মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী ধারণ করে অনেক মুসলমানকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়[৩৬]।

জমিরুদ্দীনের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন

জমিরুদ্দীন আকিদাগত গোড়ামীর উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ধর্মীয় চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে প্রথাগত বিশ্বাসের (আকিদা গন্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেননি। কৌতূহল, অনুসন্ধিৎস, সংশয় ও জিজ্ঞাসা তাঁকে স্থানচ্যুত করেছে। ধর্মীয় যুগে আরো অনেক মনীষী ও মহামানবের ন্যায় পরিবর্তন এসেছে বারবার। প্রথম জীবনে ধর্মনিষ্ঠ

[৩৪] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৮।
[৩৫] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, খ্রীস্টীয় সমাজে আট বছর, শরিয়ত, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৬।
[৩৬] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবন ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৫।

পিতার প্রেরণা ও আগ্রহে তিনি মক্তবখানাতে কয়েক বছর অতি যত্ন ও পরিশ্রম করে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করেন।

এ ব্যাপারে মুনশী মনিরুদ্দীনের লেখনী লক্ষ্য করা যায়ঃ
''এছলামী আদব কায়দা হাল হাকিকত।
রোজা ও নামায তার বেনা যে তাবত।
শিখিয়া থোড়াই রোজে জেহেনের বলে।
নামোয়ার হন খুব ডুয়া মহলে''[৩৭]।

আমঝুপি খ্রীস্টান স্কুলে পড়ার সময় জমিরুদ্দীন প্রথমনে বাইবেল পাঠ করেন। পরে ঐ স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র সরকারের অনুপ্রেরণায় 'হযরত মোহাম্মদের বয়ান', 'ফোরকান', 'ইঞ্জিল কেতাব', 'বেগোনাহ নবী', ঈসা ও মোহাম্মদ' ইত্যাদি খ্রীস্টান বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময় বিভ্রান্তকর পুস্তক পড়ে ইসলামে সন্দেহ ও খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাস হয়।

বস্তুতঃ তৎকালীন সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে একথা বলা যায় যে, জমিরুদ্দীন শিক্ষা জীবনে এমন একটা পরিবেশের মুখোমুখি হলেন, যেখানে ঐশী জ্ঞানের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে তাঁর কোমল হৃদয়ে খ্রীস্ট শিক্ষার ছাপ এমন ভাবে পড়েছিল– যা নির্মূল করার নয়। তারপরেও আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করতে চান কোন অপশক্তি তা রোধ করতে পারে না। জমিরুদ্দীনের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহই তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন যিনি তাগুতকে (খোদাদ্রোহী) অস্বীকার করেছে। "আর যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে একটি মুজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না।"[৩৮]

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন দীর্ঘ ৮ বছরকাল খ্রীস্টান সমাজভুক্ত থাকার পর পুনরায় মুসলিম সমাজে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ। এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজে 'ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে' পড়ার সময় তিনি তাঁর লেকচার হতে আসল কোরান কোথায়?'— এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ১৮৯২ খৃস্টাব্দের

[৩৭] পূর্বোক্ত,পৃ-৩।
[৩৮] আল-কুরআন, ২ঃ২৫৬।

জুন মাসে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় ছাপা হয়[৩৯]। প্রবন্ধটি মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহাতে তিনি প্রচলিত কুরআন শরীফের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে সাত দফা যুক্তি পেশ করেন। 'সুধাকর' পত্রিকায় (১৯ চৈত্র, ১২৯৯) জমিরুদ্দীনের এই বিভ্রান্তিকর লিখিত বক্তব্যের দফাওয়ারী সুদীর্ঘ জবাব প্রদান করেন যশোরের ছাতিয়ানতলা নিবাসী প্রথিতযশা ইসলাম প্রচারক মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭) "ঈসায়ী বা খৃস্টানী ধোকাভঞ্জন" শিরোনামে[৪০]। মেহেরল্লাহর এই জবাবী প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জমিরুদ্দীন সুধাকর (২৩ বৈশাখ, ১৩০০)-এ একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখেন[৪১]। মুনশী মেহেরুল্লাহ এর জবাব সুধাকরে লেখেন 'আসল কোরান সর্বত্রই' (১৭ আষাঢ় ১৩০০)। এই যুক্তিনিষ্ঠ জবাব জমিরুদ্দীনের দৃষ্টি ভঙ্গির বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এই সময় হতে তাঁর অন্তর্জগতে ক্রমশঃ ভাবান্তর ঘটতে থাকে।

মুনশী মেহেরুল্লাহর এই তর্ক-বিতর্কের বছর (১৮৯২ খৃঃ) কুষ্টিয়া অঞ্চলে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার কালে জমিরুদ্দীনের মনে বাইবেলের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। সেই সময়ে কুষ্টিয়ায় একদিন মুসলমানদে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সঙ্গে খ্রীস্টানদের এক প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্ক সভায় জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান সমাজের একজন প্রখ্যাত বক্তা হিসেবে আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। এই সময় হাজার হাজার মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জমিরুদ্দীন জোরালো বক্তৃতা দিয়ে সেদিন শ্রোতামন্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সভাশেষে গন্তব্যে ফেরার পথে জমিরুদ্দীনের ধর্মীয় জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়[৪২]।

আল্লাহ পাক যাকে কল্যাণ দান করেন, তাকে অপরিমিত (কল্যাণ) দান করেন। যাকে দিয়ে তিনি (আল্লাহ) ইসলাম ও মুসলমানকে খেদমত করাবেন, দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাজে পৌঁছাবেন তিনি কি কখনো খ্রীস্টানদের খপ্পরে পড়ে

[৩৯] মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, পৃ-১২।
[৪০] পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।
[৪১] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬।
[৪২] মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-২০।

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে পারেন। খ্রীস্টান কর্তৃক পরিবর্তিত ও বিকৃত বাইবেলের ধারক ও বাহক জমিরুদ্দীন তাঁর নিজের ভাষায় জানাচ্ছেনঃ

''একদিন আমি মধুগাড়ী নামক পল্লীতে তাম্বুর মধ্যে শয়ন করিয়া কোরান শরীফের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতেছি, এমন সময় সুরা সফের ৫ আয়াতে (৬১শে সূরা) উপস্থিত হইলাম। তথায় লেখা আছে যে, "ইসা বলিলেন..... আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাঁহার নাম আহম্মদ, আগমন করিবেন।" উপরিউক্ত বাক্যটি পাঠ করিয়ে করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিল যে, উক্ত বাক্যটি পূর্বে বাইবেলে ছিল, কিন্তু দুষ্ট খ্রীস্টানেরা উহা বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক বাইবেল যে পরবর্তীত ও বিকৃত হইয়াছে তাহা বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে লাগিলাম। এবং..... জানিতে পারিলাম যে, বর্তমান সময়ে কোথায় ও আসল বাইবেল নাই, খ্রীস্টানেরা উহা বিকৃত ও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন[৪৩]।

এরপর জমিরুদ্দীন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেল গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং তা পড়ে পড়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান যথার্থ। বাইবেল অবশ্যই বিকৃত হয়েছে এবং খ্রীস্টানেরা তাদের প্রয়োজন ও সুবিধানুযায়ী তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। তিনি খুঁজে খুঁজে বাইবেলের বেশ কিছু ভুল বের করলেন। জমিরুদ্দীনের মনে এই ভুল' রেখাপাত করলো। তাৎক্ষণিকভাবে প্রকৃত সত্য ধর্মের অন্বেষণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল ও কাতর হয়ে উঠলো। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন—

''খ্রীস্ট ধর্মের ভিত্তি যখন বাইবেল আর বাইবেল যখন বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে– ইহা যখন আমি বিশেষভাবে অবগত হইলাম তখন খ্রীস্টধর্মে আমার অনাস্থা, অভক্তি ও সন্দেহ জন্মিল''[৪৪]।

তিনি আরো বলেছেন–

এখন যেমন বাইবেল একখন্ড পুস্তকাকারে বিদ্যামান রহিয়াছে, অতি প্রাচীন কালে তা ছিল না। উহার হস্তলিপিসমূহ পৃথক পৃথকরূপে ছিল। উক্ত হস্তলিপির

[৪৩] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-৬-৭।
[৪৪] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

নাম, যথাঃ আলেকজান্দ্রিয়া হস্ত লিপি, ইফ্রায়ীমী হস্তলিপি ও ভ্যাটিক্যান হস্তলিপি ইত্যাদি। ঐসব হস্তলিপিতে কম-বেশী আছে, আর পরস্পরের সাথে পরস্পরের ঐক্যতা নেই[৪৫]।

এতদ্ব্যতীত ইহুদীদের বাইবেলের সাথে খ্রীস্টানদিগের বাইবেলের কোন মিল নেই। এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য যে সত্য তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুরাহ সাফফের পূর্বোক্ত আয়াতটি যে খ্রীস্টানদের বাইবেলের ছিল সম্প্রতি উদ্ধারকৃত 'গসপেল অব বারনাবাস' (Gosple of Barnabas)-এ স্বাক্ষ্য মেলে। যেখানে হযরত ঈসা (আ) যীশু স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন—

And though I have been innocent in the world; since men have called me 'God' and son of god' God, in order that I be not mocked of the demons on the boy of judgment, hath willed that I be mocked of men in this world by the death of judas making all men to believe I died upon the cross and this mocking will continue untile the advent of mohammad the messenger of God who when he shall come, shall reveal this deception to hose who believe in God's Law.[46]

সত্যকে অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট ব্যক্তিকেই মহান আল্লাহ পাক স্বীয় রহমতের রাস্তাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যুগে যুগে অনেক পথভ্রষ্ট মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন। আপন ভ্রান্তিকে বুঝতে শিখে। খ্রীস্টান ধর্মের অলীক মতাদর্শের ভিত্তি যে কতখানি নড়বড়ে শেখ জমিরুদ্দীন তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন[৪৭]।

খ্রীস্ট ধর্মে জমিরুদ্দীনের ক্রমশঃ 'অবিশ্বাস' ও 'অনাস্থা' জাগলে তিনি পূবের্র কীতিকর্মের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত' হন। এমতাবস্থায় তাঁর অন্তরের ধর্ম জিজ্ঞাসা তাঁকে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কারণ তিনি যখন ছাত্র অবস্থায় এলাহাবাদে থাকতেন, সেই সময় বাঙালী ব্রাহ্মদের সাথে মিশতেন। সময় সময়

[৪৫] মুহাম্মদ আবু তালিব, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহঃ দেশ করাধ সমাজ, সংকলিত, ঢাকাঃইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩, পৃ-৪০।
[৪৬] The Gospal of Barnabas, করাচীঃ ১৯৮০, পৃ-২৭১।
[৪৭] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃ-১০।

তিনি তাদের মন্দিরে যেতেন, তাদের বক্তৃতা শুনতেন এবং শাস্ত্র ও ধর্ম মত তাঁর কাছে ভাল লাগতো। এক্ষণে তিনি একথাও ভাবলেন যে, বিকৃত খ্রীস্টান ধর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অনেক ভালো[৪৮]।

ধীরে ধীরে জমিরুদ্দীন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছেন যখন, ঠিক সেই সময়ের একটি ঘটনা তাঁর মানস পরিবর্তনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এমনি একদিন বিকেলে তিনি কলেজ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতেছিলেন। পথে একটি বিজ্ঞাপনে দেখলেন যে, ঐদিন বিকেলে বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্ম পন্ডিত "মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম" বিষয় কলকাতার এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা করবেন। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেখে খুশি হন এবং এবং তাৎক্ষণিক এ্যালবার্ট হলে যান এবং বক্তৃতা শুনতে থাকেন। বক্তার কথাগুলো তাঁর মন আকর্ষণ করলো এবং তাঁর কাছে বেশ মূল্যবান মনে হলো। বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র ঠিক এভাবেই বললেন যে, খ্রীস্টানরা অন্যান্য ধর্মের মহত্ব দেখতে পান না এমনকি তারা হযরত (সা) এর উপর বিদ্বেষ ভাব দেখায়। অনেক খ্রীস্টান পন্ডিত হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর বিদ্বেষ ভাব দেখায়। অনেক খ্রীস্টান পন্ডিত হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্পূর্ণ কপট, ভন্ড, বিলাসী, নৃশংস, ও ধর্মহীন বলে থাকেন। কিন্তু যারা ভেতরে ধর্ম নেই তিনি কি কখনো ধর্ম স্থাপন করতে পারেন? কপট, নৃশংস, অসভ্য ও ভন্ড লোক কখনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। সত্য সনাতন বিধাতা যদি মুহাম্মদ (সা) কে সাহায্য না করতেন তাহলে মুহাম্মদ (সা) এর সাধ্য কি যে তিনি ধর্ম রচনা করেন। সহস্র সহস্র লোক মুহাম্মদ (সা)-এর অনুবর্তী হয়েছিলেন। এখনো কোটি কোটি লোক তাঁর উপদেশে অদ্বিতীয় আল্লাহর নাম কীর্ত্তন করেছেন, তাঁর উপদেশে পাঁচবার নামাজ পড়ছেন। খ্রীস্টানদের এই মহামানবকে ভন্ড বলা বাতুলতার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কি হতে পারে? এই বক্তৃতা জমিরুদ্দীনের মনে সত্য ধর্ম (ইসলাম) অন্বেষণের আকাঙ্খাকে প্রবল করে তুললো। জমিরুদ্দীন তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেনঃ

''উপরোক্ত বাক্যগুলি আমি শ্রবণ করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্মের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরে বিশেষ বিশেষ মুসলমান ধর্ম-

[৪৮] পূর্বোক্ত, পৃ-১৫।

পন্ডিতদিগের নিকটে গমণ করিয়া তাঁহাদের নিকট সত্য-সনাতন দ্বীন ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করি। তাহার পরে অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তি ভাজন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) কৃত "রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলেলোল ইসলাম ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) ও শেখ আব্দুর রহিম সাহেব (১৮৫৯-১৯৩১) কৃত "ইসলাম তত্ত্ব" ১ম ও ২য় খন্ড পাঠ করণান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়"[৪৯]।

এরপর জমিরুদ্দীন স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি আর খ্রীস্টান সমাজে থাকবেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম ও গ্রহণ করবেন না। নিশ্চয়ই তিনি মুসলমান, তিনি তখন প্রথমে কয়েকজন খ্রীস্টান বন্ধুর কাছে তাঁর ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস ও খ্রীস্ট ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বলেন। তাঁর বন্ধুরা ও তাঁর কাছে তাঁদের (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসের কথা বললেন, ইহাতে জমিরুদ্দীন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তারাও ঠিক খ্রীষ্ট ধর্ম মানে না। তারা কেবল টাকার লোভে খ্রীস্ট সমাজে রয়েছেন। অতঃপর তিনি একজন বিলাতী পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি যীশু খ্রীস্টকে ঈশ্বর বলে মানেন? উত্তরে (পাদ্রী) বললেন–"খ্রীস্ট ঈশ্বর এ কথা তিনি বলেননি, আমিও বলি না, আপনিও বলবেন না।" পরে জমিরুদ্দীন আরো কয়েকজন প্রচারকের কাছে খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, তাদের মধ্যে কেউ নাস্তিক, কেউ অবিশ্বাসী বা ব্রাহ্ম। এই যখন অবস্থা তখন জমিরুদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না[৫০]।

অতঃপর জমিরুদ্দীন আর কোন গোলক ধাঁধায় না থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেললেন। তিনি তাঁর নিজের ভাষায় বলেনঃ

''আমি যখন খৃস্টান ধর্ম মানিনা, তখন আর [সেই] সমাজে থাকিব না বলিয়া মিশনারী কার্য পরিত্যাগ ও নিজ বাড়ীতে আগমণ পূর্বক প্রিয় আত্মীয় স্বজন সমক্ষে মৌলবি রিয়াজ-উল-হক সাহেব কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হই"[৫১]।

---

[৪৯] পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।
[৫০] পূর্বোক্ত, পৃ-১০।
[৫১] পূর্বোক্ত, পৃ-১৯।

ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসার পর পাদ্রী রেভারেজ জন জমিরুদ্দীন হলেন 'ইসলাম প্রচারক মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন'। বস্তুতঃ তাঁর খ্রীস্টান-জীবনের বিশেষ দু'টি স্মরণীয় ঘটনা তাঁকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে[৫২]।

এক. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সঙ্গে তাঁর মসীযুদ্ধ।

দুই. শিকারপুরে অবস্থানকালে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত কুরআনের একটি উক্তি পাঠ।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে অবশ্য এলাহাবাদস্থ সেন্ট পালস্ ডিভিনিটি কলেজে অধ্যয়ন কালে। জমিরুদ্দীনের প্রশ্ন ছিল,– বর্তমান মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্ম গ্রন্থ কুরআন শরীফ আসল নয়। আসল কুরআন শরীফ মুসলিম জগতের খলিয়া হযরত ওসমান (রা.)– এর শাসনামলে খলিয়া ওসমানের নির্দেশে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। তদস্থলে যে কুরআন আসল বলে চালানো হয়, তাতে মূল কুরআনের একটি অংশ, বিশেষ করে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা (সূরা জুননুরাইন) বর্জিত হয়। তাই তিনি প্রশ্ন করেন,–

"আসল কোরান কোথায়" ('খ্রীস্টিয় বান্ধব' পত্রিকা, জুন ১৮৯২)। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাঁর জবাবে বলেন, কোরআনের আসল-নকল কি, "সর্বত্রই আসল কোরআন"। উল্লেখ্য যে, কুরআন গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে তিনি পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন তথা "ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন" করতে সক্ষম হন। তার আসলত্ত্ব ও সেই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ''ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন" প্রবন্ধটি সমকালীন সুধাকর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাঁর প্রবন্ধে ৬টি জটিল প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব দিতে সক্ষম হন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন—

আশা করি এখন বোঝা যাইতেছে যে, কোরআনের আসলত্ত্বে কোন প্রকারেই কোন গোলমাল নাই। আজ আমরা তর্করূপ রণপ্রান্তরে দন্ডায়মান হইয়া উচ্চেস্বরে

[৫২] মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭।

বলিতে পারি যে, যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজ পত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে; তাহার আসলত্ত্বের বিন্দু-বিসর্গ ও ক্ষতি হইবে না[৫৩]।

তিনি খ্রীস্টান বন্ধুগণকে প্রশ্ন করেন–" খ্রীস্টিয়ান বন্ধুগণ, ধর্মতঃ বল দেখি তোমরা বাইবেলের বলে এইরূপ সাহস বাঁধিতে পার কি?"

পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকরে' এর একটি প্রতিবাদ লিপি (২৩ বৈশাখ, ১৩০০) প্রকাশ করেন বটে, তবে সেও ওই পুরানো প্রবন্ধেরই চর্বিত-চর্বন মাত্র। তাতে তিনি এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, মুনশী সাহেব তাঁর প্রশ্নের সঠিক মর্ম বুঝতে পারেননি, ফলে সঠিক জবাব না দিয়ে অনর্থক 'কটুক্তি' করেছেন। এরপর জমিরুদ্দীন লিখেছেনঃ

কোরআন শরীফ যদি পরিবর্তিত না হইত, তবে শিয়া ও সুন্নিদিগের কোরআন শরীফে পরস্পর মিল থাকিত। সুন্নী ও শিয়া সম্প্রদায়ের কোরআন শরিফে পরস্পর মিল নাই। শিয়াদিগের কোরআনে যে সুরা আছে, সুন্নীদিগের কোরআনে সেই সুরা নাই। যদি কোন মহাশয় উক্ত সুরা দেখিতে চান, তাহা হইলে পঞ্চাবস্থ অমৃতসরের পাদৃশ্রীযুক্ত রেভারেন্ড মৌলবী ইমাদ উদ্দীন লাহিজ ডি, ডি, সাহেবের কৃত 'তহকিকল ইমান' নামক কেবাবের ৯ম পৃষ্ঠা হইতে ১১শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন। উক্ত কেতাব এলাহাবাদ ও লাহোর ট্রাক্ট সোসাইটিতে পাওয়া যায়।' শিয়া সম্প্রদায় মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে, সুন্নীদিগের কোরআন তহরিফ হইয়াছে। ভাই মোহাম্মদী। আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন,– যাহা সম্পূর্ণ সত্য তাহা গ্রহণ করুন। তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে[৫৪]।

জবাবে মুনশী মেহেরুল্লাহ 'সর্বত্রই আসল কোরান' শিরোনামে স্পষ্ট করে বলেনঃ

''প্রশ্নকারী শেখ মহাশয় শিয়াদিগের মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সুরাটি হযরত উসমান (রাজিঃ) কোরআন হইতে তুলিয়া দগ্ধ করিয়া

[৫৩] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহেরচরিত, পৃ-৩৫।
[৫৪] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭।

ফেলিয়াছিলেন, তাহা সুরা বাকারা হইতে বড়।..... সুরা বাকারাটি অন্যুন ৮০/৯০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কিন্তু প্রতিবাদী ২৩ শে বৈশাখের সুধাকরে লিখিয়াছেন যে, "যদি কেহ শিয়াদিগের কোরানোক্ত সুরাটি দেখিতে চান, তবে পাদ্রী আমাদুদ্দীন কৃত "তহকিকল ইমান" পুস্তকের ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠা দেখুন।..... আমরা বলি, সুরা বকর হইতে বড় সুরাটি অগত্যা শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ হওয়া চাই। সেই সুরাটি পাদ্রীজি নাকি ৯ হইতে ১১ অর্থ্যাৎ ২/৩ পৃষ্ঠায় সমাবেশ করিয়াছেন, এ কথার বুনিয়াদে কি পরিমাণ সত্যের সম্পর্ক আছে, তাহা আবার বুঝাইতে হইবে? ধোকা উহারই নাম।..... সর্বশেষ মুনশী সাহেব বলেন, ঈসাই বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন পৃথিবীস্থ সমূদয় দেশের কোরান একত্রিত করিয়া পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখেন, দেখিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই, তাই বলি, সর্বত্রই আসল কোরান"[৫৫]।

পাদ্রী জমিরুদ্দীন এর আর কোন উত্তর দিবার সুযোগ ও সুবিধা পাননি। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, পরবর্তীকালে তিনি যতই কুরআন শরীফ পড়েছেন, ততই তার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আর প্রচলিত বাইবেল সম্বন্ধে সন্দেহ বেড়েছে। পদে পদে বাইবেলের বিকৃতি, পাদ্রী সাহেবদের ধৃষ্টতা এবং ঈশ্বরপুত্র হিসেবে যীশুর অক্ষমতা ও অসহয়তা তাঁকে ব্যথিত করেছে। বলাই বাহুল্য, মধুগাড়ী গ্রামের ছোট্ট ঘটনাটি থেকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি খুলে যায় এবং তিনি দেখতে পান- পবিত্র কুরআন নয়, প্রচলিত খ্রীস্টান বাইবেলই যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে, আজও তার বিকৃতি চলছে। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কাল থেকেই অক্ষত অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। এ ব্যাপারে মুনশী মেহেরুল্লাহ সাহেবের যুক্তিই তাঁর কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে[৫৬]।

শেখ জমিরুদ্দনির সঙ্গে মুনশী মেহেরুল্লাহ এই ঘোর তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, পরিশেষে শেখ জমিরুদ্দীনের পরাজিত হওয়া, এসব কিছু মহান আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা এ পরাজয়ের গ্লানিই পাদ্রী জন জমিরুদ্দীনকে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

---

[৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯-৪০।
[৫৬] পূর্বোক্ত, পৃ-৪০।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের এই (স্বধর্মে) প্রত্যাবর্তনকে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ প্রসন্ন মনে প্রহণ করতে পারেনি। তাঁকে বেশ কিছুদিন 'একঘরে' হয়ে থাকতে হয়। পরে অবশ্য কয়েকজন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় তিনি সমাজে গৃহীত হন। সমাজের এই অযৌক্তিক বৈরী মনোভাবের কারণে জমিরুদ্দীন 'ঋণ পাপে আবদ্ধ' হয়ে পড়েন। মুনশী মেহেরুল্লাহ ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাহায্যে তিনি ঋণমুক্ত হন[৫৭]। মুনশী জমিরুদ্দীনের ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর মুনশী মেহেরুল্লাহ তাঁকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার কামনা করেন এবং সেই মর্মে পত্র লেখালিখিও করেন। এপর থেকে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যতা গড়ে ওঠে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সখ্যতা বজায় থাকে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভা সমিতি, গ্রন্থ রচনা এমনকি ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বিভিন্ন তর্কযুদ্ধে (খ্রীস্টান মিশনারীর সঙ্গে) অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি ব্যাপারে একে অপরের জুড়ি হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে জমিরুদ্দীন একাই অনেকখানি পুস্তক রচনা করেছেন এবং খ্যাতিমান হয়েছেন এমন অনেক মুসলিম লেখকের প্রথম রচনা (গদ্য ও পদ্য) প্রকাশ করে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করেছেন।

কর্মজীবনে মুনশী জমিরুদ্দীন

মুনশী জমিরুদ্দীনের কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ ও বলিষ্ঠ মনোভাবের অধিকারী। তিনি তাঁর কর্মজীবনের যে অঙ্গণেই কাজ করেছেন, সেখানেই সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে পুনঃঅবস্থানপূর্বক মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন তাঁর গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের (১৮৬২-১৯৩৩) পরামর্শক্রমে মুনশী মেহেরুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং প্রধান সহচর হিসেবে অবশিষ্ট জীবন নিজের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সেবা করেন[৫৮]।

---

[৫৭] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯।

[৫৮] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহেরচরিত, পৃ-৪০-৪১

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি দুইবার 'দার' পরিগ্রহ করেন। প্রথমবার তিনি নিজ গ্রাম গাঁড়াডোব হতে নিকটবর্তী খোকসা গ্রামে বিবাহ করেন, তাঁর স্ত্রীর নাম শামসুন্নেসা। বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। ১৩০৮ সালের ৮ কার্তিক অল্প বয়সে শামসুন্নেসা ইন্তেকাল করে পরকালবাসী হন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে জমিরুদ্দীন শোকাভিভূত হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে তিনি একটি শোক কবিতা রচনা করেন-যা তাঁর 'শোকানল' কাব্য-পুস্তিকায় স্থান পায়। তাইতো স্ত্রীকে স্মরণ করে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন-

''অকালে কোথায় গিয়ে করিতেছ বাস
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।---
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন
তব সনে হয় মম বিবাহ বন্ধন
সেই প্রেম সম্মিলনে
একসঙ্গে দুইজনে
সুখ দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল।
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার,
স্ত্রৈণ বলি পাছে হই ঘৃণিত সবার''[৫৯]।

এরপর তিনি ১৯০২ খৃঃ (আষাঢ়, ১৩০৯) কুষ্টিয়ার অন্তর্গত দহকুলা নিবাসী কলকাতার সিন্দুরিয়া পাট্টির পুস্তক ব্যবসায়ী মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৫০-১৯০৩) সাহেবের 'মধ্যমা' কন্যা সালেহা খাতুনকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে জমিরুদ্দীনের একান্ত সহচর মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন[৬০]।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের পুস্তক ব্যবসায়ী নব্য শ্বশুর ২২ আষাঢ় (১৩১০) মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় ৫৭ বছর বয়সে জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন। বিবাহের এক বছর গত না হতেই মুনশী জমিরুদ্দীনের শ্বশুর মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ (১২৫৩-১৩১০) পরলোক গমন করাতে তিনি বড়ই মর্মাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শ্বশুরের মৃত্যুতে জমিরুদ্দীনের রচিত আর একটি শোক

[৫৯] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০২-১০৩।
[৬০] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহেরচরিত, পৃ-৬৫।

কবিতা তার 'শোকানল' কাব্য পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় পত্নীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন তিনিঃ ''কেমনে ভুলিব পিতা! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
পকক-দাড়ী সুবচন,
সু সুন্দরও গঠন
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়,
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?''[৬১]

শেখ জমিরুদ্দীনের দুই সহধর্মীনের গর্ভে আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আজিজুদ্দীন ও নূরজাহান প্রথম স্ত্রীর গর্ভের সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তিন পুত্র ও তিন কন্যা— যথাক্রমে জামালুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন, ঈমানুদ্দীন, গহরজান, মনিরজান ও কমরজান। জমিরুদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে আজিজুদ্দীন, জামালুদ্দীন ও গিয়াসুদ্দীন তাঁর পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জমিরুদ্দীনের অনেকগুলি বইয়ের প্রকাশক হিসেবে তাঁর পুত্র-কন্যাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে। গাঁড়াডোবো অবস্থিত 'জমির লাইব্রেরী' তার পুত্ররাই পরিচালনা করতেন[৬২]।

অন্তিম শয্যা

উদার মনোভাব সম্পন্ন এ অসাধারণ কর্মী পুরুষ গোড়ামী ও কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে মুসলিম বাঙ্গালী জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এখন তিনি জীবন সায়াহ্নের দ্বার প্রান্তে উপনীত। শেষ জীবনে মুনশী জমিরুদ্দীন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হন। দিনের পর দিন সভা-সমিতিতে যোগদান, দেশ ও সমাজের অন্যান্য কার্যে কঠোর পরিশ্রম, আহার-নিদ্রার তেমন কোন নিয়ম না থাকা ইত্যাদি কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি ঘটে, জীবনী শক্তি ক্ষয় হতে থাকে। মৃত্যুর দু'তিন বছর পূর্বে একবার ওয়াজ-মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার সময় হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামের ডাক্তার মন্মথনাথ সান্যাল ও পরে মেহেরপুরের ডাক্তার নরেন চন্দ্র এম, বি, তাঁর চিকিৎসা করেন[৬৩]। এর পরবর্তী জীবনে এই অসুস্থ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে সংসারের সমস্ত বন্ধন, মায়া মমতা ত্যাগ করে একদিন তার দ্বিতীয় স্ত্রী সালেহা খাতুন অনন্ত পথে যাত্রা করেন।

---

[৬১] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৩
[৬২] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩।
[৬৩] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

অন্তিম জীবনের এই দীর্ঘ সময় বিপত্নীক জীবন যাপন নিতান্তই অনেক কষ্টের, অনেক সমস্যার। তিনি ১৯৩৭ সালের ২ জুন (আষাঢ় ১৩৪৪) বুধবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটে তাঁর গাঁড়াডোবের নিজ বাড়ীতে ৬৭ বছর বয়সে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব তথা দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরলোকগমন করেন[৬৪]। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। পরদিন সকাল ১০টায় তাঁর নিজ গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানায়ায় ইমামতি করেন মেহেরপুরের মৌলবী আব্দুল হাকিম[৬৫]। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র-কন্যা, হিতাকাংখী-শুভাকাংখী সহ অসংখ্য ভক্ত রেখে যান বটে কিন্তু সামান্য ব্যক্তিক্রম ছাড়া পত্র পত্রিকাতেও তাঁর মৃত্যু সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়নি। একমাত্র 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকার একটি সংখ্যায় মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের মৃত্যুতে তাঁর প্রিয় সহচর ও অনুরাগী মেহেরপুরের গাংনী থানার চেংগাড়া নিবাসী কবি আব্দুল হামিদ কাব্যবিনোদ শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন।

''বক্তাকূল চূড়ামনি বঙ্গভূমে হে মুনশী জমিরুদ্দীন
রেখে গেলে কীর্ত্তিগাঁথা গাঁড়াডোবে প্রাণ মৃত্যুহীন''[৬৬]।

কালের চক্রে মুনশী জমিরুদ্দীনের নামটি হারিয়ে যেতে থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর নামটি উজ্জ্বল হয়ে আছে, এমনকি সাম্প্রতিকালে তাঁর কেন্দ্রবিন্দুগুলি পর্যায়ক্রমে রূপায়িত হতে চলেছে।

নিজের ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের সেবায় আজীবন নিয়োজিত থাকলেও জীবিতাবস্থায় বা মরণোত্তর কালেও যোগ্য কোন সম্মান বা স্বীকৃতি তার ভাগ্যে জোটেনি। সাম্প্রতিক কালে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের স্মৃতির যে মর্যাদা পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা সম্ভব, তাঁর মত সুশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, আত্মনির্ভরশীল ও চরিত্রবান ব্যক্তিরাই জাতির জন্য দুর্লভ প্রাণ[৬৭]।

---

[৬৪] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫
[৬৫] পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫-৪৬।
[৬৬] শরিয়তে এসলাম, আশ্বিন, ১৩৪৪ বাংলা।
[৬৭] স্মরণিকা, মুনশী জমিরুদ্দীন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৯৯৬; সম্পাদনাঃ এস,এম, আইনুল হক, অক্টোবর, ১৯৯৬, পৃ-৮।

১৯৯৫ সালে মেহেরপুর প্রধান সড়কের পাশেই 'মুনশী জমিরুদ্দীন পৌর মার্কেট' নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে গত ৪/৯/১৯৯৬ ইং তারিখে উজ্জীবন অনুষ্ঠানে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের কর্মময় জীবনের কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়। এভাবে হারানো স্মৃতিকে স্থানীয়ভাবে ও জাতীয়ভাবে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সংগ্রামী জীবনের প্রেক্ষাপটকে জাগিয়া তোলার প্রয়াস পেয়েছে[৬৮]।

[৬৮] পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

পঞ্চম অধ্যায়

জমিরুদ্দীনের রচনাবলী পর্যালোচনা

ঊনবিংশ–বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-জগতে মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ছিলেন মুসলমানদের জন্য স্বাতন্ত্রধর্মী এক অন্যতম সাহিত্যকর্মী। যুগ যুগ ধরে অবহেলিত মুসলিম সমাজ যখন জড়তায়, আলস্যে, মানবিক বিকারে এবং কর্মোদ্যোগের অভাবে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে প্রহরে, তখন জাগরণের মশাল হাতে জমিরুদ্দীনের আবির্ভাব। মূলতঃ ইসলাম প্রচারক হিসাবে বাংলা আসামের বিভিন্ন জেলায় এই অনন্যসাধারণ কর্মী পুরুষটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেকালে বাংলার বেশ কয়েকটি এলাকায় খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল– বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে তাঁরা কনভার্ট করতে প্রয়াসবদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যক্ষত এই মিশনারী প্রচারণার প্রতিক্রিয়াতেই জমিরুদ্দীন আন্দোলনমুখী হয়েছিলেন। মিশনারীদের প্রচারকে ব্যর্থ করে মুসলিম জন মনে ইসলামের শাশ্বত বাণী ও শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করার লক্ষ্যে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বাংলা সাহিত্যে একজন খ্যাতিমান লেখক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মূখ্যত সাহিত্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিংবা সাহিত্য সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জমিরুদ্দীন কলম ধরেননি। সাহিত্য সৃষ্টির কোন কামনাও তাঁর ছিল না। (মুস্তফা নুরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য,[১] তবে একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে হয় যে, যে কর্মোদ্যোগে ও কর্ম প্রেরণায় তিনি প্রচারাভিযান চালিয়েছেন এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থেকেছেন; তারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে তাঁকে গ্রন্থাদি, পুস্তিকাদি ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়েছে। তাই তাঁর উদ্যোগে, নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় তৎকালীন যুগের মুসলিম সাহিত্য আন্দোলন বহুল পরিমাণে প্রেরণা লাভ করে। এ

[১] ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃ-২৯।

সকল কারণেই আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের জগতে জমিরুদ্দীনের সাহিত্য কর্ম প্রয়াস বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বাংলায় খ্রীস্ট ধর্মের প্রসার ও আক্রমণের প্রতিবাদে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। এ ক্ষেত্রে যশোর ছাতিয়ানতলার মুনশী মেহেরুল্লাহর নামটি বাদ দেয়া যায় না। কেননা তিনিও ছিলেন খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী লেখক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁরা উভয়ে এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে লেখনী কার্য পরিচালনা করেন। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ভাঙ্গণ রোধকল্পে মুনশী জমিরুদ্দীন ও মুনশী মেহেরুল্লাহর বক্তৃতা ও রচনাবলী অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। প্রকৃত অর্থে সে সময়ে খ্রীস্টান ধর্মের ব্যাপক আগ্রাসনের মুখে তাঁদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা-প্রতিরোধ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের উপকারের অপ্রতিশোধ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ করে গেছেন। তবে বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের লেখনীর গুণগত মান ছিল মুনশী শেখ মেহেরুল্লাহর লেখনীর চেয়ে কিছুটা অগ্রগামী। কারণ মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন শিক্ষাগত যোগ্যতায় মুনশী মেহেরুল্লাহর বেশ কয়েক ধাপ উপরে অবস্থান করেছিলেন, এ বিষয়ে বর্তমান গবেষক 'মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছে[২]।

সেকালে বাংলার নদীয়া, যশোরসহ কয়েকটি অঞ্চলে মিশনারীদের ধর্ম প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যীশুর মহিমা ও খ্রীস্টান ধর্মের সত্যতা প্রচার এবং দীক্ষিত করাই ছিল এই মিশনারীদের মূখ্য উদ্দেশ্য। এসব মিশনারীদের অতৎপরতার চিত্র তুলে ধরে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেনঃ

''তারা (মিশনারীরত) কোরানের অপব্যাখ্যা করতেন, ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা আজগুবী কাহিনী প্রচার করতেন এবং হজরতের চরিত্রে বিভিন্ন কলঙ্ক লেপন করতেন। হাঁটে বাজারে, পথে ঘাটে বক্তৃতা দান করে, প্রচার পুস্তিকা রচনা করে

[২] হোসেন মাহমুদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ-৪৮-৪৯।

এবং সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে মিশনারীরা তাঁদের প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে বহু সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমান স্বধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন''[৩]।

ইসলাম ধর্মের এই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজনেতা ও লেখকেরা উপলব্ধি করলেন যে, একদিকে মিশনারী প্রচারকার্যের মোকাবেলা করতে হবে অপরদিকে ইসলাম ধর্মের গৌরব মহিমা ব্যাখ্যা করে মুসলমান-জাতীয়-মানসকে উজ্জীবিত করতে হবে। সুতরাং যাঁরা এই মোকাবেলার নের্তৃত্ব প্রদান করেন তাঁদের রচনার মূল বিষয় ছিল ধর্ম সম্পর্কিত। ইসলাম প্রচারক মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের বহুবিধ লেখনী, প্রবন্ধাদি ও পুস্তিকাদির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম প্রমাণ করা যায় না।

১৮৯৫ সালে শেখ জমিরুদ্দীন স্বধর্মে ফিরে এসে দীর্ঘ আট বছরকাল ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে থাকার জন্যে নিজেকে বেশ অপরাধী হিসাবে বিবেচনা করেন। তারই প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে নিজেকে সার্বিকভাবে নিয়োগ করেন পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে। বিশেষ করে তিনি খ্রীস্ট ধমের্র অসারতা প্রমাণ করার প্রয়াসে বেছে নিলেন দু'টি পথ। প্রথমতঃ বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম-প্রচারমূলক সভা সমিতি। দ্বিতীয়তঃ লেখনীর মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন[৪]।

এ প্রসঙ্গে ডঃ ওয়াকিল আহমদের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়ঃ

''ইসলাম ধর্ম প্রচারে শেখ জমিরুদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান-বক্তৃতা দান ও পুস্তক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যের আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়া, ধর্মবোধে মুসলমানদের জাগ্রত করা-এক কথায় ইসলামীকরণ এবং তাদ্বারা সমাজের পুনর্জাগরণ-এই ছিল শেখ জমিরুদ্দীনের মুখ্য ব্রত''[৫]।

আমরা একথা দ্বিধাহীনচিত্তে উপলব্ধি করতে পারি যে, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে বেশীর ভাগই প্রেরণা দান করেছিল– স্বধর্মানুরাগ।

---

[৩] মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩১।

[৪] আ.শ.ম বাবর আলী, 'শেখ জমিরুদ্দীন, বাঙালি মুসলিম জাগরণে কয়েকজন বাঙ্গালী পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙ্গালী সাহিত্য-সাধক,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ-২৩।

[৫] ওয়াকিল আহমেদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ-২৯১।

তবে তিনি সৃষ্টিশীল কবি-লেখক-প্রাবন্ধিকদের সাহিত্য সাধনা থেকে কিছুটা ছিলেন পৃথক। শেখ আব্দুর রহীম (১৮৫৯–১৯৩১), পন্ডিত রেয়াজউদ্দনি আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯–১৯১৮), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আব্দুল জব্বার (১৮৮২-১৯১৯), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ লেখকদের ন্যায় জমিরুদ্দীন ভাবনা প্রধান রচনায় উৎসাহী ছিলেন, তাঁদের কেউই লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন না[৬]। আর্থিক দুর্গতি ও সামাজিক দৈন্যের যে ব্যাপক চিত্র ঊনিশ শতকের মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়, তারই একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া ছিল নানাবিধ ধর্মান্দোলন। উল্লেখিত মনীষীগণ ছিলেন সেই ধর্মান্দোলনের উদ্যোক্তা। একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁরা এ ধরণের ভাবনা প্রধান সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন[৭]।

অধঃপতিত বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। তাঁরই সমসাময়িককালের সংগ্রামী–পুরুষ মেহেরুল্লাহর নামটিও পুনরুল্লেখ করতে হয়। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন মুসলিম সমাজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করতে যে অবদান রেখেছেন তা তদানীন্তন বাঙ্গালী মুসলমানকে ইসলামমুখী করতে আরো একটি বিশেষ দলকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সে দলটিকে 'সুধাকর দল' আখ্যায়িত করা হয়। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তৎকালীন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রফেসর মৌলভী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের প্রফেসর রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বশিরহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুনশী শেখ আব্দুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রুপসার অধিবাসী মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। দারিদ্র্য ও অভাব উত্তোরণের প্রলোভনে পড়ে বাঙ্গালী

[৬] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদঃ অভিভাষণ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ-১০৫-১০৬।

[৭] ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃ-১৮৩।

মুসলমানেরা যে সেদিন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় ছিল তাদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানের স্বীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। আর এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা এবং সংবাদ পত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা করে মুসলিম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা[৮]।

উল্লেখিত সুধাকরের মনীষীগণ এ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনটির গোড়াপত্তন করেন এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রথমত মুসলিম কৃষ্টি এবং তাত্ত্বিক ইসলামের কিছু কিছু বইয়ের অনুবাদ করে খন্ড খন্ড আকারে তা প্রকাশ করেন। ইসলাম সম্বন্ধে পন্ডিত ও মনীষী জালালুদ্দীন আফগানী ফার্সী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন।[৯] বাঙ্গালী মুসলমান জাতির অবহেলিত দিনগুলোতে 'সুধাকর দল' নিজেদের স্বকীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। মোট কথা এ দলই যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করতে সহযোগিতা করেছিল সেপথ ধরে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ হয়। তাঁদের এ কৃতিত্ব বিচারে যে সাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই-ই ইসলামী সাহিত্য[৯]।

মধ্যযুগ হতে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে অনেক প্রথিতযষা ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য সেবী, আলেম-উলামা এগিয়ে এসেছেন, মুনশী জমিরুদ্দীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই সঙ্গে মুনশী মেহেরুল্লাহর নামটি যুক্ত করলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা কর্মজীবনে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লাহর আজীবন সহচর হিসেবে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা নুরউল ইসলামের উক্তি

''..... প্রচারক জীবনে যেমন সাহিত্য কর্মেও উভয়ের প্রয়াসে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মুনশী মেহেরুল্লাহর অনুরূপ মুনশী জমিরুদ্দীনের প্রবন্ধ পুস্তকাদি রচনার মৌল উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টান

[৮] মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যেও ইতিবৃত্ত, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৮ম সংস্করণ, পৃ-৯৯।
[৯] মুহাম্মদ রবিউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮।

মিশনারিদের প্রচার প্রতিরোধ করা এবং সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মগত আচরণ প্রতিষ্ঠিত করা''[১০]।

ধর্ম প্রচার ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা করলে শেখ জমিরুদ্দীন বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, একথা সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকার করতে হয় এবং সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ উভয় বিষয়ই একমাত্র স্থান অধিকার করে আছে। এটা পুনরুল্লেখ করতে হয় যে, জমিরুদ্দীনের সাহিত্য-রচনায় শিল্প-প্রেরণার উপাদান না থাকলেও মুসলিম-জাতীয়-জাগরণে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। এ ব্যাপারে ডঃ আবুল আহসান চৌধুরীর মন্তব্যঃ

''মুনশী জমিরুদ্দীন বিশুদ্ধ প্রেরণায় সাহিত্যচর্চা করেননি, বিশেষ উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তিনি লেখনী ধারণ করেন। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য অন্বেষণ ও প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এ কাজ করত গিয়ে তাকে ভিন্ন ধর্মী বিরুদ্ধ পক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। মূলত ধর্মপ্রচার ও সেই সূত্রে খ্রীস্টান প্রাদ্রীদের সঙ্গে বাদানুবাদই তাঁকে লেখক হতে উদ্বুদ্ধ করে তাই সঙ্গত কারণেই এসব রচনার বিশেষ কোন সাহিত্য মূল্য নেই, আছে কেবল প্রচারমূল্য। প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় প্রয়োজনে, সমাজহিতের কারণে তাঁকে আমৃত্যু অক্লান্তভাবে লেখনী চালনা করতে হয়েছে''[১১]।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী একশ' বছরে বাঙ্গালী মুসলমানগণ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে। উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশের নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী প্রমুখের প্রচেষ্টায় সেসব প্রতিকূলতা উতরানো সম্ভব হয়। ফলে ঊনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম লেখকদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং নিপুণ সেবকের ন্যায় তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের কলুষতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অপসংস্কৃতির অবসান ঘটে।

---

[১০] মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ-৩৭।
[১১] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবন গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৪৮।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সেকালের একজন সাহিত্য সেবী হিসেবে মুসলিম-মানসে সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন। তিনি স্ব-সমাজের লোকদিগকে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে তিনি খ্রীস্টান ধর্মের অপসারতামূলক গ্রন্থাদির প্রতিবাদ ও জবাবীমূলক পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, স্বধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পর থেকে আমৃত্যু ইসলাম প্রচার প্রসারে ইসলামের মাহাত্মসূচক যুক্তিপূর্ণ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন[১২]। ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি' পুস্তিকায় জানা যায়, তৎকালীন সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন তাঁদের অন্যতম[১৩]। 'কুষ্টিয়া জেলা গেজেটীয়ারে' যে সকল কবি-লেখক-সাহিত্যিক গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে বিশাল অবদান রেখেছেন বলে উল্লেখ আছে, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন তাদের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর লেখনীর সাহিত্যিক মান ও রচনাশৈলী সেকালের লেখক সমাজে এতই সমাদৃত হয়েছিল যে, তার নামের শেষে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'কাব্যনিধি' উপাধি ব্যবহার করা হতো। সুকুমার সেন রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' বলা হয়েছে-সে সময়ে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া (তখনো দেশ ভাগাভাগি হয়নি) ছিল সাংস্কৃতিক প্রভাবের আওতায়[১৪]।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন ইসলামী সাহিত্যের একজন অসাধারণ প্রতিভা। তিনি এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে লেখনী ধারণ করেন যখন খ্রীস্টান মিশনারীরা তাঁদের প্রচার পুস্তকের ছদ্ম নাম ইসলামী নামকরণের মাধ্যমে চালিয়ে দিতেন। ফলে মুসলমানগণ সেই মনোমুগ্ধকর পুস্তকের নাম শুনে মরিচিকার ন্যায় খ্রীস্টান আদর্শে নিজেদেরকে অবগাহিত করতে থাকেন। মুনশী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ভাবলেন এক্ষেত্রে কলমের যুদ্ধই হলো প্রকুত জিহাদ। তাই তিনি খ্রীস্টধর্মের অসারতা ও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে লেখনী ধারণ করেন এবং মিশনারীদের কলম বুমেরাং করে ছাড়েন। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেনঃ

---

[১২] মুহাম্মদ মনসূর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মসলিম সাধনা, ২য় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭১ বাংলা, পৃ-১৮৯-১৯০।
[১৩] আবুল আহসান চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি, কুষ্টিয়াঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ-১০।
[১৪] সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যেও ইতিহাস, ১ম খন্ড, কলিকাতাঃ ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ-১১৩।

''..... বিধর্মীর সাহিত্যের প্রভাবে ইসলাম ও মুসলমান জাতির (খোদা না করেন) এদেশে অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়বে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তিই এদিকে তেমন মনোযোগ দিতেছেন না বা দিতে পারিতেছেন না। আমি যতদূর জানি, জনাব মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব বর্তমানে খৃস্টান পাদ্রীগণের প্রচারিত ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তকগুলির প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যোগ্য লোক, সন্দেহ নেই''[১৫]।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখনীর প্রতি অনুপ্রাণিত হননি ঠিকই, তবে তাঁর রচিত সাহিত্য ছিল সমাজের কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন করা, খ্রীস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার জবাব দেয়া, সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা-বেহায়াপনাকে বিলোপ করা এবং সুশিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। এসব কারণে তাঁর সাহিত্যের ভাবধারা সুস্পষ্ট। অন্য লেখক সাহিত্যিকের রচনাশৈলীর স্টাইল দ্বারা মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ প্রভাবিত হননি; বরং তাঁর লেখনীতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বিদ্যমান ছিল। তাঁর লেখনী সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ ও ভাবসম্বলিত এবং ভাষা অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। সমকালীন সময়ে লেখক সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনার সাথে তুলনা করলে আমরা বলতে পারি; জমিরুদ্দীনের উন্নত চিন্তা জ্ঞানের পরিপক্কতা ও গভীরতায় তাঁর রচনাবলী কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

সমাজ সংস্কার সাধন এবং সমাজের মানুষকে সৎকর্মশীল, সুনাগরিক ও ইসলামিক আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ অন্তরের গভীর অনুভূতি নিয়ে অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। বিদেশী ভাষার একাধিক গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর লিখিত এসব বই-পুস্তক কেবল বাংলা সাহিত্যের সম্পদ নয়: মানুষকে চরিত্রবান, আল্লাহভীরুকরণ, সমাজ সংস্কারে ও ইসলামী আন্দোলনকে সুসংহত করার কাজে সার্থক ভূমিকা পালন করে।

শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদের রচিত গ্রন্থাদির মূল্যায়ণ করতে যেয়ে ডঃ আনিসুজ্জামান বিষয় বস্তুর দিকটাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে

[১৫] শেখ হবিবর রহমান সাহত্যরত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ-৪২।

মুসলিম সামাজিক আন্দোলনে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দীনের ভূমিকা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন[১৬]।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি ও পান্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান সুহৃদদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে নিকটতম পরম বন্ধুদ্বয় মুনশী মেহেরুল্লাহ ও ফুরফুরার পীর মুহম্মদ আবু বকর (১৮৪৯-১৯৩৯) যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তারা উভয়েই মিলে মুসলিম সুহৃদদের প্রতি জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে নিঃস্বার্থ সাহায্যের আহ্বান জানালে তাতে উল্লেখযোগ্য সাড়াও পাওয়া যায়। এমনকি বিদেশী সাহায্যেরও খবর পাওয়া যায়। আমেরিকার কলম্বিয়া থেকে শেখ জওহর আলী মিয়া (গ্রাম-হারাট, ডাকঘর-বন্দিপুর, জেলা-হুগলী) নামক একজন প্রবাসী বাঙ্গালী ইসলামী প্রচারক 'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের বই প্রকাশের জন্যে আর্থিক সাহায্য পাঠান। এভাবে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বঙ্গীয় মুসলিম জনস্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশী সাহায্য ও গ্রহণ করেছেন। বিদেশ থেকে জওহর আলী মিয়া ৬ পাউন্ডের একটি চেকের সঙ্গে শেখ জমিরুদ্দীনকে একটি চিঠিও লেখেন[১৭]।

বহুভাষাবিদ পন্ডিত, সুলেখক ও সুবক্তা মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ইসলাম ও খ্রীস্ট ধর্ম-তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখনী সবকিছুই ইসলাম পুনর্জাগরণের জন্য নিবেদন করেন। নদীয়া, যশোর, বরিশাল, বিশেষ করে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার মুসলমানদের মধ্যে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণের যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় তাদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'বিচিত্রায়' তাই লিখেছেন- ''মুসলমান লেখকদের মধ্যে গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর নিবাসী শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে পুস্তক লিখে মুসলমান সমাজের প্রভুত কল্যাণ সাধন করেন''[১৮]। তাঁর রচনাবলীর মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানের উক্তির অনুসরণ করে বলা যায়– ''জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর মধ্যে

[১৬] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৪।
[১৭] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থশালা-২৩, পৃ-৪৯।
[১৮] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪৩।

যা কিছু মূল্য রয়েছে তা বিষয় স্তর দিক দিয়ে। তাই সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা স্মরণীয়''। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সেকালে মুনশী জমিরুদ্দীনের মত সমাজ-সংস্কারক লেখকের আবির্ভাব না হলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অবস্থা যে কি হতো ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। সাহিত্যের জগতে শেখ জমিরুদ্দীনের রচনা স্বল্প সংখ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল না। মুনশী মেহেরুল্লাহর জীবনী লেখক শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন মুনশী সাহেবেরই বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন কর্তৃক সর্বসমেত ১০৮ খানা পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুতের দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেননি বিধায় উক্ত সংখ্যার কথা অতিরঞ্জিত বলে ধারণা করা হয়। সত্য বলতে শেখ জমিরুদ্দীনের রচনাবলী বর্তমানে দুষ্পাপ্য হয়ে পড়েছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, পর্যায়ক্রমে সে সব পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা ও আজ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জমিরুদ্দীন রচিত কিছু কিছু প্রবন্ধের শিরোনামের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাঁর সবগুলো প্রবন্ধ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর[১৯]।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদন অনেকগুলো মৌলিক প্রবন্ধ এবং অনূদিত ও অনুবাদমূলক প্রবন্ধ পরবর্তীকালে পুস্তক-পুস্তিকাকারে সংকলিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত গ্রন্থ-পুস্তক-পুস্তিকামালাকে নিম্নলিখিত বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছেঃ

ক) খ্রীস্টান মিশনারীদের আক্রমণাত্মক রচনার জবাবে রচিত রচনাবলী

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য', হজরত ইসা কে?' 'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী', 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য', 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন', 'মাসুম মোস্তফা (দঃ) অর্থ্যাৎ হযরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা', 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য', 'আসল বাইবেল কোথায়?', রদ্দে সত্য ধর্ম নিরুপণ ও হেদায়েতুল খ্রীস্টান', পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন', 'আসল হুলিয়ানামা', প্রভৃতি শ্রেণীর পুস্তক।

[১৯] আনিসজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪, পৃ-৩৫৯।

(খ) সাহিত্যবিষয়ক রচনা

শেখ জমিরুদ্দীন সাহিত্যবিষয়ক বা সৃষ্টিধর্ম যেসব পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন তা অত্যন্ত ভাবসম্বলিত এবং হৃদয়গ্রাহী। তন্মধ্যে 'কোথা চলি গেলে', 'আসল বাঙ্গালা গজল', 'শোকানল' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'নিশীথে' ও 'পূর্ণচন্দ্র' এ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁর রচিত কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতার কথাও জানা যায়[২০]।

(গ) অনুবাদমূলক রচনা

'ইসলামী বক্তৃতা', এই শ্রেণীর রচনা। এছাড়া 'হযরত ইসা কে?', 'হযরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী' ইত্যাদি পুস্তিকাও অনুবাদমূলক রচনার অন্তর্ভূক্ত। আর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কিছু কিছু অনুবাদ প্রবন্ধ পরবর্তীতে কোন কোন পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঘ) সমাজকল্যাণমূলক রচনা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সমাজ কল্যাণমুখী কিছু প্রবন্ধ রচনা করলেও তা কোন বইতে সংকলিত হয়নি, বরং তা পত্র পত্রিকায় দেখা যায়। 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার', 'তামাকের অপকারিতা' প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রবন্ধ।

(ঙ) ইসলামের ইতিহাস ও ঐহিত্য বিষয়ক রচনা

'ইসলামের সভ্যতা', 'জঙ্গে কারবালা', 'জওয়াবোন্নাছারা', ' গৌড়ের ইতিহাস' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা[২১]।

(চ) ভ্রমণ কাহিনীমূলক শহঠত

'দার্জ্জিলিং ভ্রমণ', 'পশ্চিম ভ্রমণ', 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ', 'মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত' , মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ প্রভৃতি প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(ছ) জীবনীমূলক রচনা

---

[২০] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৫২।
[২১] মুহাম্মদ রবীউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৫।

'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত', 'Glory of Islam', 'মেহের চরিত', 'বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)- এর জীবনী' এ জাতীয় গ্রন্থ। সাময়িক পত্রে কয়েকজন মনীষীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে পাওয়া যায়- 'মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী', 'হযরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত', 'হযরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ', শীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী', হযরত মাওলানা লুৎফুল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সিরাজগঞ্জী (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' এবং শেখ জমিরুদ্দীনের স্মৃতিচর্চামূলক 'খ্রীস্টিয় সমাজে আট বৎসর' শীর্ষক রচনা[২২]।

(জ) বিবিধ রচনা

'পদশিক্ষা ব্যাকরণ', 'বিশুদ্ধ খতনামা'. নামাজ পড়া শিক্ষা' প্রভৃতি বিবিধ রচনার অন্তর্ভূক্ত।

আমরা মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে যেসব গ্রন্থ পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি, সেগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

১. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের এটি প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা। ২৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ কর্তৃক অন্নপূর্ণা প্রেস, যশোহর, ১৩০৪ হিঃ/ ইংরেজী ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয়[২৩]।

লেখক এই গ্রন্থে তাঁর বাল্যজীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে এবং মিশনারীদের প্রলোভনে পড়ে কিভাবে মুসলমান পরিবারের সন্তানরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করতো চমৎকারভাবে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করে অসংখ্য মানুষকে ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টা, অতঃপর পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে

[২২] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৫১।
[২৩] আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃঃ ৪১২-৪১৩।

কিভাবে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন তার পূর্ণ বিবরণ উক্ত পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। তাঁর পিতৃ পরিচয়, তাঁর জন্মস্থান গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুরের সেকালের পরিবেশ, মক্তবখানায় লেখা-পড়া, বঙ্গবিদ্যালয়ে আগমন, পরে কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি, নর্মাল স্কুলে থাকাকালীন সময়ে মিশনারীদের সাথে আলাপ, বিভ্রান্তিমূলক কিছু গ্রন্থ পাঠ করে খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ, বাবা-মাকে ত্যাগ করে খ্রীস্টানদের আশ্রয় লাভ, পাদ্রী (মিশনারী) হিসাবে এলাহাবাদ, কলকাতা ও পরবর্তীতে নদীয়ায় খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করে অনেক সংখ্যক মুসলমানকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা, 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখাতে মুনশী মেহেরুল্লাহর সাথে তর্কযুদ্ধ এবং পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাবলী অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় আত্ম-জীবনীতে বর্ণিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের ভূমিকায় তাই বলা হয়েছে— শেখ মুহাম্মদ জমিরুদ্দীনের এই আত্মজীবনীতে সেকালের মুসলিম সমাজের পূর্ব-অসহায়তা ও পরবর্তী আশা-আকাঙ্খার একটি চমৎকার বিবরণী আলোকপাত করা হয়েছে যার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য[২৪]।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথায় মুনশী মেহেরুল্লাহর বলেছেন–

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন একজন উপযুক্ত প্রচারক ও তেজস্বী বক্তা। একজন শিক্ষিত পুরুষের স্বেচ্ছায় খ্রীস্ট ধর্ম পরিত্যাগ ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে আত্মোৎসর্গ করা, বাস্তবিক আমাদের গৌরবের বিষয়। কিন্তু তিনি যাবৎ মিশনারী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাবৎ অর্থাভাবে অতি সামান্যবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেছেন; একথা ও মুসলমান সমাজের পক্ষে তাদৃশ কলঙ্কজনক। শেখ সাহেব মুসলমান ধর্ম প্রচারার্থে স্বীয় জীবন উৎস্বর্গ করিয়াছেন। তিনি এখন উপযুক্ত সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা ইসলাম বিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গর্ব্ব গর্ব্ব করিতে পারিবেন। অতএব হে স্বধর্ম-হিতৈষী মুসলমান ভ্রাতাগণ! আপনারা সত্ত্বরেই

[২৪] মুহাম্মদ রবিউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৩।

উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়া তাঁহার সুমধুর ওয়াজ শুনিয়া জীবন সার্থক ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে উৎসাহিত করুন[২৫]।

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় আষাঢ় ১৩১৪ সালে। কলকাতার রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত ইহার প্রকাশক ছিলেন দিনাজপুরের শিমোর অধিবাসী মোঃ উবুদ্দনি চৌধুরী। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। লেখকের ভক্তগণ বারবার তাঁর কাছে এই বই পুনঃ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছেন কিন্তু অর্থাভাবে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেননি। অবশেষে মোহাম্মদ উরুদ্দীন চৌধুরী এ দায়িত্ব গ্রহণ করে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এজন্য জমিবুদ্দীন তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। শেখ মুহাম্মদ জমিবুদ্দীনের এই বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ পায় রাজশাহী থেকে। মুহাম্মদ আবু তালিব ও ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযম-এর সম্পাদনায় ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত বইখানি সুখী সমাজের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়[২৬]।

২. Glory of Islam

মুনশী শেখ জমিবুদ্দীনের এই গ্রন্থটি তাঁর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক ১৯২৯ সালে প্রকাশ পায়। ১০৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি জি.বি. দে-এর মুদ্রণায় ওরিয়েন্টাল প্রিটিং ওয়ার্কস, ১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত[২৭]।

'Glory of Islam' গ্রন্থটি পাঁচটি প্রবন্ধে সন্নিবেশিত। প্রথম প্রবন্ধটি 'From Christianity to Islam' জমিবুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী রূপান্তর, যা মূলতঃ অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে রচিত। তিনি অতি সহজ ও সাবলীল ভাষায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে। এ গ্রন্থের অপর চারটি প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা নয়, কয়েকজন

[২৫] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, পৃ-৪৩-৪৪।
[২৬] মুহাম্মদ রবিউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪।
[২৭] আব্দুল আহসান চৌধুরী, মুন্সী শেক জমিউদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃষ্ঠা-৬৭।

প্রখ্যাত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত,— যা তিনি সংকলন করেছেন। এর প্রথম মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'Asiatic Quarterly Review পত্রিকার ১৮৮৮, অক্টোবর সংখ্যায়। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ 'ফারাক্লিত সম্বন্ধে পাদ্রী জন সাহেবের বৃত্তান্ত' এই শিরোনামে 'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের (যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব) তৃতীয় পুস্তিকায় সংযোজিত হয়। মৌলবী ওসমান আলি (বি, এল) সাহেবের সাহায্যে শেখ জমিরুদ্দীন প্রবন্ধটি বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। পরবর্তী কালে ইংরেজী মূল প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের 'Glory of Islam' পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়[২৮]। দ্বিতীয় প্রবন্ধ Islam in Africa, St. James Gazette of London পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৮৮৭, অক্টোবর সংখ্যায়। তৃতীয় প্রবন্ধটি Dr. Leitner's Lecture on Muhammedanism'। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন কর্তৃক লিটনার সাহেবের এ বক্তৃতা ইংরেজী হতে অনুবাদিত হয়ে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এ প্রবন্ধে ইসলাম সম্বন্ধে ডঃ লিটনার সাহেবের সুস্পষ্ট মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ১৮৫৪ সালে কনস্টান্টিনোপলের একটি মসজিদ স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং পবিত্র কোরআন শরীফের অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করেছিলেন। পবিত্র কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলাম সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারনার বিকাশ লাভ করে। তিনি তার বক্তৃতায় সকল ধর্মের বিশেঘ করে খ্রীস্ট ধর্মের সমালোচনা করেছেন এবং 'ইসলাম ধর্মকে' শীর্ষে স্থান দিয়েছেন[২৯]। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর প্রতি খ্রীস্টানদের বিষোদগারের প্রতিবাদ জানিয়ে ডঃ লিটনার সাহেব কুরআন-হাদিসের আলোকে তাঁর [মুহাম্মদ (সা)] শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন এ প্রবন্ধে। তিনি যীশু [ঈসা (আ)]-কে যেমন নবী হিসেবে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কেউ শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনে বসিয়েছেন। তিনি এ প্রবন্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে জোর দিয়ে লিখেছেনঃ

ইয়াহুদী, খৃস্টান এবং মুসলমান ধর্ম পরস্পর সহোদরের ন্যায়-ঐ সকল ধর্মের উৎপত্তি স্থান একই। আমি আশা করি, এমন এক সময় আসিবে, যখন

[২৮] মুস্তফা নূরউল ইসলাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪।
[২৯] (আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৬৭)।

খৃস্টানেরা যীশুখৃস্ট ও হযরত মোহাম্মদ (সা) এই উভয়ের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিবে।

চতুর্থ প্রবন্ধটির নাম 'An European convert to Islam in the 15-th century' এ সকল প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক তুলে ধরে অমুসলিম লেখকরা ও এই ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন[৩০]।

৩. মেহের–চরিত

এখানে 'মেহের-চরিত' বলতে যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা নিবাসী ইসলাম প্রচারক, বাগ্মীকুলতিলক, মুনশী মোহাম্মদ মেহেউল্লাহর জীবনীকে বুঝিয়েছি। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত জীবনী সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই 'মেহের চরিত'। বাংলা ১৩১৫ সালে এটি শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির মুদ্রকঃ মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। (মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত-এর ভূমিকা হতে সংকলিত)।

প্রথম পর্যায়ে মুনশী জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী 'ইসলাম প্রচারক' ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পরে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে তিনি মেহেরুল্লাহর জীবনীর উপর এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন–গ্রন্থের নাম 'মেহের চরিত'। মুনশী জমিরুদ্দীন ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুনশী মেহেরুল্লাহর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একান্ত অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। এই দুই সহকর্মী তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে কিভাবে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচার কাজের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে জাগ্রত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার প্রামাণ্য বিবরণী প্রদান করা হয়েছে 'মেহের-চরিতে'। বাঙ্গালী মুসলিম জনমনে খ্রীস্টান মিশনারী প্রচার-প্রক্রিয়া নির্ণয়ের কাজেও এ গ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহ করা যাবে। (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯)।

[৩০] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, ইসলাম সম্পর্কে লিটনার সাহেবের বক্তৃঝড়, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১১ বাংলা, পৃ-৫৫-৫৬।

মুনশী জমিরুদ্দীনের জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে 'মেহের-চরিত'ই শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই জীবনী-গ্রন্থের অনুকরণেই পরবর্তীকালে মোহাম্মদ আছিরদ্দীন প্রধান 'মেহেরুল্লাহ' (১৯০৯) ও শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহর' (১৯৩৪) রচনা করেন। জমিরুদ্দীন রচিত এ গ্রন্থটি সম্পর্কে সেকালের বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের লেখক, প্রাবন্ধিক চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ণ করেছেন। তাঁরা এ রচনাকে যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য রচনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'বাসনা' (মাঘ-চৈত্র ১৩১৫) পত্রিকায় 'মেহের চরিত' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়ঃ

''যিনি গুণে সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে কিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায় বাংলাদেশের মুসলমানেরা জাতীয় উন্নতির জন্য অভ্যুত্থান করিয়াছেন, সেই কর্মবীর ধর্ম্মাত্মা মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাহেবের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কি আছে? শেখ সাহেব পরলোকগত মহাত্মার জীবনী কীর্ত্তন করিয়াছেন; যোগ্য হস্তে যোগ্য কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি''[৩১]।

মোদ্দাকথা যুগের চাহিদা পূরণে মুনশী মেহেরুল্লাহ ছিলেন নিতান্তই ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করে লেখক 'মেহের-চরিত' প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে অনুকরণীয় চরিত হিসেবে উৎসাহিত করেছেন।

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের পুস্তক–পুস্তিকামালা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচনা সম্ভারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ 'রদ্দে খ্রীস্টান' পুস্তক–পুস্তিকামালা। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে এই পুস্তক–পুস্তিকাসমূহের ব্যাপক প্রচার ও প্রকাশ, তা হলো মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টানী তৎপরতার অবসান। লেখকের অভিপ্রায় ছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার 'রদ' করা বা প্রতিবাদ করা। যেহেতু সেকালে মুসলমানদের মধ্যেও খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার এবং ইসলাম–বৈরিতার প্রভাব প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছিল, তাই তার প্রত্যুত্তরে তিনি 'রদ্দে খৃস্টান' বিষয়ক লেখনী ধারণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত

[৩১] মুহাম্মদ রবিউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১-৪২।

করেছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবু বকর (রহ)। মূলতঃ তাঁরই নির্দেশে মুনশী জমিরুদ্দীন 'রদ্দে খৃস্টান' পুস্তক-পুস্তিকাগুলোর অধিকাংশ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন–কয়েকটি প্রচ্ছদ পত্র[৪৪] থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। আমরা এ পর্যন্ত 'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের ৯টি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পেয়েছি। তন্মধ্যে একটি পুস্তিকা ব্যতীত বাকীগুলো জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা[৩২]।

৪. ইসলামী বক্তৃতা

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের প্রথম পুস্তকের নাম 'ইসলামী বক্তৃতা'। খ্রীস্টান পাদ্রীদের প্রচারণার জবাবীমূলক এই পুস্তকটি শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতার রেয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের সোলেমান কর্তৃক পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩১৭ সালে।

শেখ মোঃ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে। মুদ্রকঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। এই সংস্করণে প্রকাশিত বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮+২। উৎসর্গঃ "পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন-অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/ খান বাহাদুর সাহেব জোনাবেষ[৩৩]।

'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৩২ সালে। কলিকাতার 'শীল প্রেস' হতে নরেন্দ্রকুমার শীলের মুদ্রণায় ৬০ পৃষ্ঠার এ পুস্তকটি শেখ আজিজুদ্দীন কাব্যবিনোদ, গাঁড়াডোব নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত। উৎসর্গঃ "পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন-অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/ খান বাহাদুর সাহেব জোনাবেষু[৩৪]।

কয়েকজন ইউরোপীয় পন্ডিত ব্যক্তি ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলো 'Christanity and Islam' শিরোনামে ইংরেজী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। এটাই 'ইসলামী

[৩২] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সমকালীন প্রেক্ষাপটে সরাম প্রচারে তাঁর অবদান, পৃ-১৪৯)।
[৩৩] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৫৭-৫৮।
[৩৪] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।

বক্তৃতা' পুস্তক। এই পুস্তকে সর্বমোট ৫টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে–যা পাঁচজন বিজ্ঞ প্রাবন্ধিকের রচনা। তাঁরা হলেন— ক্যানন আইজ্যাক টেলর, লিটনার, টমাস কার্লাইল ও জন আব্দুল্লা প্রমুখ লেখক ও বক্তা। সংস্করণের সংখ্যাধিক্য থেকে প্রমাণিত হয়, বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৩৩২ সালে মাসিক 'শরিয়ত' পত্রিকায় 'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা[৪৮] প্রকাশিত হয়। ঐ একই সালে মাসিক 'ইসলাম দর্শন', পত্রিকায় এই পুস্তকের আলোচনা করা হয়। ইসলাম সাম্যের ধর্ম, ন্যায়ের ধর্ম ও শান্তির ধর্ম-বহু অমুসলিম প্রাজ্ঞ পন্ডিতেরা এ বাস্তবধর্মী উক্তিকে অকপটে স্বীকৃতি দিয়েছেন; তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।। এক্ষেত্রে তাঁরা লেখনী ধারণ করেছেন এবং বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেছেন। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের অভিপ্রায় ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান মিশনারীদের ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে উদ্ভট অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর ও প্রতিবাদ নিজের কথায় না দিয়ে তাদেরই স্বগোত্রীয় ভাই বন্ধুদের লেখার মাধ্যমে দিতে। 'ইসলামী বক্তৃতা' নামের অনুবাদমূলক পুস্তকটি তাঁর সেই ইচ্ছার অংশবিশেষ[৩৫]।

৫. ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের দ্বিতীয় পুস্তিকা 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের স্বাক্ষ্য' শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক ১২ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৩৩২ সালে প্রকাশিত। মুদ্রকঃ এ,কে, শীল, 'শীল প্রেস', ৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা। পুস্তিকাটি হযরত মোহাম্মদ (সা)- এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মধ্যে লেখক পাদ্রী রাউস সাহেবের উক্তির ব্যাখ্যা করে ইসলামের প্রতি খ্রীস্টানদেরকে আকৃষ্ট করেছেন। এভাবে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন নবদীক্ষিত বহু খ্রীস্টানকে মুসলমান করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর কলম-যুদ্ধ। পুস্তিকাটির বিজ্ঞাপন অংশে অনুবাদক

[৩৫] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৮।

হযরত মুহাম্মদ (সা)- এর আগমন সম্বন্ধে পাদ্রী রাউস সাহেবের স্বীকরুক্তির প্রশংসা করেছেন[৩৬]।

৬. রদ্দে সত্য-ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টান

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের তৃতীয় পুস্তকের নাম 'রদ্দে সত্য-ধর্ম নিরুপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টান'। শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ১। ৯+৫২ পৃষ্ঠার এই বইখানি ১৩৩২ সালের মুদ্রিত হয়। মুদ্রকের নাম পাওয়া যায়নি। ১৮৯৯ সালে জনৈক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী 'সত্য-ধর্ম নিরূপণ' নামক গ্রন্থে মুসলমান ধমৃ ও হজরত রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে যে বিরূপ সমালোচনা করেন তার প্রত্যুত্তরে এ বইখানি লিখিত হয়[৩৭]।

উক্ত খ্রীস্টানী বইখানিতে হজরত মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুস্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরিনির্যাতক ইত্যাদি আপত্তিকর ও অন্তর বিদীর্ণকারী কথা লিখিত ছিল। আরো লিখিত ছিল, 'কোরাণের ধর্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে, কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম ।' সেই বিষ্ঠাবমনকারী 'সত্য-ধর্ম নিরূপণ' নামকের পুস্তকের দম্ভপূর্ণকারী প্রতিবাদ এই বইয়ে যথানির্ভর যোগ্যভাবে করা হয়েছে।

বইটি মুদ্রণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ফুরফুরার পীর সাহেব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িক-পত্রে ও এ সম্পর্কে আবেদন জানানো হয়। যেহেতু প্রতিবাদী লেখক নিজেই একজন প্রথিতযশা মিশনারী ছিলেন, খ্রীস্ট-সমাজ সম্বন্ধে তাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল যথেষ্ট। সুতরাং তাঁর দ্বারা উক্ত পুস্তকের প্রতিবাদ জানিয়ে খ্রীস্টানদের মুখোস উন্মোচন করা যথোপযুক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। 'রদ্দে সত্য-ধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃস্টানের বিজ্ঞাপন অংশে মুসলিম প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বইয়ের প্রথম অংশে মুনশী জমিরুদ্দীন উক্ত 'সত্য-ধর্ম

[৩৬] পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫।
[৩৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪।

নিরূপণ' থেকে 'মোহাম্মদী ধর্মের পরীক্ষা' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন এবং পাদটীকায় তিনি পাদ্রীদের প্রতিটি আক্রমণের উত্তর দিয়েছেন।

৭. হযরত ঈসা কে?

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের চতুর্থ পুস্তিকা 'হযরত ঈসা কে? শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়ডোব, নদীয়া কর্তৃক ৩১ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে। কলিকাতার রেয়াজুল ইসলাম প্রেস', থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের মুদ্রণায় অকাট্য যুক্তিনির্ভর এ বইখানি লেখক তাঁর পরম সুহৃদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবকে উৎসর্গ করেন একই প্রকাশনায় ও একই মুদ্রণায় এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। সর্বশেষ বইটির চতুর্থ সংস্করণ কলিকাতার 'শীল প্রেস' থেকে নরেন্দ্রকুমার শীল'-এর মুদ্রণায় স্বজাতি বৎসল হাজী মোহাম্মদ আব্দুল আজীজ জমিদার ভাবতাকে উৎসর্গ করা হয়।

যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা নিবাসী মুনশী মেহেরুল্লার অনুরোধে জমিরুদ্দীন এ পুস্তিকার পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। পরে এটি বই আকারে প্রকাশ পায়। লেখক জানিয়েছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান মিশনারী শ্রীযুক্ত আকবর মসীহ সাহেব প্রণীত 'উলহতে মসীহ' নামক সুবিখ্যাত উর্দ্দু পুস্তক অবলম্বনে তিনি 'হজরত ঈসা কে' পুস্তিকাটি রচনা করেন[৩৮]। মুনশী জমিরুদ্দীনের উদ্দেশ্যে ছিল হজরত ঈসা (আ) -এর ঈশ্বরত্ব বিচার করা। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তিঃ

''.... খ্রীস্টীয় সমাজ হজরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি খোদা কি না, এ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; কারণ যদি তিনি খোদা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উপাসনা করা আমাদের কর্তব্য। আর যদি তিনি খোদা না হন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে উপাসনা না করা কর্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে না জানিয়া হজরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ঈসা খোদা কি না, এ বিষয়ে সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় অদ্যাপি কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। ..... ইসা কে অর্থ্যাৎ তিনি খোদা কি বান্দা, এই বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক

[৩৮] শেখ জমিরুদ্দীন, হযরত ঈসা কে? কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ২য় সংস্করণ, ১৩১৪ বাংলা, বিজ্ঞাপন অংশ।

লিখিতে যশোর-ছাতিয়ানতলা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম ধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ সাহেব আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহারই অনুরোধের বশবর্তী হইয়া হজরত ঈসা কে? জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা যদি একটা ঈসা পূজকের মনও একেশ্বরে আসে, তাহা হইলে আমার যাবতীয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব''[৩৯]।

ঈসায়ী বা খ্রীস্টানদিগের পূর্ণ–বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আ) তথা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর; স্বয়ং জগৎ-পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর। মানবকে পাপী বা গোনাহগার দেখে, করুণাবশতঃ তাদের পাপের কাফফারা বিধানার্থে নিজেই বিবি মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ ও 'ঈসা' নাম ধারণ করেন এবং ৩৩ বছরকাল ইহজগতে থেকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান ও অলৌকিক ক্রিয়া (মোজেজা) সম্পাদন করে পরিশেষে ইহুদীদিগের চক্রান্ত ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। পুনরায় তিনি তৃতীয় দিবসে জীবিত হয়ে স্বর্গে গমন পূর্বক আল্লাহ তা'আলার দক্ষিণ পাশে বসে বসে উম্মতের জন্যে মোনাজাত (অনুরোধ) করছেন[৪০]।

হযরত ঈসা কে? 'বইখানিতে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আ) কখনো খোদাতা'য়ালা নন, তিনি বাস্তবিক খোদা তা'আলার সৃষ্ট একজন শ্রেষ্ঠতম মানুষ মাত্র। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করতঃ উল্লেখ করেছেনঃ

''..... যদি মানুষের বংশাবলীর ন্যায় ঈশ্বরের বংশাবলী হয়, তবে ঈসাই ঈশ্বর যীশুর পিতামহ ও প্রতিতামহের নাম কি? বাস্তবিক বর্তমান খ্রীস্টানী বিশ্বাসের ন্যায় প্রেরিতদিগের বিশ্বাস ছিল না; ইহুদীগণ সমুদয় নবী ও ধার্মিক পুরুষগণকেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ডাকিত, বাইবেল পাঠ করিলে ইহাই অনুমিত হয়; ইঞ্জিলে জলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, " আদম ঈশ্বরের পুত্র" দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ। এখন কি আমরা বলিব যে, আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত কি? সত্য যদি প্রেরিতগণ যীশুকে

[৩৯] পূর্বোক্ত, বিজ্ঞাপন অংশ।
[৪০] পূর্বোক্ত, পৃঃ৭-৮।

ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়; কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারেন না''।

১৩১৬ সালের তৎকালীন [মাসিক] পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে এ পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য সংকলিত হয়েছে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায়'। মন্তব্য এরূপঃ

''এই ক্ষুদ্র পুস্তিক খানি পাঠ করিলে বোধ হয় অনেক ভ্রান্ত খ্রীস্টান ও অনেক অজ্ঞ মুসলমানের চোখ ফুটিবে। ধর্ম জীবনে সাফল্য লাভ প্রয়াসী প্রত্যেক খৃস্টানের যেমন ইহা অবশ্য পাঠ্য, আত্মরক্ষার জন্য তেমনই ইহা সকল মুসলমানের নিত্য আদরে পঠিতব্য''[৪১]।

১৮৯৯ সালে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় এ পুস্তিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে[৪২]। এছাড়া বাংলা ১৩০৭ সালে 'লহরী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত মন্তব্যটি ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী সংকলন করেছেন। সর্বোপরি, মুনশী শেষ জমিরুদ্দীন 'হযরত ঈসা কে? বই খানি রচনা করে মুসলিম সমাজকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

৮. ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের পঞ্চম পুস্তিকা 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য। শেখ আজিজুদ্দিন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক কলিকাতার ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদের মুদ্রণায় ১৩ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে। একই প্রকাশক কর্তৃক কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের মুদ্রণায় ১৩১৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্কর হয় ৫০ পৃষ্ঠায়। এরপর তৃতীয় সংস্করণ হয় নূরজাহান খাতুনের প্রকাশনায় ১৩১৯ সালে। এই সংস্করণের মুদ্রক কে, তা জানা যায়নি। বইটির চতুর্থ সংস্করণ বিবি নূরজাহান স্বরস্বতী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে। মুদ্রক ঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা। সর্বশেষ

[৪১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫।
[৪২] মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা-২য় খন্ড, পৃ-১৯২।

পঞ্চম সংস্করণ বিবি নুরজাহান সরস্বতী ও বিবি আছিয়া খাতুন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয় **১৩৩৩** সালে। পৃষ্ঠায় সংখ্যা ৬০। মুদ্রক পাওয়া যায়নি।

সংস্করণের সংখ্যাধিক্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পর ধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, ভিন্ন মতাবলম্বী পন্ডিত-দার্শনিকের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রীস্টান তথা অন্য ধর্মের লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। মুনশী জমিরুদ্দীন তাই বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র থেকে ইসলাম ও হযরত (সা) সম্বন্ধে কতিপয় অমুসলমান পন্ডিত ও দার্শনিকের অভিমত সংকলন করেছেন। এঁদের মধ্যে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ, মহাশয়ের মন্তব্য, কুরআন ও হাদিসের বঙ্গানুবাদক ও ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারক বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পন্ডিত টমাস কর্লাইল মহাশয়ের ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য সুবিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রসেখর সেন, ব্যারিস্টার য্যাট-ল মহাশয়ের মন্তব্য, সুবিখ্যাত পন্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, ডি এস, সি, মহাশয়ের মন্তব্য, আচার্য্য কেশব চন্দ্রের (ইসলাম সম্বন্ধে) মন্তব্য, ইসলাম সম্বন্ধে পন্ডিত ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের মন্তব্য, মহেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য, ও টমাস আরণল্ড সাহেবের মন্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। এ সংকলনের কাজে শেখ জমিরুদ্দীনকে উৎসাহিত করেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এবং কতিপয় মুসলমান ধর্মবন্ধু[৪৩]।

৯. আখলাক জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজ ষষ্ঠ পুস্তিকার নাম 'আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা'। এটি জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা নয়। তাঁর রচিত 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থ অবলম্বন করে মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ কবি মোজাম্মেল হকের সহায়তায় পুস্তিকাটি রচনা করেন। মুস্তাফা নুরউল ইসলাম রচিত 'মুনশী জমিরুদ্দীন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা আছে, পয়ার ছন্দে রচিত জমিরুদ্দীনের এই জীবনী গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল[৪৪]। উক্ত পুস্তিকাটি গবেষকের হস্তগত হয়নি বিধায় বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে আবুল আহসান চৌধূরী

[৪৩] মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে ধর্ম্মাবলাম্বীদিগের মন্তব্য, কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৫, পৃঃ ৩৮-৩৯।
[৪৪] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫-১৬।

রচিত 'জমিরুদ্দীনের জীবনী গ্রন্থ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা যায়, বইটির সর্বশেষ সংস্করণ কলিকাতা থেকে ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। সেকালে ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের মানুষের বিশেষ করে মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। এমতাবস্থায় বাঁচার তাগিদে ঐ এলাকায় অধিকাংশ নিঃস্ব দরিদ্র, হিন্দু–মুসলমান খ্রীস্টানদের প্রলোভনে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়। নিদারূণ ক্ষুধা তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার শেষ পরিণতি অর্থ্যাৎ পরকালে হিসাব নিকাশের অনুভূতিকে নিঃশেষ করে দেয়। সমকালীন সময়ের অবস্থা তুলে ধরে মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ 'আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা' পুস্তিকায় কতকগুলো পংক্তি রচনা করেন।

পয়ার ছন্দে লিখেছেন মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদঃ
নদীয়া জেলায় আজি বেরাদারগণ।
যত কেরেস্থান লোগ কর দরশন।।
বাপদাদা তাহাদের আকালের বারে।
পেটের দায়েতে মজে যীশুর মন্তরে।।
দেলজান হইতে তারা যীশু না ভজিল।
আপসোসে আখের সবে পরাণ তেজিল[৪৫]।।

১০. পাদ্‌ মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের সপ্তম পুস্তিকার নাম 'পাদ মনরো সাহেবের ধোকাভঞ্জন'। কলিকাতার 'মজুমদার প্রেস' থেকে এন, বি, মজুমদারের মুদ্রণায়, শাহ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীনের প্রকাশনায় ২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকাটি ১৩৩৪ সালে (১৯২৭ খৃঃ) প্রকাশ পায়। তৎকালীন নদীয়া জেলার রানাঘাটের কুখ্যাত খ্রীস্টধর্ম প্রচারক পাদ্রী জে, মনরো রচিত 'হজরত মোহাম্মদ এর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামক গ্রন্থের যুক্তির প্রত্যুত্তরে এই পুস্তিকাটি রচনা করেন। পাদ্রী মনরো সাহেবের বক্তব্য ছিল, হযরত ঈসা ব্যতীত সমস্ত নবী ও রসূল পাপী। আর সেই হিসেবে হযরত মুহাম্মদ নিষ্পাপ নন। মুনশী জমিরুদ্দীন শাস্ত্রীয়

[৪৫] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫।

প্রমাণের দ্বারা পাদ্রী মনরোর এই বক্তব্যের অসারতা প্রদর্শন করেন এবং এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন[৪৬]।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামক গ্রন্থে পাদ্রী মনরোর আরো বক্তব্য এই যে, কোরআনে দেখা যায়-যীশু ভিন্ন হযরত মোহাম্মদ ও অন্যান্য নবী-রাসূল স্বীয় পাপ স্বীকার করেছেন এবং স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। অতএব, তিনি [মুহাম্মদ (সাঃ) নিষ্পাপ ছিলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন এর জবাব দিলেন,– সেখানেও যীশুর অপরাধ স্বীকৃতি ও ক্ষমা–ভিক্ষার কথা আছে।

রদ্দে খৃষ্টান' সিরিজের অষ্টম পুস্তক ইংরেজী ভাষায় রচিত 'Glory of Islam' এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ের পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এক্ষণে আমরা শুধুমাত্র পুস্তকটির মধ্যকার প্রবন্ধগুলোর নাম পুনরুল্লেখ করছি। প্রথম প্রবন্ধের নাম From Christianity to Islam' — ইট জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা। এ গ্রন্থটিতে আরো চারটি ইংরেজী প্রবন্ধ সংযোজিত আছে— যা জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা নয়। প্রথম 'Asiatic Quarterly Revie Y; 1888, October সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত, দ্বিতীয়টি 'Islam in Africa st. James Gazette of London; 1887, October সংখ্যা থেকে সংকলিত, তৃতীয়টি 'Dr. Leitener's Lecture on Muhammedanism' এবং চতুর্থটি হচ্ছে 'an European convert to Islam in the 15th century'.[47]

১১. মাসুম মোস্তফা (সাঃ)

'রদ্দে খৃস্টান' সিরিজের নবম পুস্তক 'মাসুম মোস্তফা (সা)' অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা। কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসরাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মুদ্রণায় এবং মুনশী আলিমুদ্দীন আহমদের প্রকাশনায় ১৩২৩ সালে (১৯১৭ খৃঃ) ৭৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। অবশ্য 'রদ্দে খৃস্টান সিরিজের'র নবম পুস্তক হিসেবে মাসুম মোস্তফা (দঃ) পাদ্রী মাওলানা জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৪৬] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।
[৪৭] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬২।

কলিকাতার ‘‘ইসলামিয়া আর্ট প্রেস’ থেকে মোহাম্মদ শাসুদ্দীনের মুদ্রণায় গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হয়।

সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত মুনশী জমিরুদ্দীনের এই প্রচার-পুস্তকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টান মিশনারী প্রাদ্রীগণ বিভিন্ন প্রচার–পুস্তিকা রচনা করে হযরত মোহাম্মদকে (সা) অত্যন্ত অসম্মানজনক ভাষায় আক্রমণ করতঃ গোনাহগার সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করেন। পাদ্রীদের এই অপপ্রচারের উত্তরে যুক্তি উপস্থাপন ও অত্যন্ত নৈপুণ্যতার সঙ্গে তথ্য সন্নিবেশ সহকারে রচিত হয় মুনশী জমিরুদ্দীনের ‘মাসুম মোস্তফা (দঃ) গ্রন্থখানিতে তিনি লিখেছেনঃ

‘‘অন্তিম নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের নিষ্পাপ থাকা থাকা প্রশ্ন লইয়া বর্তমান কালে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিষ্পাপ থাকা সম্বন্ধে কয়েক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে পাদ্রী সাহেবরা কোরআন শরীফের কয়েকটা আয়াতের অযথা ব্যাখ্যা এবং তৎসম্বন্ধে অযথা মত প্রকাশ করতঃ বর্তমান আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন’’[৪৮]।

পবিত্র কুরআন ও বাইবেল থেকে প্রাসঙ্গিক দলিল-প্রমাণাদির উদ্ধৃতি প্রদান করে লেখক তাঁর উদ্দেশ্যকে সফলতায় পৌঁছাতে প্রয়াস পান। তিনি খ্রীস্টান মিশনারী প্রাদ্রীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদে উক্তি করেছেনঃ

‘‘রাসুলুল্লাহর প্রতি এইরূপ অযথা অমূলক কলঙ্কারোপ না কিরয়া পাদ্রীগণ কার্লাইল, বসওয়ার্প, স্মিথ, ডেভেন পোর্ট প্রভৃতি স্বধর্মাবলম্বীদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে উক্ত মহাপুরুষের বিলাসনিস্পৃহতা, জিতেন্দ্রিয়তা, অকপটতা ও নির্মল স্বচ্ছ অনন্য সাধারণ চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাইত। মিথ্যা দ্বারা ধর্ম প্রচার হয় না এবং এই অবলম্বন সর্বদা গর্হিত’’[৪৯]।

পুস্তকটির উপসংহারে পাদ্রীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বাণ জানিয়ে মুন্সী জমিরউদ্দিন লিখেছেনঃ

---

[৪৮] পাদৃ মওলানা জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদন, মাসুম মোস্তফা (দঃ), কলিকাতাঃইসলামিয়া আর্ট প্রেস, ১৩৩৫ বাংলা, পৃ-১।
[৪৯] পূর্বোক্ত, পৃ-ভূমিকা হতে সংগ্রহিত।

''প্রিয় পাদ্রী মহোদয়গণ! অকারণে জগতের একমাত্র নিষ্কলঙ্ক পরিত্রাণকর্তাকে পাপী বলিয়া নিজে আর পাপ করিবেন না।। হযরতকে পাপী বলিলে আপনাদের যীশু ও পাপী হইবেন, তাহা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আশা করি, আমার লিখিত এই বিষয়টা চিন্তা সহকারে পাঠ করিবেন এবং হযরতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অসীম পূণ্যের ভাগী হইবেন, যে কেহ হযরত মোহাম্মদের (সা) উপর বিশ্বাস করিয়া ইমান আনিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবে, সে দোজখে যাইবে। দোয়া করি খোদা তা'য়ালা যাবতীয় খ্রীস্টিয়ান নর-নারীকে পবিত্র ইসলামের আশ্রয় দান করুন''[৫০]।

খ্রীস্টান পাদ্রীদের সাথে বিতর্ক বিষয় তথ্য সন্নিবেশের দিক থেকে 'মাসুম মোস্তাফা (দঃ)-র ভূমিকাংশ বিশেষ মূল্যবান। ১৩৩১ হতে ১৩৩২ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যায় পাদ্রী এল, নেভেল জোন্স এবং জমিরুদ্দীনের মধ্যে পত্র-বিরোধ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রগুলি উক্ত ভূমিকাংশে সংকলিত হয়। এতদ্ব্যতীত খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত সংগঠিত করবার কাজে সেকালে কোন কোন সাময়িক পত্র কিরূপ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তার নিদর্শন রয়েছে এই ভূমিকায়। ইসলাম ও কুরআনের বিকৃতিরূপ খ্রীস্টান মিশনারীদের অবলীলাক্রমে প্রচারনার বিরুদ্ধে মুনশী জমিরুদ্দীন মুসলিম জনতাকে ঝাপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছেন[৫১]।

১২. শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন

গ্রন্থটির প্রকাশ হাজী জয়নাল আবেদীন, নিয়ামতপুর, রাজশাহী। কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মুদ্রণায় ৯৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৩২৩ সালে প্রকাশ পায়। মুহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের মন্তব্য অনুযায়ী এটিই মুনশী জমিরুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই পুস্তক বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের (১৯৯৭), ১ম ত্রৈমাসিক খাতিয়ান, পৃঃ ৯০) মন্তব্য থেকে জানা যায়, খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরোধিতার জন্য এ ধরণের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনার জুড়ি ছিল

[৫০] পূর্বোক্ত, পৃঃ৭০-৭১।
[৫১] পূর্বোক্ত, পৃ-ভূমিকা।

না। লেখক এ বইটিতে একদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনী আলোচনা ও তাঁর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে খ্রীস্টান পাদ্রীরা কিভাবে মুসলমানদের ধোঁকায় ফেলে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতো তার রহস্য উদঘাটন করেছেন।

সেকালে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাদ্রী রেভারেন্ড জে. টেকল বিরচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুনশীর ভূল' পুস্তিকার প্রতিবাদে মুনশী জমিরুদ্দীন শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোকাভঞ্জন প্রকাশ করেন। ফুরফুরার পীর আবু বকর সাহেবের আদেশে হযরত মুহাম্মদের (সা) এই জীবনটি তিনি রচনা করেন[৫২]। লেখক এ গ্রন্থে অনেক অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অঙ্গুলিসংকেতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে-এ মোজেজায় লেখক আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, এই প্রচলিত মতকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করতেও তিনি কোশেশ করেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ

পাদ্রী [ওয়েঙ্গার] সাহেব স্যার সৈয়দ আহমদ ইমাম, ফখরুদ্দীন কিম্বা বুখারী শরীফ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে বাইবেল পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কি এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখিয়েছিলেন না পড়িয়াছিলেন[৫৩]?

[৫২] আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।
[৫৩] পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।

১৩. হযরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী

১৩১৬ সালে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। ৮ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। তখন এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৩৫। পুস্তিকাটি উপরোল্লিখিত মুদ্রণায় প্রকাশ পায়। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ গবেষকের হস্তগত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে এই পুস্তিকা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে– যা আবুল আহসান চৌধুরী সংকলন করেছেন[৫৪]।

লেখক এ পুস্তিকায় খ্রীস্টান পাদ্রী ও প্রচারকদিগের অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যেমন বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক গোপন করেছেন তদ্রূপ বার্ণবার ইঞ্জিলও গোপন করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় সর্বশেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল কিন্তু খ্রীস্টান পাদ্রীর কর্তৃক তা বিয়োগ করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই[৫৫]। প্রমাণস্বরূপ লেখক George sale (জর্জ সেল) সাহেবের অনুবাদিত কোরআন শরীফের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এতে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আগমণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী পরিস্কার ভাবে লেখা আছে। জর্জ সেল সাহেবের অনুবাদিত কোরাণ শরীফের সূরা এমরানের টীকার ৩৮ পৃষ্ঠার ফুট নোটে শেষ নবীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদই (সা) ত্রাণকর্তা। তাঁর আবির্ভাবের কথা বার্ণবার ইঞ্জিলে উক্ত হয়েছে, এই পুস্তিকায় মুনশী জমিরুদ্দীন তা প্রমাণ করেছেন। মোটকথা, মিশনারীদের প্রচারের বিরোধীতা করার জন্য বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মোহাম্মদের (সা) মহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি রচিত।

খ্রীস্টানদের ধর্মীয় পুস্তক বাইবেল–অর্থ্যাৎ তাওরাত, যাব্বুর ও ইঞ্জিল কেতাবে যতগুলি পুস্তক পূর্বকালে ছিল এখন আর তা নেই। ক্রমে ক্রমে খ্রীস্টান পাদ্রী ও প্রচারকেরা অনেকগুলো বাইবেলীয় গ্রন্থ গোপন করেছেন।

---

[৫৪] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১-৬২।

[৫৫] শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী, কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৬, পৃ-৩।

১৪. ইঞ্জিলের হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য

পুস্তিকাটির প্রকাশক লেখক নিজেই। মুদ্রক ঃ সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেস, ১৩ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা। ১২ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (সা)– এর আগমন সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে খ্রীস্টান পাদ্রী সাহেবরা অস্বীকার করার কারণে লেখক পাদ্রী ওয়েঙ্গার তাফসিরের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই ইহার সত্যতা স্বীকার করেছে। পুস্তিকাটির বিজ্ঞাপনে' লেখক এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন[৫৬]।

১৫. আসল বাইবেল কোথায়?

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত ৫ পৃষ্ঠার এ ক্ষুদ্রতম পুস্তিকাটি ১৩২৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ও মুদ্রক সম্বন্ধে জানা যায়নি। কেননা লেখকের এ পুস্তিকাটি বর্তমান গবেষকের হস্তগত হয়নি। অবশ্য 'শরিয়তে এসলাম' পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩-এ 'আসল বাইবেল কোথায়'? শিরোনামে একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া মুস্তাফা নূরউল ইসলাম রচিত 'মুনশী জমিরুদ্দীন' নামে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬ সংখ্যায় যে জীবনী লিখিত হয়েছে, সেখানে আসল বাইবেল কোথায়? পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক মূলতঃ খ্রীস্টান পাদ্রীদের উদ্দেশ্যে ১৫টি প্রশ্ন সম্বলিত এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বাইবেলের আসলত্ব বিলুপ্তির প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এটির "প্রচ্ছদ পত্র" থেকে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লেখকের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন[৫৭]।

লেখক খ্রীস্টান সমাজভুক্ত থাকাকালীন সময়ে এলাহাবাদ কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যাপকদের নিকট ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ক্লাসে অনেক

---

[৫৬] আবুল হোসেন চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৬৪-৬৫।
[৫৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮।

সময় অধ্যাপকদের সঙ্গে বর্তমান বাইবেলের আসলত্বের প্রশ্নে তর্কবিতর্ক হতো। অন্যান্য দিনের ন্যায় একদিন অধ্যাপক পাদ্রী হ্যাকেট সাহেব ক্লাসে যখন ইব্রানি ভাষায় তৌরাত কিতাব পড়াচ্ছিলেন তখন লেখক উক্ত আলোচনার উপর প্রশ্ন করলেন। কিন্তু অধ্যাপক সাহেবের উত্তরে তিনি খুশি হতে পারেননি। দায়সারা গোছের জবাবে বাইবেলের আদ্যোপান্ত পাঠে তিনি ইহার আসলত্বের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালালে সংশয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালেন। ফলে সধর্ম গ্রহণোত্তর যে সব প্রতিবাদমূলক গ্রন্থাদি ও পুস্তক-পুস্তিকাদি রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে 'আসল বাইবেল কোথায়' তার অংশ বিশেষ।

১৬. বিশুদ্ধ খতনামা

মোহাম্মদ সোলেমান কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটি কলিকাতার ' সোলেমানী প্রেস' থেকে প্রকাশকের নিজের মুদ্রাণায় প্রথম সংস্করণ বের হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯০৪ সালে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪। এটির পঞ্চম সংস্করণ ১৩১৮ (বাংলা) সালে মোহাম্মদ সোলেমান এন্ড ব্রাদার্স এর প্রকাশনায় চুণীলাল ভট্টাচার্যের মুদ্রণায়, কলিকাতার '১৪১ আপার চিৎপুর রোড' হতে প্রকাশ পায়, তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৩৬। সর্বশেষ দশম সংস্করণ মোহাম্মদ সোলেমান, আফতাবুদ্দীন আহমদ ও কমরুদ্দীন আহমদ কর্তৃক বাংলা ১৩৩৬ সালে কলিকাতার 'সোলেমানী মেশিন প্রেস' থেকে মোহাম্মদ সোলেমানের মুদ্রণায় প্রকাশ পায়। পুস্তিকাটি বর্তমান গবেষেকের হস্তগত হয়নি। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রকাশনার বরাত দিয়ে তথ্য সংকলিত হয়েছে[৫৮]।

সেকালে বঙ্গীয় মুসলমান জনসমাজের চিঠিপত্র লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে তত বেশী পারদর্শীতা ছিল না সেজন্য মুনশী জমিরুদ্দীন তাঁর সুহৃদদের অনুরোধে 'বিশুদ্ধ খতনামা' পুস্তিকা প্রকাশ করেন[৫৯]। এত তিনি মুসলমানদের ইসলামী আদর্শিক পন্থায় পত্র লেখার পদ্ধতি নির্দেশ করেন। তিনি এই পুস্তিকার 'উপদেশ' অংশে বলেন– মুসলমানদের নামের পূর্বে 'শ্রী' লিখতে হয় না। সে সময়ে এদেশের স্বল্প শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুসলমানগণ অমুসলিম সংস্কৃতিতে পরিচালিত হচ্ছিলেন। নামের

[৫৮] আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরদ্দীস, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃ-৫৭।
[৫৯] পূর্বোক্ত, পৃ-৫৬।

পূর্বে শ্রী ব্যবহার ছিল তাঁদের কৃষ্টির অনুষঙ্গ। ভাষার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় চিঠি–পত্র লেখার ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানী রীতিই লক্ষ্য করা যেত। এ পুস্তিকাটি তাই ইসলামী কৃষ্টি ও ভাবধারায় চিঠি–পত্র লিখন পন্থার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী ভাবধারায় চিঠি-পত্র লিখন–পদ্ধতির উপদেশ ব্যতীত লেখক এটিতে মুসলমানদের নামকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিমগণ স্ব স্ব পুত্র কন্যার কুৎসিত নাম রাখার ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে থাকে, তা নিঃসন্দেহে ইসলাম তথা হাদিস বিরোধী। তাছাড়া পুস্তিকাটির মধ্যে আরো অন্যান্য বিষয়ের উপদেশমালা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে কাবিন নামা, তালাক নামা, বিবাহের নিমন্ত্রণ, ধর্ম্মসভার বিজ্ঞাপন, দরখাস্ত ইত্যাদি রচনার মুসাবিদা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে মুসলমানদের জন্য এজাতীয় বইয়ের নিতান্তই অভাব ছিল। খতনামাটির আধিক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল[৬০]।

১৭. আসল বাঙ্গালা গজল

'আসল বাঙ্গালা গজল' বা ইসলামী গান সংক্রান্ত বইটির প্রকাশক লেখক নিজেই। জমিরুদ্দীনের এই উল্লেখযোগ্য বইটিতে ১৩১৫ সালে প্রকাশ পায়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯। এর মুদ্রণ সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তথ্য নির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৯ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। মন্তব্যঃ কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ৯ম সংস্করণ রক্ষিত আছে। জেনে রাখা দরকার, বইটি সম্পূর্ণ জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা নয়-মশারফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মোজাম্মেল হক ও আরো অন্যান্যের কিছু কিছু রচনা এ বই-এ সংকলিত হয়েছে। এর চতুর্দশ সংস্করণ ১৩৩৭ সালে শাহ মোহাম্মদ জামালুদ্দীন কর্তৃক কলিকাতার 'সোলেমানী ইলেক্ট্রিক মেশিন প্রেস' হতে মোহাম্মদ সোলেমানের মুদ্রণায় প্রকাশিত এই সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৩৬। লেখকের 'আসল বাঙ্গালা গজল' প্রকাশের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও বৃত্তির একটি চিত্র পাওয়া যায়–বিভিন্ন সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে[৬১]।

---

[৬০] আ.শ.ম. বাবর আলী, বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণে কয়েকজন বাঙালি সাধক, শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫।
[৬১] আবুল হোসেন চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃঃ ৬০-৬১।

১৮. কোথা চলি গেলে

৯ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রাকারের এই পুস্তিকার প্রকাশক লেখক নিজেই। মুদ্রকঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল ১৩০৮ (৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০২)। এটি একটি কবিতা পুস্তিকা। জমিরুদ্দীনের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র দু'টি কবিতার সংকলন,–প্রথম কবিতা 'সহধর্মিণী বিবি শামসুন্নেসা সাহেবার অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত', আর দ্বিতীয় কবিতা 'মাতৃহীন বালকের বিলাপ'।

১৯. শোকানল

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের নিজের প্রকাশনা 'শোকানল' অপর একটি কবিতা পুস্তিকা। কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মুদ্রণায় ১৯ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৩১৬ সালে প্রকাশ পায়।

লেখকের কয়েকজন নিকটতম আত্মীয় ইন্তেকাল করলে শোকাভিভূত হয়ে তিনি যেসব কবিতা রচনা করেন তা শোকানল পুস্তিকায় সংকলিত হয়। লেখকের নিজের প্রকাশনায় এবং কলিকাতার 'রেয়াজুল ইসলাম প্রেস' থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মুদ্রণায় বইটির তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। সংস্করণাধিক্যের কারণে অনুমান করা যায় বইটি জনমনে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। 'শোকানল' ব্যক্তিগত শোকের আন্তরিকতার মধ্যেই লুকায়িত ছিল লেখকের সাহিত্যের ভাবধারা।

২০. নামাজ পড়া-শিক্ষা

বিবি গহরজান, মনিরজান ও করমজান তিন জনের যৌথ প্রকাশনায় 'নামায পড়া-শিক্ষা' বইটি প্রকাশ পায়। কলিকাতার 'শীল প্রেস' হতে 'নরেন্দ্রকুমার শীল' এর মুদ্রণায় ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটি ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

মুসলমানদের ধর্মীয় আচরণ বিধি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে লেখক বইটি রচনা করেন। এটি কয়েকটি অধ্যায়ে নামাজ-আদায়ের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিভক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিভক্ত অধ্যায়গুলোর মধ্যে কালেমা, সুরাহ, দোয়া, মোনাজাত, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নাহ, ওজু, আজান, পাঞ্জেগানা ও অন্যান্য নামাজ, রোজা

ইত্যাদি কথা বর্ণিত হয়েছে। বইটি গবেষকের হস্তগত হয়নি বিধায় অন্যের প্রকাশনার সাহায্যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে[৬২]।

২১. আসল হুলিয়ানামা

'আসল হুলিয়ানামা' ৬ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির প্রকাশক মুনশী জামালউদ্দীন, গাঁড়াডোব, কুষ্টিয়া। এটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৮৪ সালে। এ বইটি বর্তমান গবেষক সংগ্রহ করতে পারেননি। অন্য লেখকের প্রকাশনা থেকে 'আসল হুলিয়ানামা'র তথ্য সংকলিত হয়েছে। 'প্রচ্ছদ পত্রে' পুস্তিকাটির পরিচয় দেয়া হয়েছে–এভাবেঃ

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর হুলিয়া শরীফ [।] দরূদ শরীফ, মোনাজাত, মসলা, কবর জেয়ারত, জবেহ করিবার নিয়ত, জানাজার নিয়েত ও রোজা রাখিবার নিয়ত।

উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে 'আসল হুলিয়ানামা'য় নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে শেখ জমিরুদ্দীন তৎকালীন মুসলমানগণের প্রয়োজন পূরণ করার প্রয়াস পান। তাঁর এই হুলিয়া শরীফ মুসলিম বাংলার অসংখ্য নর-নারীর এখনো কণ্ঠস্থ আছে। এতে লেখক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও চার ইয়ারের গুণগান করেছেন।

হুলিয়া শরিফটি ৫৬ লাইনে সন্নিবেশিত। এখানে কয়েকটি পংক্তি তুলে দেয়া হলোঃ

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার।
মোহাম্মদেও দীন বিনা রাহা নাহি আর।।
মোহাম্মদের চারি ইয়ার নাম তার শুন।
আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী চারিজন।।
এই চারির কম যেই উম্মতে জানিবে।
মোহাম্মদের শাফাৎ হতে দূর হয়ে যাবে।।
মোহাম্মদের হুলিয়া পড়ি কড়নব দিয়া শুন।
দেলে একিন করে পড়ে ঝড়তে ঈমান আন।।
মোহাম্মদের হুলিয়া যেবা, সোবে শাম পড়িবে।
আখেরে দোজখের আগুন তার হারাম হইবে[৬৩]।।

[৬২] আবুল হোসেন চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃঃ ৬৬।
[৬৩] মুহাম্মদ রবীউল আলম, পূর্বোক্ত, পৃঃ৫৩-৫৪।

২২. জঙ্গে কারবালা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'জঙ্গে কারবালা' বইটি মোহাম্মদ সোলেমান কর্তৃক কলিকাতার 'সোলেমানী মেশিন প্রেস' হতে মোহাম্মদ সোলেমানের মুদ্রণায় প্রকাশিত হয। ২৮ পৃষ্ঠার বইটির প্রকাশকালঃ ২ জানুয়ারী ১৯০৪। তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৪ খ্রীঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ২১ (৫৮৫)। এ বইটিও গবেষক সংগ্রহ করতে পারেননি। সে কারণে 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' থেকে তথ্য সংকলন করা হয়েছে। মূলত বইটিতে লেখক 'কারবালার যুদ্ধ-কাহিনী' সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন[৬৪]।

২৩. বগুড়া জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুষ্ঠান পত্র

বগুড়ার 'রায় প্রেস' হতে শেখ জমিরুদ্দীনের মুদ্রণায় ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি ১৯০৫ সালে জুন প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকাটি ও বর্তমান গবেষক হস্তগত করতে পারেননি বিধায় 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। লেখক এ পুস্তিকাটিতে বগুড়া জাতীয় মুসলমান সমিতির নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৬৫]

২৪. খোশগল্প, ২৫. উপদেশ ভান্ডার, ২৬. দুইশত উপদেশ

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত উপরোক্ত তিনখানা বইয়ের নাম পাওয়া গেলেও এ গুলোর কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। ডক্টর আনিসুজ্জামান রচিত 'মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন' শীর্ষক প্রবন্ধে বই তিনটি উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনিও এ তথ্যের সূত্র জানাননি।

২৭. আদম মোস্তফা

লেখকের এটি অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি–জানিয়েছেন ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী, তাঁর রচিত 'মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা'–২৩, শীর্ষক গ্রন্থে।

---

[৬৪] আলী আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১৪।
[৬৫] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৪

তিনি এ পান্ডুলিপি জমিরুদ্দীনের পুত্র মুনশী জামালুদ্দীনের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন অথচ তথ্যের সূত্র উল্লেখ করেননি।

২৮. হযরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনী

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত এ বইটি গবেষকের হস্তগত হয়নি। এ জন্য ঠিক কখন এটি প্রকাশিত হয়েছে তা বলা দুষ্কর। তবে লেখকের 'ইসলামী বক্তৃতা' শীর্ষক (৩য় সংস্করণ ঃ ১৩২২) পুস্তকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপন' অংশে এই বইটি যন্ত্রস্থ বলে তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া কুদুমনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনীতে (পৃঃ১৭২) জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ তালিকায় 'হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত' নামে এই বইটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে[৬৬]।

২৯. জওয়াবোন্নাছারা

বইটির প্রথম সংস্করণ আব্দুল জব্বার মিয়ার প্রচেষ্টায় নোয়াখালীতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ঃ ১৩০৪ সাল। আর এটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল, ১৩১৫। প্রকাশক ঃ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক ঃ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫। বইটিতে খ্রীস্টান পাদ্রীদের কিছু জটিল প্রশ্নের প্রমাণ ভিত্তিক জওয়াব দেওয়া হয়েছে। পুস্তকটি মুনশী মেহেরুল্লাহর নামে প্রকাশিত হলেও রচয়িতা হিসেবে জমিরুদ্দীনের কোন অবদান ছিল না, তা নয়। বরং এই পুস্তকের সূচনা সম্পর্কে জমিরুদ্দীন লিখেছেনঃ

''নোয়াখালির পাদ্রী সাহেবরা তথাকার মুসলমানদিগের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া প্রশ্নগুলি মুনশী [মেহেরুল্লাহ] সাহেবের নিকট পাঠাইয় দেন। মুনশী সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর

[৬৬] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৮।

লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুনশী আব্দুল জব্বার সাহেব জওয়াবোন্নাছারা নাম দিয়া পাদ্রীর প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর গুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন''[৬৭]।

এ উক্তি থেকে পরিস্কারভাবে অনুধাবন করা যায় যে, মুনশী মেহেরুল্লাহ এককভাবে জওয়াবোন্নাছারা বইটি রচনা করেননি, ইহাতে জমিরুদ্দীনেরও সহযোগিতা ছিল। সুতরাং মুনশী জমিরুদ্দীনকে এক্ষেত্রে যুগ্ম রচনাকারের মর্যাদা দেওয়া বাঞ্চনীয়। এ ব্যাপারে আরো একটি তথ্য থেকে স্পষ্ট হওয়া যায়–মুনশী জমিরুদ্দীন রচিত 'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকের (তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩২২ "মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত আমার নিকটে পাওয়া যায়" মর্মে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাতে লেখকের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে 'জওয়াবোন্নাছারা' নামক বইটির ও উল্লেখ আছে।

৩০. পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ

এ পুস্তিকাটি ও বর্তমান গবেষকের হস্তগত হয়নি। অন্যান্য রচনাবলীর সহযোগিতায় তথ্য সূত্র সংকলন করা হয়েছে। 'পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ' বইটির প্রকাশক লেখক নিজেই। মুদ্রকঃ মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, কলিকাতা। ১২ পৃষ্ঠার এ বইখানি ১২ মে ১৮৯৭ খৃঃ প্রকাশ পায়। তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। মুলত এধৎসসধৎ (ব্যাকরণ) শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রসার করার লক্ষ্যে তৎকালীন ছাত্র সমাজ যাতে ভাষা-জ্ঞানে উৎকর্ষতা হাছিল করতে পারে, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে লেখক এটি প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের মন্তব্য ঃ — Grammar for instruction in parts of speech.[68]

৩১. এরশাদে খালেকিয়া বা খোদা–প্রাপ্তি তত্ত্ব

গ্রন্থটির প্রকাশকঃ মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, শাহ আব্দুল করিম সড়ক, খড়কী, যশোর। মুদ্রণেঃ ম্যাসিভ কম্পিউটারস, ৯৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। এটির লেখক মূলত যশোরের খড়কীর পীর সাহেব হযরত মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আব্দুল করিম (?-১৩২২)। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৯৯ সালে। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন মরহুম পীর সাহেব কেবলার অন্তরঙ্গ যুদ্ধ। 'এরশাদে খালেকিয়া

---

[৬৭] শেখ জমিরুদ্দীন, মেহের চরিত, পৃ-৫২।
[৬৮] আবুল হোসেন চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃঃ ৫৩।

বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব' বইটির তৃতীয় সংস্ক প্রকাশকালে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বইটির যে যে স্থানে ভুল–ভ্রান্তি ছিল তা সংশোধন করে দেন বলে বিজ্ঞাপনে প্রকাশ। ২৯৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি তাসাওফ সম্বন্ধে একটি মৌলিক রচনা দশটির অধ্যায়ের বিন্যাস্ত গ্রন্থটির প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক তাসাওফের জটিল দার্শনিক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। পঞ্চম থেকে নবম অধ্যায়ে সুফী সাধনার নকশবন্দীয়া, কাদেরিয়া এবং চিশতিয়া তরিকার নির্ভুল তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। দশম বা শেষ অধ্যায় তিনি বেদ, পুরাণ ইত্যাদিতে প্রচলিত দার্শনিক বিষয়বস্তুর তত্ত্ব উদঘাটন করে ইসলামী সুফী মতবাদের সঙ্গে একটি তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। মোহাম্মদ আব্দুল করিম পীর সাহেব মরহুমের খোদা-প্রাপ্তি তত্ত্বের মত বাংলায় তাসাওফ সম্পর্কিত বই বিরল বলে বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন নিজে কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ বা সম্পাদনা না করলেও সেকালের মুসলিম পরিচালিত অনেক সাময়িকপত্র ও সাহিত্য সেবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বিভিন্ন ভাবে তিনি এসব পত্র-পত্রিকাকে সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অনেক পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততাও ছিল[৬৯]।

---

[৬৯] যে সব সাময়িক পত্রিকার সাথে লেখক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মুনশী জমিরুদ্দীনের গভীর যোগ ছিল সেগুলো হলোঃ
১. ইসলাম প্রচারক, ১২৯৮ বাংলা
২. ইসলাম দর্শন, ১৩২২ বাংলা
৩. রওশন হেদায়েত, ১৩৩১ বাংলা
৪. শরিয়ত, ১৩৩১ বাংলা
৫. শরিয়তে এসলাম, ১৩৩২ বাংলা
৬. সোলতান, ১৯০২ ইংরেজি
৭. লহরী, ১৩০৭ বাংলা
৮. তবলীগ, ১৩৩৪ বাংলা
৯. মোহাম্মদী, ১৯০৩ ইংরেজি
১০. বঙ্গনূর, ১৩২৬ বাংলা
১১. কোহিনূর, ১৩০৫ বাংলা
১২. বাসনা, ১৩০৫ বাংলা
১৩. খ্রীস্টীয় বান্ধব, ১৮৯২ ইংরেজি
১৪. সুধাকর, ১২৯৬ বাংলা
১৫. মিহির ও সুধাকর, ১৮৯৫ ইংরেজি
১৬. নবনূর, ১৩১০ বাংলা

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর পর্যালোচনা

ঊনিশ শতকে ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নব-জাগরণের প্রেরণা যোগাতে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এক যুগান্তকারী ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছে। সেকালে যে সকল সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক সাময়িকপত্র লেখনী ধারণ করেছিলেন মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানকালে সে সব পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই পাওয়ার যাচ্ছে না বিধায় তাঁর বহু সংখ্যক রচনা সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাময়িক পত্রে যে-সব বিষয়ে লেখনী চালনা করেছিলেন সেগুলো ছিল— ধর্ম সম্বন্ধে খ্রীস্টানদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবীমূলক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক, কবিতা, জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী, অনুবাদ ইত্যাদি। এ রচনাবলী থেকে তাঁর কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় মেলে। বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত শেখ জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর পর্যালোচনা করা হলো।

১. আসল কোরাণ কোথায় ?

শেখ জমিরুদ্দীন রচিত প্রবন্ধটি ১৮৯২ সালের জুন মাসে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' [মাসিক] পত্রিকায় ১৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। 'আসল কোরাণ কোথায়' শীর্ষক ধোঁকাপূর্ণ প্রবন্ধটি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ[৭০]। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, লেখক খ্রীস্টান মিশনারী কর্তৃক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেয়ার পর ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি,এম,এস, হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি,এম,ইস, ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকালে খ্রীস্টধর্মতত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এমনকি তিনি মিশনারী [উচ্চতর] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জি, এইচ, আর, ডিগ্রী লাভ করেন। এরপরে পরেই আমরা তাঁকে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকরূপে দেখেতে পাই। খ্রীস্টধর্মের পক্ষাবলম্বন করে জন জমিরুদ্দীন উক্ত প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মুল বক্তব্য ছিল এই যে, "হযরত মুহাম্মদের (সা) সময়ে কোরআন সংকলিত হয়নি, হযরত আবুবকর ও হযরত ওসমান (রা) সে কাজ সম্পন্ন করেন। ওসমান আবার সেকালে প্রচলিত

[৭০] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকাঃ বাংলা একডেমী, প্রথম মুদ্রণ, ২০০১, পৃ-৯৬।

কোরআন দগ্ধ করেছিলেন; অতএব কোরআন শরীফ বলে বর্তমানে যা আছে তা মূল কোরআন নয়"[৭১]। এই প্রবন্ধের উত্তরে 'সুধাকর' পত্রিকায় মুনশী মেহেরুল্লাহ 'ঈসায়ী বা খ্রস্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ (১৯ চৈত্র ১২৯৯) লিখে রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের যুক্তি খন্ডন করেন। জন জমিরুদ্দীন এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন 'সুধাকরে' (২৩ বৈশাখ, ১৩০০) একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে। এটির জবাবে আবার 'সুধাকরে' (১৭ আষাঢ়, ১৩০০) মেহেরুল্লাহ লেখেন সর্ব্বত্রই আসল কোরাণ' নামে একটি প্রবন্ধ। এর পর জমিরুদ্দীন আর তর্কে প্রবৃত্ত হননি, বরং পরে তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। জমিরুদ্দীন এখন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। অর্থ্যাৎ নিজের ভুল বুঝতে শিখে এখন শীর্ষস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. আসল কোরান কোথায়?

লেখকের এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি। মুনশী মেহেরুল্লাহ রচিত 'ঈসায়ী বা খৃস্টানী ধোঁকাভঞ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর। এটি 'সুধাকর' [সাপ্তাহিক] ২৩ বৈশাখ ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয়। 'সুধাকর' পত্রিকাটি কলকাতা থেকে বৈশাখ ১২৯৬ (১৮৮৯ খৃঃ) সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এটি দু'বছরেরও অধিককাল চালু ছিল। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা হলেন–রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম ও সামসুল হুদা এবং জমিদার সৈয়দ হাসান আলী ও নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী। পত্রিকাটির ধরন ছিল–উদার ও অসাম্প্রদায়িক। সম্পাদক–শেখ আব্দুর রহিম, পরে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ[৭২]।

৩. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কে?

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'প্রভু যীশু খ্রীস্ট কে? শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩০৬ (আগষ্ট ১৮৯৯) সালে প্রকাশিত

[৭১] আনিসুজ্জামান 'সাহিত্য পত্রিকা' পূর্বোক্ত, পৃ-৮৮।
[৭২] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ-৩৩৪।

হয়। 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকাটি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। এটি ১২৯৮ বাংলা (১৮৯১ খৃঃ) সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশ পায়।

পত্রিকাটির মূখ্য উদ্দেশ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এবং ইসলাম প্রচার; অপরদিকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম-মতবাদের বিরোধিতা। সেকালে জনসমাজে পত্রিকাটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ইহার সম্পাদক–মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ।

প্রভু যীশু খ্রীস্ট অর্থ্যাৎ হযরত ঈসা (আ) কে? সে সম্বন্ধে বিচার ও মিমাংসার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে লেখক শাস্ত্রভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করেছেন। কেননা খ্রীস্টান পাদ্রীগণ সদা-সর্বদা হযরত ঈসাকে (আ) একমাত্র নাজাৎ দেহেন্দা বা ত্রাণকর্তা বলে প্রচার এবং বহুতর হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাসের বীজ বপন করে থাকেন। যে কেউ সেই ঈসাকে (আ) খোদাতা'য়ালার অবতার এবং ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করবেন, তিনি আর কোন পূণ্যের কাজ না করলেও স্বর্গে (বেহেস্তে) যাবেন। খ্রীস্টান মিশনে টাকার অভাব নেই, তাই তারা অনেক টাকা বেতনে পাদ্রী ও প্রচারকগণকে নিযুক্ত করে দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে এই প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। পাদ্রীদের সেই সুমধুর ও কল্পিত স্বর্গের প্রলোভনে অনেক সরল বিশ্বাসী হিন্দু–মুসলমান ঈসাই দলে ভর্তি হয়েছে ও হচ্ছে। সুতরাং বাইবেল ও অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা এটির বিশেষরূপে মিমাংসা হওয়া আবশ্যক যে, প্রকৃত পক্ষে যীশু খ্রীষ্ট কে? এ ব্যাপারে ঈসাইগণ যে হযরত ঈসাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন, ভাল জিজ্ঞাসা করি, হযরত ঈসা কি কখন আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? না কদাচ নয়। বরং তাহার বিপরীত কথায় বাইবেলখানি পরিপূর্ণ। ঐ অসঙ্গত উক্তিটি কেবল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।..... হযরত ঈসা খোদাতালার তুলনায় সামান্য শিশিরবিন্দু ও ধূলিকণা অপেক্ষা ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কি না, নিরপেক্ষ পাঠকমন্ডলীই তাহার সুবিচার করিবেন। হযরত ঈসা যে মনুষ্যসন্তান মনুষ্য, ইহার কোন ঈসাই ভ্রাতাই অস্বীকার করিবার সুযোগ পাইবেন না।..... খ্রীস্টকে ঈশ্বরাসনে বসাইবার জন্য খ্রীস্টবাদীরা যে সকল অসার প্রমাণ প্রয়োগ করেন, রাম ও কৃষ্ণের জন্য ও তদভক্তগণ প্রায়ই সেই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ খাড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি যীশুখ্রীস্ট মাতৃগর্ভে জন্মিয়াও ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে রাম ও কৃষ্ণের দাবীটা ও ত

অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব হে খ্রীস্টবাদীগণ আইস, যিনি অনন্ত–স্বয়ং, ঈসা যাঁহার আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, স্বয়ংজীবী খোদাতালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর''[৭৩]।

৪. বাইবেলে বহু বিবাহ

লেখকের এ প্রবন্ধটি ও 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০৬ (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯) সালে প্রকাশিত হয়। খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, কোরান শরীফ বহু বিবাহের প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু পবিত্র ধর্ম পুস্তক অর্থ্যাৎ বাইবেল একটি মাত্র দার পরিগ্রহ করতে আদেশ দেয়। লেখক তাঁদের এই কপটতাপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল কুরআন যে যে স্থানে বহুবিবাহের কথা বলেছে, তা নিছক সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতাধীনে। অথচ বাইবেলে যে যে স্থানে বহুবিবাহের কথা লেখা আছে সেখানে কোন প্রকার নিয়ম ছাড়াই অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ উদ্ধৃতি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, বাইবেলই বহু বিবাহের প্রশ্রয় দিয়েছে[৭৪]।

৫. মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ (জুলাই-আগস্ট ১৯০৩) সালে প্রকাশিত হয়। অনেক মুসলমান একাধিক বিবাহ করে সমতা বজায় রাখতে না পারায় সমাজে স্ত্রী জাতির যে নিমর্ম বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল লেখক তার চিত্র তুলে ধরে আলোকপাত করেছেন এবং তা অপনোদনের চেষ্টা চালিয়েছেন।

সেকালে সুবিশাল বঙ্গদেশে তিন কোটি মুসলমান বসবাস করত। তন্মধ্যে দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেউ দুই, কেউ তিন বা চারটি বিবাহ করে একজনকে বিবির মর্যাদায় ও অপরজনকে বাদীর মত করে নির্যাতন দিত। ফলে অনেক সময় অত্যাচারী পাষন্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের

---

[৭৩] পূর্বোক্ত, পৃ-৯৭।
[৭৪] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৯।

লাঞ্ছনা বরদাশত করতে না পেরে কেউ বিষ পান করত, কেউ গলায় রশি নিত, কেউবা অন্য উপায়ে আত্মহত্যার মত জঘন্য পথ বেছে নিত।

লেখক এ অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, মুসলমান সমাজের জানা উচিত যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই প্রাকৃতিক গুণের সমানাধিকারী। অথচ স্ত্রী জাতির প্রতি পুরুষগণকে যে নানাবিধ অত্যাচার-অবিচার করে ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক ধর্মের বিপরীতাচরণ করছে, তাদের নিকট তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় বহু বিবাহের বিধান আছে সত্য, কি উদ্দেশ্যে তা বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা-কি সমাজের লোক অবগত আছেন?- ইসলামের প্রারম্ভিক সমময়ে মুসলমানগণের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিক বিবাহের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা) হাদিসে উৎসাহ ও পূণ্যের আশ্বাস দিয়েছেন। অর্থ্যাৎ সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে তত তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। আর তাঁরা কাফেরদেরকে পরাজিত করে একমাত্র ঐশ্বরিক ধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু বর্তমান কালের মুসলমানগণ যে বহুবিবাহ করে থাকেন তা কেবল রিপু পূজার জন্য, কেবল কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করবার জন্য। অথচ এর পরিণাম যে কত ভীষণ তা-কি তারা জানে? বর্তমানে বিবাহে কোন রাজনৈতিক উপকার নেই, যেহেতু মুসলমানগণ দিন দিন ব্যয়াধিক্যবশত দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হচ্ছে। তারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হয়ে সমাজের ঘোর পতন সাধন করছে, তাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হচ্ছে[৭৫]।

৬. পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ

লেখক তৎকালীন পারস্য দেশের দু'জন কবি- মহাকবি হাফেজ' ও 'মহাকবি শেখ সাদী' সম্বন্ধে 'ইসলাম-প্রচারক' ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৮ সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করেছেন। 'ইসলাম প্রচারক'-পত্রিকার এ সংখ্যাটি গবেষকের হস্তগত হয়নি। ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনীগ্রন্থমালা-২৩' থেকে এটির তথ্য সূত্র সংকলিত হয়েছে। মহাকপি হাফেজের বিবরণী থেকে তাঁর সমগ্র জীবনে দ্বিমুখী চরিত্রের খবর পাওয়া যায়। একটি হলো

[৭৫] ওয়াকিল আহমদ, ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃঃ৪০৫-৪০৬।

ইতিবাচক দিক-যা কল্যাণের বিষয়ে ইঙ্গিত করে, অপরটি হলো নেতিবাচক দিক-যা অকল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে[৭৬]।

মহা কবি শেখ সাদীর বিবরণী থেকে জানা যায় তাঁর জীবনের শেষবধি দ্বীন-ইসলামের স্বার্থে যেসব লেখনী ধারণ করেছিলেন তা দেশ-কাল-সমাজের অবহেলিত ও ঘুমন্ত মুসলিম জনতাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

৭. টমাস কার্লাইল ও ইসলাম

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের এ প্রবন্ধটি 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০ (মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩) সালে ১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তৎকালীন ইউরোপের সর্বপ্রধান বিদ্বান, জ্ঞানী ও দার্শনিক টমাস কার্লাইল ইসলামের গুণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম-ধর্মের সুখ্যাতি ঘোষণা করেছেন। লেখক ইসলাম সম্বন্ধে কার্লাইলের বক্তব্য গুলো এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা বর্তমান অধ্যায়ে কার্লাইলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য আলোচনা করেছি। এখানে সেগুলো পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন বিধায় শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে শেষ করা যায়। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, ইসলামীয় পত্রিকাতে অমুসলিম [কার্লাইল]-এর জীবনী কেন আলোচিত হলো? লেখক এর উত্তরে বলেছেন–নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতেও যিনি কুণ্ঠিত কিংবা অপমানবোধ করেননি তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা দোষের নয়, বরং এটি আনন্দের সংবাদ।

৮. মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ

লেখকের 'মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ' প্রবন্ধটি 'বাসনা' পত্রিকায় ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মাসিক পত্রিকা। রংপুরের কাকিনা থেকে বৈশাখ, ১৩১৫ সালে (১৯০৮ খৃঃ) প্রথম প্রকাশ পায়। প্রায় দু'বছর কাল এটি চালু ছিল। পত্রিকাটির উদ্দেশ্যে-মুসলমান সমাজের অগ্রগতি সাধন, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও মাতৃভাষা বাংলার চর্চা। সম্পাদক–শেখ ফজলুল করিম। পত্রিকার এ সংখ্যাটি গবেষকের হস্তগত হয়নি বিধায় ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'মুনশী

[৭৬] আবুল হোসেন চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, পৃঃ ১১১-১১২।

শেখ জমিরুদ্দীন জীবনী গ্রন্থমালা-২৩, থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখকের মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী[৭৭]।

৯. শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেখকের রচিত 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক জীবন কাহিনীটি 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর–ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বর্তমান অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে পুনরায় আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন।

১০. ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেব বক্তৃতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম–২য় সংখ্যা, মে–জুন ১৯০৪, সেপ্টেম্বর ১৯০৪ সালে প্রকাশ পায়। বর্তমান গবেষক উল্লেখিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে চলিত অধ্যায় আলোকপাত করেছেন। সুতরাং এটির দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নেই।

১১. বার্ণবার ইঞ্জিল

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'বার্ণবার ইঞ্জিল' নামক প্রবন্ধটি 'ইসলাম প্রচারকে'র ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। লেখকের এই প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশ পায়। পুস্তিকাটির প্রকাশ কাল বাংলা ১৩১৬ সাল। ৮ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী সংস্করণে ৩৫ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে বর্তমান অধ্যায়ের গ্রন্থ পর্যালোচনা অংশের ১৩নং গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছি। প্রবন্ধটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, খ্রীস্টান পাদ্রী কর্তৃক তা বিয়োগ করা হয়েছে[৭৮]।

১২. চট্টগ্রাম–ভ্রমণ

---

[৭৭] মুস্তফা নুরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩৭।
[৭৮] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৩।

'চট্টগ্রাম ভ্রমণ' প্রবন্ধটি ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা নং ১০৯। 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ', শিরোনামটি দেখলে মনে হয় এটি লেখকের একটি বিনোদনমূলক ভ্রমণ কাহিনী। কিন্তু তা নয়, বরং লেখকের চট্টগ্রাম ভ্রমণটি ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। আর তার হলো— তৎকালীন 'পূর্ব্বে বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি'র সভাপতি ও সম্পাদক কর্তৃক তিনি প্রচারক নিযুক্ত হয়ে ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, ঢাকা, নোয়াখালি, ফেণী, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। ঐ বছর ঢাকাতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হওয়াতে তিনি উক্ত অধিবেশনগুলোর প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম হলো প্রকৃতি লীলা ক্ষেত্র। এই স্থানের ভ্রমণ লেখককে বেশী চমৎকৃত করেছিল। তাই তিনি অন্যান্য স্থানের উল্লেখ না করে 'ইসলাম প্রচারকে'র পাঠকবর্গকে শুধুমাত্র 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ' শিরোনামটি উপহার দিয়েছেন। কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়ে সেখানাকার সর্ববৃহৎ মাদ্রাসা 'মহসেনিয়া মাদ্রাসায়' সমিতির অধিবেশনের কাজ সমাপ্ত করেন। এরপর কয়েকদিন অবস্থান করে লেখক চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন মসজিদে যান এবং নামাজ আদায় করেন। তিনি সেখানকার অনেক মরহুম পীর-মাশায়েখের মাজার শরীফ জিয়ারত করেন।

চট্টগ্রামের অপর নাম ইসলামাবাদ। লেখক বলেন, বাস্তবিকই এটা মুসলমান প্রধানস্থান। এস্থানে জাতীয় বিদ্যার যেরূপ চর্চা আছে, বঙ্গের অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় নাম ও জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ দেখে শুনে লেখক বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। পরিশেষে তিনি চট্টগ্রামবাসী মুসলমানদের জাতীয় জীবনে উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহর সমীপে বিশেষ দোয়া করেন। তারপর তিনি সীতাকুন্ডের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। সীতাকুন্ড হলো মূলতঃ হিন্দুদিগের একটি তীর্থ স্থান। আর এটি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত। এই সীতাকুন্ড, হিন্দু তীর্থে ও হিন্দু অধ্যুশিত এলাকায় নিবেদিত প্রাণ মৌলবী মোহাম্মদ ওবেদুল হক সাহেব একটি উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসা ও মাইনর স্কুল নিয়মিত ভাবে চালিয়ে ইসলামের গৌরব ঘোষণা করেছেন।

লেখক তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন– আপনি মরুভূমির মধ্যে পানির উৎস জারি করেছেন। এখানে লেখক কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর ফেণী অভিমুখে যাত্রা করেন[৭৯]।

১৩. পশ্চিম ভ্রমণ

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'পশ্চিম ভ্রমণ' প্রবন্ধটি 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩১৫ (বাংলা) সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা নং ৩৩৭। পশ্চিম ভ্রমণ' ছিল লেখকের জীবনে দীর্ঘ ভ্রমণ এবং সবচেয়ে আনন্দদায়ক। কেননা উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলসহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলই ছিল তৎকালীন সময়ে মুসলিম স্থপতিদের রেখে যাওয়া কীর্তি। তাঁদের এই স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ লেখকের জন্য অনেক শিক্ষা–দীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাঁর এ ভ্রমণটির ও মূখ্য উদ্দেশ্যে, সমিতির প্রচারক হিসেবে করাচী নগরে অনুষ্ঠিত 'সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা–সমিতি'তে যোগদান করা। তাই তিনি ১৩১৫ সালের ৭ই পৌষ খান বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে সংগে নিয়ে হাওড়া স্টেশন হতে বোম্বাই মেলের দ্বারা করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১১ই পৌষ প্রাতঃ ৬টার সময়ে হায়দারাবাদ নগরে পৌঁছানোর পূর্বে পথিমধ্যে কয়েক স্থানে তাঁদের যাত্রা বিরতি ঘটে। তদস্থলে তিনি যা কিছু দর্শন করেছেন তন্মধ্যে আগ্রার 'তাজমহল', আকবর 'শাহী কেল্লা', দিল্লী সুবিখ্যাত 'প্রাসাদ' পৃথিরাজের 'রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। হায়দারাবাদ থেকে আরব সাগরের একটু নিকটবর্তী সুপ্রসিদ্ধ করাচী নগরে পৌঁছালেন ঠিক বেলা ১১ টার সময়[৮০]।

করাচীর শিক্ষা–সমিতির অধিবেশনে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, বর্মা, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভারতের প্রায় সব প্রদেশ থেকে ডেলিগেট ও সদস্যগণ যোগদান করেন। শামসুল উলামা মাওলানা খাজা আলতাপ হোসেন হালি পানিপত্তি সাহেব এ অধিবেশনের

[৭৯] ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩১৪ বাংলা, পৃ-১২২।
[৮০] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩৯।

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। দু'দিন যাবৎ অধিবেশনের সভাপতির কাজ চলে। তারপর তিনি করাচী ভ্রমণে বের হন। লেখকের বর্ণনা মতে–করাচী নগর দেখলে মনে প্রাণে জীবনের সঞ্চার হয় বঙ্গীয় মুসলমানের মত। সেখানকার কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই পাজামা–পাঞ্জাবী ও বড় বড় পাগড়ী পরিধান করে থাকেন। ১৩ই পৌষ রবিবার সাহারাণপুর নিবাসী হাজী মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ সাহেবের সঙ্গে আরব সাগর দেখতে গেলেন লেখক। সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তিনি জানতে পারলেন এখান থেকে মাত্র ৮ দিনে এডেনে (আদন) ও ৬দিনে বাগদাদ শরীফে যাওয়া যায়। লেখক তাঁর মনের অনুভূতি প্রকাশ করে যে উক্তি করেছিলেন তা এরূপ ঃ "হায়! যদি পাখি হইতাম, তবে উড়িয়া যাইয়া হযরত রেসালৎ পাকের রওজা মোবারক জেয়ারত করিয়া আসিতাম।" সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটলো লেখনীর মাধ্যমে[৮১]।

১৬ই পৌষ লেখক লাহোরের উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করলেন লাহোর মেল ট্রেন যোগে। পথিমধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক ষ্টেশন অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে কতকগুলো প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন এবং অনেক অলি–আউলিয়ার মাজার জেয়ারত করেন। ১৮-ই পৌষ শুক্রবার জনাব খান বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মৌলবী আব্দুল হক, মৌলবী আব্দুল হামিদ ও মৌলবী সৈয়দ ওসমান আলী সাহেব লেখকের সঙ্গে সকলেই অমৃতসরে গমন করেন। ২০ শে পৌষ অমৃতসর ভ্রমণ সমাপ্ত করে ২১ শে পৌষ তাঁরা ইটাওয়া, কানপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, চুনার, বস্কার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে রাত হয়ে গেলে তারা, দানাপুর, বাকীপুর, পাটনা, বৈদ্যনাথ, মধুপুর হয়ে আসানসোলে রেলষ্টেশনে পৌঁছেন। সেখানে রাত প্রভাত হলে এবং ২২ শে পৌষ মঙ্গলবার বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া হয়ে কলকাতা 'ইসলাম প্রচারক' অফিসে উপস্থিত হন। আল্লাহ পাকের ফজল করমে নিরাপদে পশ্চিম ভ্রমণ সমাপনান্তে লেখক ২৬ শে পৌষ রাতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি স্বচক্ষে সবকিছু দেখে এবং নিজ কানে শুনে এ ভ্রমণ থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন[৮২]।

---

[৮১] পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪০।
[৮২] পূর্বোক্ত, পৃঃ৩৪৩-৩৪৪।

১৪. হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ইসলাম–প্রচারক' পত্রিকায় তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই শিরোনামের ঐ সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে ৭ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, ৭ম সংখ্যা এবং ১১শ সংখ্যা, জুলাই ১৯০৫, নভেম্বর ১৯০৫ এবং মার্চ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টপাধ্যায় যে যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন লেখক সে ভাষণটি লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্রীস্টান পাদ্রীরা মোহাম্মদ (সা) কে অযৌক্তিক, উদ্ভট ও বানোয়াট কথা দিয়ে আক্রমণাত্মক আচরণ প্রদর্শন করেছেন। এসব আক্রমণের জবাব যেমন মুসলিম মনীষীরা দিয়েছেন তেমনি অমুসলিম মনীষী ও এর প্রতিকারে নিরপেক্ষ অবদান রেখেছেন। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সে দায়িত্ব পালন করেই শুধু ক্ষান্ত হননি তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে ইসলামের প্রতি নিবেদন করেন।

সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মৌলবী আজিজুদ্দীন আহমদ যখন এডিনবরাতে থাকতেন, তখন মাঝে মাঝে তিনি সেখানকার যাদুঘর দেখতে যেতেন। তিনি বলেন, এই যাদুঘরে পাশাপাশি দু'টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। তন্মেধ্যে একটি হযরত ঈসা (আ) এর মূর্তি, যেন হযরত ঈসা (আ)-যে সকল ছোট ছোট বালক তাঁর নিকটে যাচ্ছে–তিনি তাদেরকে আশির্বাদ করছেন। অন্যটি অর্ধ্য মূর্তি-আর সেটি হলো হযরত মুহাম্মদের (সা)। তিনি বলেন এর আকৃতি এমনই বিকৃত, এমনই ভয়ানক, এরূপ কদাকার, ভয়াবহ প্রতিহিংসা পরায়ন যে, তা বর্ণাতীত। অর্থ্যাৎ খ্রীস্টানেরা হযরত ঈসা (আ) কে ও হযরত মোহাম্মদ (সা) কে যেভাবে দেখে, কল্পনা করে ও বিশ্বাস করে মূর্তি দু'টিতে তাই-ই প্রকাশ পেয়েছে। মোটকথা, খ্রীস্টান কর্তৃক হযরত মোহাম্মদ (সা) যেভাবে ঘৃণিত হন, জগতে আর কোন পয়গম্বর এরূপ হন না। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা শত শত বই পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এ ধরণের একটি ঘৃণিত পুস্তক রেনান সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত 'এটুডসডি হিসটোরী রিলিজিয়াস'। তাতে লেখা আছে–[মোহাম্মদ] সে একজন লম্পট, উটচোর, প্রধান

ধর্ম-যাজকের উচ্চ আশায় সফলতা লাভ না করায়, তার সহভ্রাতৃদিগের উপর প্রতিহিংসা সাধন উদ্দেশ্যে নিজেই এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকদের মধ্যে যে সব খ্রীস্টান পন্ডিত আছেন, তাঁরা ও ইসলামের পয়গম্বরের প্রতি এরূপ প্রবল পক্ষপাতিত্য করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে লুফার, যিনি সম্ভবতঃ সর্ব বিষয়ে চিন্তা ও স্বভাবে হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় ছিলেন তিনি ও মোহাম্মদ (সা) কে ১০ ম পোপ লিও অপেক্ষা খারাপ মনে করতেন। তাঁরা হযরতকে (সা) কে পাপী এবং দানিয়েলের পুস্তক 'ছোট সিংহ' জ্ঞান করেন। এসব কুৎসিৎ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন–হযরত মোহাম্মদ (সা) ইসলামের ভবিষ্যদ্বক্তা' বা নবী। এছাড়া তিনি অনেক মনীষীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মদ (সা) কে সত্য নবী হিসাবে প্রমাণ করেছেন[৮৩]।

১৫. হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য

লেখকের এ প্রবন্ধটি 'ইসলাম–প্রচারক' পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সংখ্যাগুলো ঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা ১০ম সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা এবং ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। মাস ও সালগুলো যথাক্রমে ঃ নভে ঃ ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫, ফেব্রুয়ারি ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫। ৮ম বর্ষের ৮ম সংখ্যার মাস ও সাল পাওয়া যায়নি। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে হযরত (সা) এর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী বাইবেলে রয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংখ্যায় উল্লেখ করে প্রমাণ দেখিয়েছেন। অবশ্য খ্রীস্টান পাদ্রীরা সেগুলো বিয়োগ করার মাধ্যমে মোহাম্মদ (সা) এর আগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন।

১৬. আর্য্য–ভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'আর্য্য–ভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা'–নামক প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এটি 'শরিয়তে–এসলাম' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকটি পর্বে সমাপ্ত হয়েছে। সংখ্যাগুলো–২য় বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৭ম সংখ্যা ও ৮ম সখ্যা। মাস ও সাল গুলো যথাক্রমে–বৈশাখ ১৩৩৪,

[৮৩] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

আষাঢ় ১৩৩৪ ও ভাদ্র ১৩৩৪। পৃষ্ঠা নং যথাক্রমে– ৯০-৯১, ১২৪-১২৫, ১৬৭-১৬৮ এবং ১৯১-১৯২।'শরিয়তে–এসলাম' পত্রিকাটি ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। এটি ১৯২৬ সালে কলকাতা থেকে (বাংলা ১৩৩২) প্রথম প্রকাশ পায়। পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্যে কোরআন–হাদিসের নির্দেশানুযায়ী মুসলমান সমাজকে পরিচালনা করা। সম্পাদক–হাজী মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক আর্য ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং অসারতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অবৈদিক আর্যভাষী অসুর-উপাসক আলপীয়দের ধ্যান-ধারণা কেমন ছিল সে ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে এরা নর্ডিকদের যাগযজ্ঞ ও আচার–অনুষ্ঠানকে সুনজরে দেখত না। এরা মৃত দেহ পুড়িয়ে ভস্মাবশেষ কবর দিত। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে বাংলায় জৈন, আজীবিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। বৈদিক আর্যভাষী দেব-উপাসক নর্ডিকদের বৈদিক ও পৌররানিক ধর্মের প্রবাহ বাংলায় আসতে থাকে 'গুপ্ত' যুগ থেকে[৮৪]। জেনে রাখা দরকার, 'পান্ডু রাজার ঢিবি' তে যে চৌদ্দটি নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে সেগুলো দীর্ঘশিরস্ক। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা নরগোষ্ঠী আদি অস্ত্রালরা, নয় ভূমধ্যরা। কারণ বৈদিক আর্যভাষীরা তখন আসেনি। আর আলপীয়রা এসে থাকলে ও তারা এ সভ্যতার স্রষ্টা নয়। তারা বিস্তৃতশিরস্ক। অর্থ্যাৎ বাঙালি জাতি মূলত অনার্য বংশোদ্ভুত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্য কথার অর্থ হলো বিদেশী[৮৫]।

এটাই স্বাভাবিক যে, কোন ধর্ম বা মতাদর্শের বিরোধীতা করতে হলে সেই দর্শন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা খুবই জরুরী। লেখক এ বাস্তব বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে আর্য-ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য 'বেদের' উপরে পড়াশুনা করেছেন এবং বাংলার আলেম সমাজকে বিশেষ করে ইসলাম প্রচারকদিগের প্রতি 'বেদ' পাঠ করতে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের যথাযথ প্রতিবাদ করা সম্ভবপর হবে।

[৮৪] ডঃ নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, পৃ-২১।
[৮৫] পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩।

১৭. খ্রীস্টিয় সমাজে আট বৎসর

শেখ জমিরুদ্দীন দীর্ঘ আট বছরকাল খ্রীস্টান সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 'খ্রীস্টীয় সমাজে আট বৎসরে' প্রবন্ধটি জমিরুদ্দীনের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি 'শরিয়ত' পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকটি পর্বে লিখিত হয়েছে। সংখ্যাগুলো ২য় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। মাস ও সালগুলো যথাক্রমে-আষাঢ় ১৩৩২, ভাদ্র ১৩৩২, আশ্বিন ১৩৩২। 'শরিয়ত' পত্রিকাটি ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় হানাফী সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্ররূপে বৈশাখ ১৩৩১ মোতাবেক ১৯২৪ খৃঃ শরিয়ত অফিস–৫নং কলিন লেন, কলকাতা থেকে এটি প্রকাশ পায়। সম্পাদক-হাজী মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী[৮৬]।

১৮. খ্রীস্টান সমাজে আট বৎসর

লেখকের এ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমরা ১৭নং প্রবন্ধের পর্যালোচনায় উল্লেখ করছি। একই প্রবন্ধ দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি 'শরিয়তে এসলাম' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকটি পর্বে প্রকাশ পেয়েছে। সংখ্যাগুলো– ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা, ৩য় সংখ্যা, ৮ম সংখ্যা। ২য় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, ৬ ষষ্ঠ সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা। মাস সালগুলো যথাক্রমে– ফাল্গুন ১৩৩২, চৈত্র ১৩৩২, ভাদ্র ১৩৩৩, চৈত্র ১৩৩৩, আষাঢ় ১৩৩৪, আশ্বিন ১৩৩৪। মূখ্যত লেখক এ প্রবন্ধের বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁর খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ পূর্ব এবং উক্ত ধর্ম গ্রহণোত্তর ও ইসলামে পুনঃ প্রত্যাবর্তন বৃত্তান্ত খুবই সুন্দর–সাবলীল ভাষায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

১৯. তামাকের অপকারিতা

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'তামাকের অপকারিতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'শরিয়ত' পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক তার প্রচার জীবনে চতুর্মুখী দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে যেমন অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তদ্রূপ সামাজিক ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালনে

[৮৬] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০।

ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তিনি তামাক সেবনের অপকারিতার দিকগুলো তুলে ধরে তা থেকে বিরত থাকতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন— যা আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাপক আলোচনা করেছি।

২০. ইসলামে ভীষণ আঘাত

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন আসলেই একজন সংগ্রামী কণ্ঠস্বর। যখনই ইসলামের গায়ে আঘাত লেগেছে, তখনই তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার কণ্ঠ। ঠিক এমনই ভূমিকার কথা জানতে পারি যখন আমরা তাঁর রচিত 'ইসলামে ভীষণ আঘাত, নামক প্রবন্ধটি পাঠ করি। এটি 'শরিয়ত' পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩২ সালে প্রকাশ পায়। বিরুদ্ধবাদী খ্রীস্টান মিশনারীরা ইসলাম ও মোহাম্মদ (সা) কে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। রচনা কৌশল তাঁদের আক্রমণ কৌশলের একটা অংশ। 'ইসলামে ভীষণ আঘাত' ও প্রবন্ধটিতে লেখক পাদ্রী ফান্ডার রচিত এবং পাদ্রী টিসডল কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত মিজান-উল-হক' নামক যে বইটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেটি কলিকাতার ২নং মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ব্যানার্জ্জী প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং কলিকাতার খ্রীস্টান লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক ২৩ নং চৌরঙ্গী রোড হতে প্রকাশিত। ৪৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি পাদ্রী এ,সি,ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত নতুন সংস্করণ। 'মিজান-উল-হক' বা 'সত্যের নিক্তি' আরবী নামের এ বইটি প্রকাশ করে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন। শুধুমাত্র এই বইটি প্রকাশ নয়, এভাবে শত শত হাজার হাজার বিভ্রান্তিমূলক বই রচনা করে ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে 'মিজান-ইল-হক' গ্রন্থখানিতে তাঁরা খ্রীস্টান ধর্মে তালি তুলি দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করতে, হযরত মোহাম্মদ (সা) কে অযথা দোষারোপ, অন্যায় কুৎসা রচনা ও অযথা গালি-গালাজ করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা) ও ইসলাম সম্বন্ধে তাঁরা এমন আপত্তিকর উক্তি করেছেন যে, লেখক আফসোস করে বলেছেন— 'মিজান-উল-হক' এর সেই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আমি

'শরিয়তে'র [পত্রিকা] পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করতে চাই না। তিনি এই ধোঁকাপূর্ণ বইয়ের ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন[৮৭]।

২১. খৃস্টানী সংবাদ

সার্বক্ষণিকভাবে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান বিরোধী তৎপরতায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। ইসলাম-কুরআন-হাদিস-মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন আঘাত আসলে তিনি তার প্রতিঘাত করেছেন। ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে ক্ষতি সাধনের জন্য খ্রীস্টানদের প্রধান মিডিয়া তাদের 'প্রচারাভিযান' ও 'অর্থ–ব্যয়'। সম্প্রতি লেখক ও মিডিয়া–সংক্রান্ত তথ্য কালেকশন করেছেন–যা তাঁর রচিত 'খৃস্টানী সংবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের এ প্রবন্ধটি 'শরিয়ত' পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। খ্রীস্টানদের প্রকাশিত পুস্তক–পুস্তিকায় প্রচার যাতে অবিলম্বে বন্ধ করা যায় সেজন্য জমিরুদ্দীন নিরলস চেষ্টা-সাধনা চালিয়েছেন।

২২. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। [সিরাজগঞ্জী]

লেখকের এটি 'ইসলাম দর্শন পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়–শ্রাবণ ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হয়। স্মর্তব্য যে, 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকাটি জাতীয় মাসিক পত্রিকা। এটি আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা'র মুখপত্ররূপে কলকাতা থেকে ১৩২৭ সালে (১৯২০ খৃ:) প্রথম প্রকাশ পায়। প্রধানত 'ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক' এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী আন্দোলন সমূহের চরম প্রতিবাদী[৮৮]। লেখক এ প্রবন্ধে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ [সিরাজগঞ্জী] সাহেবের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন[৮৯]।

২৩. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ [ছাতিয়ানতলা-যশোর] সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের এ রচনাটি 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি তবে সম্ভবতঃ ১৩১৪ সালে

---

[৮৭] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১।
[৮৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম. সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ-৩৪০।
[৮৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭-৯৯।

প্রকাশিত হয়েছে। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুমের জীবনী' আমরা ইতিপূর্বে বর্তমান অধ্যায়ে গ্রন্থ পর্যালোচনা অংশে ৩নং গ্রন্থে আলোচনা করেছি। লেখক নিজেই সেই জীবনী গ্রন্থ 'মেহের চরিত' রচনা করেছেন। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বৃহৎ 'জীবনী গ্রন্থ'।

২৪. স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত

ইসলাম বিদ্বেষী লেখক স্বামী সদানন্দ রচিত "সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা" শীর্ষক একখানি আপত্তিকর পুস্তক প্রকাশ করে ইসলাম তথা মুহাম্মদ (সা) কে ভীষণ আঘাত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী এই হিন্দু লেখকটি হযরত (সা)–এর প্রতি অতি কদর্য ভাষায় অযথা মিথ্যা কুৎসা করে এত বেশী সীমাতিক্রম করেছেন যে, মুজাদ্দেদে জামানের বিজ্ঞান তা দেখে খ্রীস্টান পাদ্রীরা ও লজ্জায় মস্তক অবনত করতে বাধ্য। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন এটির প্রতিবাদ জানিয়ে 'স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত' নামে প্রবন্ধটি 'রওশন হেদায়েত' পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩২ সালে প্রকাশ করেন। লেখক এজন্য সকল মুসলমানকে একত্রিত হয়ে তৎকালীন সরকার প্রধানের নিকট এ বই যাতে বাজেয়াপ্ত হয় এবং গ্রন্থকারের কঠিন শাস্তি হয় তার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন।

২৫. মোসলেম-হৃদয়ে দারুন শেল। স্বামী সদানন্দের শয়তানী

লেখকের এ প্রবন্ধটি [মাসিক] 'শরিয়তে এসলাম' পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। আর্য পরিব্রাজক সন্নাসী স্বামী সদানন্দ রচিত 'সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা' নামক পুস্তকে 'হযরত রসূলে পাক (সা)' কে অযথা ও জলন্ত মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ কথা লিখে পবিত্র ইসলামে দারুন শেল বিদ্ধ করেন। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন এর তীব্র প্রতিবাদ করে 'শরিয়তে এসলাম' পত্রিকায় "মোসলেম হৃদয়ে দারূণ শেল। স্বামী সদানন্দের শয়তানী" নামে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। তাঁর এ প্রবন্ধটিতে মুসলমান সমাজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তৎকালীন সরকারের হস্তক্ষেপ অনুরোধ জানান।

আমরা ইতোপূর্বে ২৪ নং প্রবন্ধে পর্যালোচনায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সর্বোপরি জমিরুদ্দীনের এই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিচারে ঐ পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেন এবং সদানন্দের ছ'মাস কারাবাসে পাঠিয়ে দেন[৯০]।

২৬. খৃষ্ট-ধর্ম্ম-রহস্য

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত এ প্রবন্ধটি [মাসিক] 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭ সালে প্রকাশিত হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটির আফগান পাদ্রী টি.পি. হুগস, বি.ডি. সাহেবের কৃত মোহাম্মডান ইজম (Muhammadanism) অবলম্বন করে কলকাতার সি.এম.এস ডিভিনিটি কলেজের অধ্যাপক পাদ্রী যাকব কান্তিনাথ বিশ্বাস কৃত ১৮৯৩ সালে 'ইসলাম দর্শন' নাম দিয়ে প্রকান্ড একখানি গ্রন্থ লিখেছেন। এ গ্রন্থ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা করে পাদ্রীজি প্রচুর বিষোদাগার করেছেন। মূখ্যত জগতের খ্রীস্টানেরা ইসলামের যতখানি ক্ষতি করেছে এরূপ ক্ষতি আর কেউ করেনি। ঐ গ্রন্থের বক্তব্য [ইসলাম দর্শন] খন্ডন ও খ্রীস্টান ধর্মের যাবতীয় বিষয়ের রহস্য উদঘাটন করে বিশ্ববাসীকে দেখাতে চান যে, খ্রীস্টান ধর্ম অসার, অস্বাভাবিক ও ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে ইসলাম ব্যতীত মানবতার মুক্তিও নাজাতের বিকল্প কোনই পথ নেই। কোন ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম সেই ধর্মের মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। সে লক্ষ্যে 'খৃস্ট ধর্ম্ম-রহস্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রথমে খ্রীস্টান ধর্মের মূলভিত্তি বাইবেলের সমালোচনা করেছেন[৯১]। খ্রীস্টানী বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম দু'ভাগে বিভক্ত। পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর ৩৯ খানা কেতাব, আর নতুন নিয়ম (New Testament)-এর ২৭ খানা কেতাব আছে। পরবর্তী ২৭নং প্রবন্ধটির পর্যালোচনা আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

২৭. বাইবেল-তত্ত্ব

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'বাইবেল-তত্ত্ব' প্রবন্ধটি 'তবলীগ' পত্রিকায় তিনটি সংখ্যায়, তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। পর্যায়ক্রমে সংখ্যাগুলো–১ম বর্ষ ঃ ৭ম

---

[৯০] শরিয়তে এসলাম, শ্রাবণ ১৩৩৩ বাংলা, পৃ-২৩৭।
[৯১] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯৮-৪৯৯।

সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা ও ১০ম সংখ্যা। মাস ও সালগুলো যথাক্রমে– অগ্রাহয়ণ ১৩৩৪, মাঘ ১৩৩৪ ও ফাল্গুন ১৩৩৪। পৃষ্ঠান নং ১৬৬-১৬৭, ২১৪, ২২৩-২২৪। 'তবলীগ' এটি ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ১৩৩৪ (মে ১৯২৭) সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এটির মূলত 'শুদ্ধি ওয়ালাদের ইসলাম-বিরোধী অভিযান' প্রতিরোধ করাই উদ্দেশ্যে। সম্পাদক— শেখ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও চৌধুরী মোহাম্মদ শামুসুর রহমান[৯২]।

সমগ্র খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থের নাম 'বাইবেল'। ইহা গ্রীক (ইউনানী) ভাষার শব্দ, অর্থ-গ্রন্থাবলী। মূল শব্দ 'বিব্লিয়া'। ইংরেজী লাইব্রেরী শব্দের (গ্রন্থগার) যে অর্থ, গ্রীক বিব্লিয়া' শব্দের ও সেই অর্থ। খ্রীস্টানী মতে— বাইবেল হলো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের লাইব্রেরী। অর্থ্যাৎ যে সকল সংগৃহীত গ্রন্থে উক্ত প্রত্যাদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হয়েছে তাই-ই বাইবেল। এটাই লেখকের বাইবেল তত্ত্বের বিশ্লেষণ। এ প্রবন্ধে মুনশী জমিরুদ্দীন আরো উল্লেখ করেছেন— আলেকাজান্দ্রিয়ার ইহুদীগণ পুরাতন নিয়মের সংগৃহীত গ্রন্থাবলীকে এই নাম (বাইবেল) সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন। বাইবেলের দু'টি ভাগের প্রথমটি পুরাতন নিয়ম— পুরাতন নিয়ম ইব্রানী [হিব্রু] ও আসরীয় ভাষায় লিখিত হয়। ইহুদীরা পুরাতন নিয়মকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমতঃ 'তাওরাত' (ব্যবস্থাগ্রন্থ শরিয়ত), এর অধিকাংশই মসলা-মাসায়েল সম্বলিত। তাছাড়া ইহুদী জাতির ইতিহাসও এতে লিখিত আছে। দ্বিতীয়তঃ 'নবীইম' (নবীদিগের কেতাব)। তৃতীয়তঃ জবুর 'হেজিয়গ্রাফা (গজল)। দ্বিতীয়ভাগ নতুন নিয়ম— কথিত আছে যে, নুতন নিয়মে যতগুলো গ্রন্থ আছে, তা প্রেরিতদিগের দ্বারা লিখিত। সুসমাচার ৬৪ হতে ৬৭ সালের মধ্যে তাঁদের কর্তৃক ইহুদীদের জন্য লিখিত হয়েছে। (পূর্বোক্ত-২২৪)।আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)–এর ৩৯ খানা কেতাব এবং নতুন নিয়ম (New Testament)–এর ২৭ খানা কেতাব।

[৯২] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ-৩৪৬।

বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	উর্দু নাম
১. আদিপুস্তক	1. Genesis	১. পয়দায়েশ
২. যাত্রা পুস্তক	2. Exodus	২. খরূজ
৩. লেবীয় পুস্তক	3. Leviticus	৩. আহবাব
৪. গণনা পুস্তক	4. Nurmbers	৪. গিনতী
৫. ২য় বিবরণ পুস্তক	5. Deuteronomy	৫. ইসতিসনা
৬. যিহোশূয়	6. Johua	৬. ইশুয়া
৭. বিচার কর্তৃগণ	7. Judges	৭. কাজীয়োঁ
৮. রূতের বিবরণ	8. Ruth	৮. রূংকা বয়ান
৯. ১ম শামূয়েল	9. 1 Samuel	৯. ১লা শামূয়েল
১০. ২য় শামূয়েল	10. 2 Samuel	১০. ২য় শামূয়েল
১১. ২য় রাজাবলীম	11. 1 Kings	১১. ১লা সালতীন
১২. ২য় রাজাবলী	12. 2 Kings	১২. ২য় সালতীন
১৩. ১ম বংশাবলী	13. 1 Chronicles	১৩. ১লা তাওয়ারীখ
১৪. ২য় বংশাবলী	14. 2 Chronicles	১৪. ২য় তাওয়ারীখ
১৫. ইষ্রা	15. Ezra	১৫. এজরা
১৬. নহিমিয়া	16. Nohemiah	১৬. নহিমিয়া
১৭. ইষ্টেব	17. Esther	১৭. আছতর
১৮. ইয়োব	18. Job	১৮. আইউব
১৯. গীত সংহিতা	19. Psalms	১৯. জবুর
২০. হিতোপদেশ	20. Proverbs	২০. আমছাল
২১. উপদেশ	21. Eeelesiastes	২১. ওয়াজ
২২. পরমগী	22. Song of solomon	২২. গজলুল
২৩. যিশাইরা	23. Isaiah	২৩. ইশাইরা
২৪. যিরমির	24. Jeremiah	২৪. ইরমির

২৫. বিলাপ	25. Lamentatians	২৫. নওহা
২৬. যিহিস্কেল	26. Ezekiel	২৬. ইজিকেল
২৭. দানিয়েল	27. Eaniel	২৭. দানিয়েল
২৮. হোশেয়	28. Hosea	২৮. হুশিয়া
২৯. যোয়েল	29. Joel	২৯. ইউয়েল
৩০. আমেধাব	30. Amos	৩০. ওমুদ
৩১. ও বজীয়	31. Obadia	৩১. ও বেজীয়া
৩২. যোনাহ্	32. Jonah	৩২. ইউনাহ
৩৩. মীখা	33. Micha	৩৩. মীকাহ
৩৪. নহুম	34. Nahum	৩৪. নহম
৩৫. হবক্কুক	35. Habakkuk	৩৫. হবকুক
৩৬. যকনিয়	36. Zephania	৩৬.শাকনয়াহ

২৮. বাইবেলের পরিবর্তন

লেখকের এই প্রবন্ধটি [মাসিক] ‘শরিয়তে’-এসলাম’ পত্রিকায় ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা নং ১১৩-১১৪। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন এ প্রবন্ধটিতে মূল বাইবেলের তুলনায় প্রচলিত বাইবেলের পরিবর্তনের দ্বারা কতখানি

৩৭. হগয়	37. Haggai	৩৭. হজজী
৩৮. যখরীয়	38. Zochariah	৩৮. জাকারিয়া
৩৯. মালাকী	39. Malachi	৩৯. মালাকী

১. মথি	1. Mathew	১. মথি কি ইঞ্জিল
২. মার্ক	2. Mark	২. মাকুর্স কি ইঞ্জিল
৩. লুক	3. Luke	৩. লুক কি ইঞ্জিল
৪. যোহন	4. John	৪. ইউহান্না কি ইঞ্জিল

৫. প্রেরিত	5. The Acis	৫. রসুলো কি আতা
৬. রোমীয়	6. Epistle	৬. খত রোমীয়
৭. ১ম করন্থীয়	7. 1 Corintyians	৭. পৌলুসকা
৮. ২য় করন্থীয়	8. 2 Corintyians	৮. পৌলুসকা
৯. গালাতীয়	9. Galathians	৯. পৌলুসকা
১০. ইস্কিষিয়	10. Ephesians	১০. পৌলুসকা
১১. ফিলিপীয়	11. Philippins	১১. পৌলুসকা
১২. কলসীয়	12. Coloasian	১২. পৌলুসকা
১৩. ১ম থিষলনীকিয়	13. 1 Thessaloniass	১৩. পৌলুসকা
১৪. ২য় থিষলনীকিয়	14. 2 Thessaloniass	১৪. পৌলুসকা
১৫. ১ম তিমথীয়ম	15. 1 Thimothy	১৫. পৌলুসকা
১৬. ২য় তিমথীয়	16. 2 Thimothy	১৬. পৌলুসকা
১৭. তীত	17. Titus	১৭. তিতুস
১৮. ফিলিমন	18. Philemon	১৮. খত ফিলিমনো
১৯. ইব্রীয়	19. Hebrews	১৯. খত ইব্রনীয়
২০. যাকুর	20. James	২০.ইয়াকুব কা খত
২১. ১ম পিতর	21. 1 Peter	২১.১লা পাতরাউস
২২. ২য় পিতর	22. 2 Peter	২২. ২য়া পাতরাউস
২৩. ১ম যোহন	23. 1 Johon	২৩. ইউহান্না কা ১লা খত
২৪. ২য় যোহন	24. 2 Johon	২৪. ইউহান্না কা ২রা খত
২৫. ৩য় যোহন	25. 3 Johon	২৫. ইউহান্না কা ৩রা খত
২৬.যিহুদা	26. Jude	২৬. ইহুদা কা খত
২৭. প্রকাশিত বাক্য	27. Revelation	২৭.ইউহান্নাকা মাকাশাফা

গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি আল কুরআনের সঙ্গে তুলনা করে 'বাইবেলের' অসারতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে কোন মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য হলেও গোটা বিশ্বের মুসলমানদের একই কুরআন শরীফ কিন্তু

খ্রীস্টানদের মধ্যে সমগ্র জগতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সম্প্রদায়। এক ইংল্যান্ডে ক্ষুদ্র বৃহত প্রায় দু'শ সম্প্রদায়। ধর্ম গ্রন্থ সকলের জন্য 'বাইবেল' হলে ও উহাতে অনেক যোগ-বিয়োগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে লেখক বাস্তব উদাহরণ দিতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন, রোমান ক্যাথলিকদের বাইবেলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো আছে। (১) তোবিয়া পুস্তক (২) যুদিয়া পুস্তক (৩) এস্তের পুস্তক (এই কিতাবে প্রটেষ্ট্যান্টদের মাত্র দশটি অধ্যায় আছে) (৪) জ্ঞানের পুস্তক (Sapmtea) (৫) ধর্মোপদেশ (Ecelesiastrens) (৬) বারুক পুস্তক (৭) দানিয়েল (এই কিতাবে প্রটেষ্ট্যান্টদের মাত্র ১২ অধ্যায় আছে। (৮) প্রথম মাফাবিয়া পুস্তক (৯) দ্বিতীয় মাফাবিয়া পুস্তক।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ নগরে কতকগুলো বিশপ (পাদ্রী) নিয়ে বাইবেল সংশোধনকারী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা কর্তৃক সংশোধিত সংস্কার জবারংবফ উফরঃরড়হ বাইবেল প্রকাশিত হয়েছে। খ্রীস্টান সমাজে বর্তমানে এই বাইবেল প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। রোমান ক্যাথলিক ব্যতীত বঙ্গের যাবতীয় খ্রীস্টানদের মুরব্বী পাদ্রী বমওয়েস সাহেব বাইবেলের এক নতুন অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি এতে অনেক যোগ-বিয়োগ করেছেন বলে সূত্রে পাওয়া যায়। এভাবে লেখক বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে বাইবেলের পরিবর্তন পরিবর্ধন বিষয়ক তথ্যাবলীর প্রমাণ দেখিয়েছেন। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচিত যে-সব রচনা অথবা প্রবন্ধ বর্তমান গবেষকের হস্তগত হয়নি অথচ তথ্য সূত্রের অনুসন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা গেলঃ

রচনা/ প্রবন্ধের নাম	**প্রকাশনা-তথ্য**
২৯. বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে	ইসলাম প্রচারক [মাসিক] ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ঃ জুলাই ১৮৯৯

৩০. প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে?	ইসলাম প্রচারক ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১।
৩১. মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী	ইসলাম-প্রচারক। ৪র্থ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যাঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১।
৩২. বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা	ইসলাম-প্রচারক। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি ১৯০০।
৩৩. নিশীথে [কবিতা]	কোহিনূর [মাসিক]। ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা আশ্বিন ১৩০৫
৩৪. ফারাক্লিত (ইংরেজী হইতে অনূদিত)	ইসলাম-প্রচারক। ৫ম বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩।
৩৫. মর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত	ইসলাম-প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ অক্টোবর ১৯০৪।
৩৬. পূর্ণ চন্দ্র [কবিতা	লহরী [মাসিক] ১ম খণ্ড, ৫-৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৭।
৩৭. হযরত মওলানা লুৎফল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	ইসলাম-প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা ঃ মার্চ ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫।

৩৮. ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা	ইসলাম-প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা ঃ মার্চ ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫।
৩৯. বাইবেলের পরিবর্তন	ইসলাম-প্রচারক। ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ঃ ডিসেম্বর ১৯০৫।
৪০. হযরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	কোহিনূর। ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।
৪১. হযরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	কোহিনূর। ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।
৪২. দার্জ্জিলিং ভ্রমণ	বাসন [মাসিক] বৈশাখ ১৩১৬।
৪৩. পাদরীর স্বরূপ	মোহাম্মদী [সাপ্তাহিক]। ফাল্গুন ১৩৩১।
৪৪. পাদরী নেডেল জোনস সাহেবের প্রতি	মোহাম্মদী। ৪ বৈশাখ ১৩৩২।

৪৫. ইসলামে পাদ্রীর ভীষণ আঘাত	মোহাম্মদী। ২২ জৈষ্ঠ্য ১৩৩২
৪৬. বাইবেলে বহু বিবাহ	শরিয়তে–এসলাম। ১ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যাঃ আষাঢ় ১৩৩৩
৪৭. পাদ্রী সাহেবের নূতন আবিষ্কার	শরীয়তে-এসলাম ১ম বর্ষ, ৯ সংখ্যা ঃ আশ্বিন ১৩৩৩।
৪৮. পাদ্রীর ভ্রান্তি	ইসলাম-দর্শন। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ঃ পৌষ ১৩৩৪।
৪৯.ইছায়ী-ক্রীড	শরীয়তে-এসলাম। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।
৫০. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	বঙ্গনূর [মাসিক]। ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ঃ আশ্বিন ১৩২৭।

মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচনাবলী পর্যালোচনা করে আমরা এ মন্তব্য করতে পারি যে, সমগ্র বাংলার মুসলমান যখন নানা দুর্ভাগ্যে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-অপমানিত তখন তাঁর কলম-জিহাদ ছিল খুবই প্রমাণ সাপেক্ষ ও সময়োপযোগী, যার শাণিত আঘাতে–বৈরী প্রতিপক্ষ খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতাকে পর্যুদস্ত করতে বাধ্য করেছিলেন। ইসলাম ও মুহাম্মদের (সা) উপর খ্রীস্টান আক্রমণ ও বৈরিতার প্রতিবাদে জমিরুদ্দীনের জবাবীমূলক রচনাবলী অকাট্য যুক্তিনির্ভর। 'আসল কোরাণ কোথায়'-এ বিষয়ে তিনি মুনশী মেহেরুল্লাহর সঙ্গে যে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন, মূখ্যত এ পরাজয় তিনি স্বীকার করেছিলেন মাত্র, এরপর জীবন জিজ্ঞাসায় অবতীর্ণ হয়ে জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লাহর যুক্তি প্রমাণের সূত্র ধরে ঈমানের দাবীতে নতুন করে সত্যানুসন্ধানের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আর সে পথেই চলতে চলতে তিনি মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যান[৯৩]।

[৯৩] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, ঢাকাঃ গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন-২০০৫, পৃঃ ১৯৬-২০০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম জাগরণে জমিরুদ্দীনের ভূমিকা

ইসলামের জাগরণ ও উন্মেষ পর্বের শুরু থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম ও মানবতার কল্যাণে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান জীবন ও সম্পদকে উৎসর্গ করেছেন। সামাজিকভাবে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে ধর্মীয় চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করে পারলৌকিক কল্যাণের জন্য আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে গেছেন। আর এমনই এক মনীষী মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন।

সততার ও অকপটতার প্রতি মুনশী জমিরুদ্দীন যেরুপ প্রগাড় অনুরাগ পরিলক্ষিত হতো সাধারণতঃ সেরুপ অনুরাগ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমাজে বিরল। ইসলামে প্রত্যাবর্তনোত্তর এই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হিসেবে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাংলার মুসলমান সমাজে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে মুনশী জমিরুদ্দীন তার অন্যতম নায়ক[১]।

বাংলায় মুসলিম নবজাগরণের ইতিহাসে দুটি নাম বিশেষভাবে গর্বের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন- মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। সে সময়ে বাংলা-আসামের প্রায় সর্বত্র এই দুই কিংবদন্তী পুরুষ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম সমাজ যখন জড়তায়, আলস্যে, মানসিক বিকারে এবং কর্মোদ্যোগের অভাবে জীবন্মৃত সেই অন্ধকার প্রহরে জাগরণের মশাল হাতে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের আবির্ভব। সময়টি ছিল তখন উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দিক। মুখ্যতঃ মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ছিলেন ইসলামের জন্য একজন নিবেদিত সৈনিক। সে সময়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি স্থানে খ্রীস্টান মিশনারীরা ব্যাপক আকারে তাদের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে তাদের কর্ম প্রয়াস সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। প্রত্যক্ষ এই মিশনারী প্রচারণার প্রতিক্রিয়াতেই মুন্সি মেখ জমিরুদ্দীনের আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান মিশনারী ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রোপাগান্ডা ব্যর্থ করে মুসলিম জনমনে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা প্রসারের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন[২]।

---

[১] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, পৃ-৮৬।
[২] মুন্সি মেহেরুল্লাহ জীবন ও কর্ম, নাসির হেলাল, পৃ-২৩১।

মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন মুন্সি মেহেরুল্লাহ এর সংস্পর্শে উৎসাহিত হয়ে ইসলাম প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং ধর্মীয় সভায় বক্তৃতাদানে তাঁর সঙ্গী হন। শেখ জমিরুদ্দীন শিক্ষকতা ছেড়ে বাকী জীবন ইসলাম প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম প্রচার ও বক্তৃতার উদ্দেশ্যে বাংলায় প্রায় সব জেলায় ভ্রমণ করেন এবং বিপথগামী মানুষকে 'দ্বীন-ই-ইলাহীর পথে ফিরিয়ে আনেন। তিনি বহু সংখ্যক অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ধর্মের সাথে শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি তিনি প্রচারের বিষয় করেন।

একজন মানুষকে অনিবার্যভাবেই তাঁর সময় ও সমাজকে স্পর্শ করতে হয়। হয়তো সেই স্পর্শ আল্‌তো বা পরোক্ষ হতে পারে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম নেই। এই অর্থে মুন্‌শী জমিরুদ্দীন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ-কথা বলা চলে। উনিশ-বিশ শতকে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমান সমাজে যে প্রবল সামাজিক আন্দেলন গড়ে ওঠে জমিরুদ্দীন ছিলেন তার অন্যতম নেতৃপুরুষ। সমাজচেতনাবোধ তাঁর প্রবল ছিল, সামজহিতাকামনা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট। তবে তাঁর এই আকাঙ্খা ও প্রয়াস স্বসমাজের সীমানা অতিক্রম করেনি। অবশ্য এ কথা স্মরণ করতে হয় রামমোহন রায়-বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ ব্যক্তিত্বের সমাজহিতকামনাও তাঁদের নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। জমিরুদ্দীনের সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিচেতনার পরিচয় তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে[৩]।

ইসলাম প্রচারে মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান-বক্তৃতা দান ও পুস্তক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যের আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামের দীক্ষা দেওয়া, ধর্মবোধে মুসলামানদের জাগ্রত করা- এককথায় ইসলামীকরণ এবং তদ্বারা সমাজের পুনর্জাগরণ এই ছিল মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের মূখ্য ব্রত[৪]।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ইতিহাসে জমিরুদ্দীনের সাহিত্য কর্মের উল্লেখ আছে। জমিরুদ্দীনের রচনাবলীকে বিষয়ভিত্তিতে এইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভবঃ ক. ধর্মতত্ত্ব ও বিতর্কমূলক রচনা; খ. অনুবাদকর্ম; গ. সামাজিক প্রবন্ধ; ঘ. জীবনী; ঙ. আত্মজীবনীমূলক রচনা; চ. ভ্রমণকাহিনী; ছ. সৃষ্টিধর্মী রচনা; জ. বিবিধ রচনা। অবশ্য এই শ্রেণীবিন্যাসের পুনর্বিন্যাস ও সম্ভব। যেমন অনুবাদমূলক রচনাকে অনায়াসেই ধর্মতত্ত্ব ও বিতর্কমূলক রচনা-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

---

[৩] মুনশি শেখ জমিরুদ্দীন, প্রফেসর আবুল হাসান চৌধুরী, পৃ-৭৮-৭৯।

[৪] উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানেদের চিন্তা চেতনার ধারা, ওয়াকিল আহমেদ, পৃ-২৮৯।

জীবনী বা আত্মজীবনীমূলক যে রচনা তার প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ ধর্মভিত্তিক এবং ভ্রমণের প্রেরণার মূলেও আছে ধর্মীয় প্রয়োজন। এমনকি তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে-শাসিত। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের সমগ্র রচনাই ধর্মাশ্রিত-ধর্মীয় প্রেরণার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব সর্বত্রই উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত[৫]।

তাঁর রচনা সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, মুখ্যত সাহিত্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কিংবা সাহিত্য সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে জমিরুদ্দীন লেখনী ধারণ করেননি। সাহিত্য সৃষ্টির কোন বাসনা ও তাঁর ছিল না। যে কর্মোদ্যোগ এবং কর্ম প্রেরণায় আজীবন তিনি দেশের সর্বত্র বক্তৃতা প্রদান করেছেন, সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থেকেছেন তারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকাদি রচনা করতে হয়, সাময়িক পত্র আন্দোলনের নামে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি পূর্বোক্ত ব্রত সাধনের সক্রিয় ও ফলপ্রসূ উপকরণ হিসেবে লিখনী ব্যবহার করেন। অতঃপর তাঁর উদ্যোগ, নেতৃত্বে ও সহায়তায় তৎকালীন যুগের মুসলিম সাহিত্য আন্দোলন বহুল পরিমাণে প্রেরণা লাভ করে। এ সকল কারণেই আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের সাহিত্য কর্মপ্রয়াস বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

প্রচারক-জীবনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের সাহিত্যেও অঙ্গণে পদার্পণ। তাঁর লিখনী চালনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরোধিতা, ইসলামের বাণী প্রচার, সমাজ সংস্কার এবং মুসলিম জাগরণ। প্রবল উদ্দেশ্য প্রবণতার কারণে অবশ্য তাঁর রচনাসমূহ প্রচার পুস্তিকার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, তৎকালে তিনি জনপ্রিয় লেখকের মর্যাদা লাভ করেছিল। মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীনের প্রবন্ধ-পুস্তিকাদি রচনার মৌল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচার প্রতিরোধ করা এবং সৃদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মগত আচরণ প্রতিষ্ঠিত করা।

খ্রীস্টান গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে মিশনারী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ধর্ম প্রচার করে। এই সব মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যীশুর মহীমা ও খ্রীস্টান ধর্মের সত্যতা প্রচার করা। তারা পবিত্র কোরআনের অপব্যাখা করতেন, ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা আজগুবী কাহিনী প্রচার করতেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রে বিভিন্ন কলঙ্ক লেপন করতেন। হাটে বাজারে,পথে ঘাটে

[৫] মুন্শি শেখ জমিরুদ্দীন, আবুল হাসান চৌধুরী, পৃ-৫০।

বক্তৃতা দান করে, প্রচার পুস্তিকা রচনা করে মিশনারীরা তাদের প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। তাদের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হয়ে বহু সরল প্রাণ মুসলমান স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্ত গ্রহণ করে। এই সঙ্কটকালে মিশনারীদের প্রচার অভিযানকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

ইসলাম, কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে প্রচারিত অপব্যাখাসমূহের প্রত্যুত্তর প্রদান করবার জন্য তিনিও পুস্তক রচনা করলেন, মিশনারীদের তর্কযুদ্ধে আহবান জানালেন, গ্রামে বন্দরে শহরে ধর্মসভার অনুষ্ঠান করলেন। জাতীয় উন্নয়ন সাধনের জন্য সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন অনুধাবন করেন যে, এই কাজের জন্য বক্তৃতা প্রদান, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইত্যাদির সাথে সমায়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং পুস্তক রচনারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলমানদের সাময়িক পত্রিকার সাথে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচার কার্যের জন্য জমিরুদ্দীন কে বিভিন্ন জেলায়, গ্রামে-গ্রামে পরিভ্রমণ করতে হত এবং অসংখ্য সভায় বক্তৃতা দান করতে হত।

মুন্সি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের প্রবন্ধ-পুস্তাকাদি রচনার মূল উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচার প্রতিরোধ করা এবং সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মগত আচরণ প্রতিষ্ঠা করা। তুলনামূলক ধর্মীয় আলোচনার ক্ষেত্রে জমিরুদ্দীন বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনি সামাজিক সমস্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর বিভিন্ন প্রকার রচনার মধ্যে এই উভয় জাতীয় বিষয়ই মূখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

জমিরুদ্দীনের জীবন কথা থেকে তাঁর মানস প্রস্তুতির মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। তাঁর বাল্য শিক্ষা, খ্রীস্টান মিশনারী ও ব্রাক্ষণদের সাথে সংযোগ, মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ প্রস্তাব এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে ইসলাম প্রচারকের সাথে যোগাযোগ জমিরুদ্দীনের মানসগঠনে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সাহিত্য ধর্মের পরিচিতি বিশ্লেষণে এই পটভূমির বিশেষ অবদান রয়েছে।

তৎকালে মুসলিম বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, পত্রিকা সম্পাদক, জমিদার এবং বিত্তবান ব্যক্তি নানা প্রকারে জমিরুদ্দীনকে তাঁর পুস্তাকাদি প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করেন। এঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী, ফুরফুরার পীর মোহাম্মদ আবুবকর, 'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ এবং মুর্শিদাবাদ-ভাবতার জমিদার মোহাম্মদ আবদুল আজিজ। এ প্রসঙ্গে মেহেরুল্লাহর কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। জমিরুদ্দীনের নানাবিধ রচনা প্রস্তুতের কার্যে এবং পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সাহায্য ও প্রেরণার উৎস ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ[৬]।

ধর্মীয় প্রচারকার্য ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা আন্দোলনের সাথেও জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বক্তৃতা প্রদানের সাথে প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও পারবারিক জীবনের ক্লেদ, কুসংস্কার দূর করবার সাধ্যনুযায়ী চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরোধিতা করে অত্যন্ত স্পষ্ঠ ভাষায় তিনি যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন তা হিন্দু সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু বিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে জমিরুদ্দীন বিস্ময়কর বাস্তব বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' প্রবন্ধটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এই সম্বন্ধে নিপীড়িতা নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বিদ্যাসাগরের মতই তিনি বেদনার্ত এবং উচ্চকণ্ঠ। প্রবন্ধটিতে জমিরুদ্দীন নারীর ব্যক্তিসত্ত্বার প্রতি এবং নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন তৎকালীন পত্র-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। সুধাকর, মিহির, সুধাকর,প্রচারক, নবনূর, কোহিনুর, ইসলাম দর্শন, বঙ্গনূর, শরিয়ত, শরিয়তে এসলাম, তবলীগ ইত্যাদি সাময়িপত্রে তাঁর বহু সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ইসলাম প্রচারকের সাথে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জমিরুদ্দীনের কিছু সংখ্যক মৌলিক প্রবন্ধ এবং অনুদিত ও অনুবাদমূলক প্রবন্ধ পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সে সকল রচনা এখন সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জমিরদ্দীন রচিত কিছু সংখ্যক প্রবন্ধের শিরোনামের সন্ধান পাওয়া গেলেও সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়[৭]।

---

[৬] নাসির হেলাল, মুনসী মেহেরউল্লাহ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ২৪২-২৪৩।

[৭] মুন্সী মেহেরউল্লাহঃ জীবন ও কর্ম, নাসির হেলাল, পৃ-২৪৪-২৪৫।

জমিরুদ্দীন সমকালীন প্রায় সব নেতৃস্থানীয় মুসলিম সভা-সমিতির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। শুধু যুক্ত থাকা নয়, এসব সভা-সমিতিতে তিনি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। তাঁর এই সাংগঠনিক তৎপরতা বিশেষ স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। 'ইসলাম-প্রচারক পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়ঃ

বঙ্গের চতুদ্দিকে ধর্ম্ম-সভা, সামাজিক সভা, শিক্ষাবিধায়িনী সভা প্রভৃতির অধিবেশন হইতেছে। বিখ্যাত আলেমগণ অর্থাৎ মৌলবী-মৌলানাগণ এবং বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তাগণ ঐ সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতামণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছেন। এই সকল সভা-সমিতির দ্বারা সমাজের অসাধারণ উপকার সাধন হইতেছে। আদর্শ পীর-মোর্শেদ ও হাদী জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব বঙ্গীয় বক্তাগণের অগ্রণী। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে মৌলবী খবিরুদ্দীন আহম্মদ সাহেব, মুনশি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মুন্‌শি মোহাম্মদ মেহেরল্লাহ সেরাজগঞ্জী সহেব সুফি ময়েজুদ্দীন ওর্ফে মধু মিঞা সাহেব, মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুছ সাহেব, মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব (ময়মনসিংহ), শাহ আবদুল্লা সাহেব, সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, মৌলবী আহম্‌দউল্লা সাহেব, মৌলবী ফজলোর রহমান সাহেব, দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহম্‌দ সাহেব, দেওয়ান শমসউদ্দীন আহম্‌দ সাহেব প্রভৃতি প্রধান।

মুনশি শেখ জমিরুদ্দীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৩১০ সালের ২০ ও ২১ শে চৈত্র রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় এই সমিতির এক বিরাট অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী সৈয়দ শামসুল হুদা এম.এবি.এল (১৮৬২-১৯২২)। জমিরুদ্দীন এই অধিবেশনে মুনশি মেহেরুল্লাহ্ উত্থাপিত তৃতীয় এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) উত্থাপিত চতুর্দশ সংখ্যক প্রস্তাবটি যথাক্রমে সমর্থন ও অনুমোদন করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়ঃ এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদেরকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এসলামিয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন এক ঘন্টা সময় ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত নির্ধারণ থাকা কর্তব্য"। রাজশাহী অধিবেশনে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুরকে পৃষ্ঠপোষক, সৈয়দ শামসুল হুদা ও খান মীর্জ সুজাত আলী বেগকে সভাপতি এবং মৌলবী ওয়াহেদ হেসেন বি.এ.বি.এল কে সম্পাদক করে সমতির যে স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি গঠিত হয় মুনশি জমিরুদ্দীন সেই নির্বাহী পর্ষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন[৮]।

[৮] আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১২ সালের ৯-১০ বৈশাখ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম গাঁয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খান বাহাদুর প্রিন্স আলি নওয়াব চৌধুরীর বাসভবনে। এই অধিবেশনে মুনসি মেহেরুল্লাহ, মনিরুজ্জামান ইসলামালাদি প্রমুখের সঙ্গে জমিরুদ্দীনও যোগদান করেন।

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' পরবর্তীতে যখন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলামন শিক্ষা সমিতি'তে (Provincial Muhammadan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam) রুপান্তরিত হয় তখনো মুনসি মোহাম্মদ শেখ জমিরুদ্দীন এই সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় ১৩১৩ সালে (ইং ১৯০৬) অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের প্রস্তুতি কার্যক্রমে জমিরুদ্দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি লিখেছেনঃ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান (শিক্ষা) সমিতির সভাপতি মোসলেম কুল-রত্ন, পরম ভক্তিভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল নওয়াব খাজা সলিমউল্লাহ সি.আই.ই বাহাদুর। উহার সম্পাদক মুসলমান কুল-গৌরব পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল খান বাহাদুর মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব। এই বৎসরে ঢাকাতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হওয়াতে, আমি উক্ত ঢাকার নওয়াব বাহাদুর ও খান বাহাদুর কর্তৃক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান (শিক্ষা) সমিতির পক্ষ হতে প্রচারক নিযুক্ত হইয়া ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, ঢাকা, নোয়াখলি, ফেনী, সীতাকুন্ড ও চট্রগ্রাম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়াছি[৯]।

এছাড়া তিনি চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানেও উক্ত অধিবেশনের সাফল্যের জন্য গণ-সংযোগ করেন। নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের সার্বিক সাফল্যও প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য জমরুদ্দীনের সাংগঠনিক সফর বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এখানে স্মরণ করতে হয়, এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

[৯] পূর্বোক্ত, পৃ-৮০।

১৩১৪ সালের পৌষে করাচীতে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। খান বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে মুনশী জমিরুদ্দীন এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায়ঃ

করাচীর শিক্ষা-সমিতিতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, বার্মা, দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি ভারতের প্রায় সব প্রদেশ হইতে ডেলিগেইট ও মেম্বরগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শামসুল ওলামা মওলানা খাজা আলতাফ হোসেন হালি পানিপত্তি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জমিরুদ্দীন ১১ পৌষ করাচীতে পৌছান। তিনি বলেছেনঃ করাচী নগরে পৌছিয়া "সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি"তে যোগদান করি। দুই দিবস শিক্ষা-সমিতিতেও দুই দিবস লীগে যোগদান করিয়া করাচী নগর ভ্রমণে বাহির হই।

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা- সমিতি'র দ্বিতীয় অধিশেন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে। এই অধিবেশনে উত্থাপিত ২২ সংখ্যক প্রস্তাবটিতে বলা হয় ঢাকা এবং চট্রগ্রাম বিভাগের মত এ্যাংলো-পার্শিয়ান ডিপার্টমেন্ট সম্বলিত কোন মাদ্রাসা রাজশাহী বিভাগে নেই। এই বিভাগে সিরাজগঞ্জে একমাত্র যে হাই স্টান্ডার্ড মাদ্রাসা; আছে তার সাথে যুক্ত করে একটি হাইস্কুল চালু করা হোক। মুনশি জমিরুদ্দীন এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন। জমিরুদ্দীন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন, তা এই প্রস্তাবে বোঝা যায়[১০]।

১৩১০ সালের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন শেষে ২৩ চৈত্র সমাগত অধিকাংশ ডেলিগেইট ও স্থানীয় সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মৌলবী ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'বঙ্গীয় ইসলাম-মিশন সমিতি' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। রংপুরের মহীপুরের জমিদার খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরী এবং 'ইসলাম প্রচারক' ও 'সোলতান' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। জমিরুদ্দীন ছিলেন

[১০] পূর্বোক্ত, পৃ-৮১।

এর কার্য-পরিচালক সমিতির অন্যতম পরিচালক। এই বঙ্গীয় ইসলাম-মিশন সমিতি গঠনে জমিরুদ্দীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমীর (১৮৬৭-১৯২৩) উদ্যোগে ১৩১১ সালে তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালীতে 'আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই এর সাথে জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি প্রায় এর প্রতিটি অধিবেশনেই যোগ দিতেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। ধর্মীয় শিক্ষাকেই সবসময় তিনি প্রাধান্য ও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

-----অশিক্ষিত মুসলমানগণকে কোরআনের শিক্ষা দাও; জুমার খোৎবা বাঙ্গালায়, কোরআনের তর্জমা লোকদিগকে বুঝাও ----। ----পীর ও আলেমগণ, ভুয়া কথায় নিজেদের পকেট গরমের ব্যবস্থা ছাড়িয়া চাঁদা তুলিয়া গরীব মুছলিমদিগকে শিক্ষা দাও।

আঞ্জুমানের প্রতিবেদনে জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান মিশনারীদের মোকাবেলায় যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার স্বীকৃতি জানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

---খোদা তায়ালার ফজল করমে অত্র আঞ্জুমান এবং অন্যান্য ওলামা ও ওয়াযেজ বক্তাগণের যত্ন চেষ্টায় বিশেষতঃ আমাদের অন্যতম সুহৃদ এছলাম প্রচারক মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের লিখনী প্রসূত 'রদ্দে নাছারা' প্রভৃতি ও অন্যান্য লেখকের আরও কতিপয় পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন খ্রীস্টানের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। নূতনভাবে আর কেহই এই ধর্মের প্রলোভনে পতিত হইতেছে না, বরং যীশু ভক্তগণই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; এই আনন্দদায়ক সংবাদই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে[১১]।

ফুরাফুরার পীর মুহম্মদ আবুবকর সাহেবের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে-বাঙ্গালা'র (১৯২৪) সঙ্গেও জমিরুদ্দীন প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯২১ (১৩২৮) সালে কমিটিতেও তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। আঞ্জুমানের কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি পূর্বাপর জড়িত ছিলেন। 'জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ'র সঙ্গেও জমিরুদ্দীনের যোগ ছিল। কলকতায় ১৯২৬ সালের ১১-১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত 'জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ'র সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে

[১১] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩-৮৪।

জমিরুদ্দীন প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। অবশ্য তিনি কখনো কখনো এসব সভা সমিতির ভূমিকার সমালোচনাও করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার কাজে এঁদের শৈথিল্য ও নির্লিপ্ততার সমালোচনা করে জমিরুদ্দীন বলেছেনঃ ''জমিয়তে ওলামা ও অন্যান্য আঞ্জুমান বলিয়া কি হইবে? তাঁহাদের এদিকে লক্ষ্য করিবার সময়াভাব। অথচ তাঁহারাই নাকি ধর্মপ্রচার করিতেছে''।

জমিরুদ্দীন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মুসলিম পরিচালিত সভা-সমিতির অধিবেশন-সম্মেলনে যোগদান দিয়েছেন। এসব অধিবেশনের কার্যক্রমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, বক্তব্য ও আলোচনায় মুসলিম জাগরণকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। জমিরুদ্দীন ধর্মীয়ু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিলো। তিনি ১৩২৫ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের জন্য গঠিত সাধারণ সম্মেলন সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সাধারণ পরিষদ দশজন সদস্য সম্মিলন সমিতির জন্য নির্বাচন করবেন এমন নিয়ম ছিলো। এই নির্বাচিত দশজন বঙ্গীয় সহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে যুক্ত হইয়া সম্মিলন পরিচালন সমিতি নামে সম্মেলনের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন। জমিরুদ্দীন এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি ছাড়া আরো তিনজন প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন-ডঃ আব্দুল গফুর সিদ্দীকি, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক ও কোচবিহারের আব্দুল হালিম। জমিরুদ্দীন বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতির (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জমিরুদ্দীন সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তা চেতনাএসব সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই বিকাশের বিশেষ সুযোগ লাভ করে[১২]।

মূলত ধর্মীয় কর্মকান্ডের ভেতর দিয়েই নিজের সমাজ সম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামনা করেছিলেন। তাঁর সমাজ চিন্তার প্রত্যক্ষ পরিচয়যুক্ত রচনার সংখ্যা খুবই স্বল্প। এর মধ্যে তাঁর 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেনঃ

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ-৮৫।

বক্তৃতা প্রদানের দ্বারা এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্লেদ কুসংস্কার দূর করবার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। মুসলমান সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরোধিতা করে অত্যন্ত স্পষ্ট তিনি বলিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এত ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বরন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু বিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে জমিরুদ্দীন বিস্ময়কর বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তামাক সেবনের কুফল ও অপকারিতা সম্বন্ধেও জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এ ব্যাপরে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টান্তের আশ্রয় না বিনয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কে গুরুত্বারোপ করেছেন। জমিরুদ্দীন যে সব সভা-সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন ধর্মীয় প্রসঙ্গের পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদি। সঙ্গত কারণেই এসব বিষয় জমিরুদ্দীনকে কমবেশী স্পর্শ করেছিল[১৩]।

সমাজের দুরবস্থা ও অবক্ষয় যে জমিরুদ্দীনকে ব্যথিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে তিনি যখন 'আসল বাঙ্গালা গজল' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন তার মধ্যে কেবল ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং সামাজিক প্রসঙ্গ বা জাতীয় উদ্দীপনার পরিচয় আছে। জমিরুদ্দীনের নিজের রচিত একটি গজলে হিন্দু মুসলমান মিলনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বলা হয়েছে-

হিন্দু আর মোছলমানে,
এক মনে এক প্রাণে,
সম্মিলিত একস্থানে,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

এই কাঙ্খিত মিলনকে তিনি 'শুভ-সম্মিলন' বলে উল্লেখ করে বলেছেন 'জীবনে এ সন্ধিক্ষণ'। সামাজিক সহাবস্থান ও অগ্রগতির জন্য তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭।

যাঁর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে জমিরুদ্দীনের জীবন চেতনার সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি মুনশি মেহেরল্লাহ। জমিরুদ্দীনের ইসলাম ধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তন এবং উত্তরকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের মূলে মেহেরুল্লাহর ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। মেহেরুল্লাহর সঙ্গে 'আসল কোরান কোথায়' এই বিতর্কের সূত্র ধরে জমিরুদ্দীনের ভ্রান্তি মোচন হয় এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মকথায় জমিরুদ্দীন আফসোস করেছেন, 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান' পুস্তক ও মেহেরুল্লাহর মতো প্রচারকের সাক্ষাৎ পেলে তিনি মিশনারীদের ধোকায় বিভ্রান্ত হয়ে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতেন না।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুকাল পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গে অসংখ্য সভা-সমিতিতে যোগদান করেন। জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহযোগিতায় মেহেরুল্লাহ্‌র মিশনকে আরো গতিময় ও ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। এই সময়কালে বলাচলে, জমিরুদ্দীন ছিলেন মেহেরুল্লাহর ছায়াসঙ্গী। মাত্র দশ বছর তাঁদের সাহচর্যের বয়স, তবুও এই সময়কালের পরিসরেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক কীর্তিময় গভীর সৌহাদ্যের বন্ধন।

মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন জমিরুদ্দীন। মেহেরুল্লাহর অবর্তমানে এক বিরাট ধর্মীয়-সামাজিক দায়িত্ব বর্তায় জমিরুদ্দীনের ওপর এবং তিনি তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। জমিরুদ্দীনের জীবনে মেহেরুল্লাহর প্রভাব ছিল অপরিসীম। সমাজ-সংস্কার ও রাজনীতি বিষয়েও জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহরই অনুসারী ছিলেন। তবে সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনায় মেহেরুল্লাহ অধিক অগ্রসর-চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মেহেরুল্লাহ ধর্মীয় প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে পরিমাণ ভেবেছেন, জমিরুদ্দীন সেদিকে ততোখানি মনোযোগ দেননি, তাঁর চিন্তা ছিল একমূখী এবং ধর্মকেন্দ্রিক। তবুও মেহেরুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারকে সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব জমিরুদ্দীনেরই প্রাপ্য। ইসলামী রেনেসাঁর এই দুই ব্যক্তিত্ব ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ের মিলিত কর্মসাধনায় বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন অর্জন করেছিল আকাঙ্খিত গতিশীলতা। তাই মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীন, এই নাম দু'টি যুক্তভাবে উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে[১৪]।

[১৪] প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশি শেখ জমিরদ্দীন, পৃষ্ঠা-৯০-৯৫।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন ১২৭৭/১৮৭০ সালের ১৫ মাঘ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪৪/১৯৩৭ সালে ১ আষাঢ়/২ জুন বেলা ১-৩০ মিনিটে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই ৬৭ বছর বয়সের মধ্যে ২৫ বছর অতিবাহিত হয় শৈশব যাপন, শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ। এই ২৫ বছরের মধ্যে দীর্ঘ ৮ বছর (১৮৮৭-১৮৯৫) তিনি খ্রীস্ট সমাজভুক্ত ছিলেন। অবশিষ্ট ৪২ বছর তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ছাত্র অবস্থায় তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এলাহাবাদের সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজ থেকে ঐ.এ.জ.ডিগ্রী লাভ করেন (১৮৯২) এবং মিশনারী হিসেবে প্রথম এলাহাবাদে ও কলকাতায় এবং পরিশেষে নদীয়ার শিকারপুরে অবস্থান করেন। তিনি 'আসল কোরাণ কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করলে (১৮৯২) মুনশী মেহেরুল্লাহর সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়। এক পর্যায়ে শেখ জমিরুদ্দীন নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। জানা যায় ঐ বছর কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত খ্রীস্টানদের সভায় জমিরুদ্দীন বক্তৃতা প্রদান শেষে বাড়ী ফেরার সময় পথিমধ্যে মধুগাঁড়ী নামক স্থানে তাঁবুতে অবস্থান করে পবিত্র কুরআন শরীফের সুরাহ সফ পাঠ করা শুরু করেন। এটি পাঠের সময় ইসলাম ধর্মেও প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। ফলে ১৮৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ইসলাম ধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেন।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন সত্যানুসন্ধিৎসু ও অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানব ছিলেন। তাঁর কর্ম জীবনের পুরো সময় তিনি মুসলিম জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য বিরামহীন শ্রম দিয়েছেন। তদানীন্তন কালের বৃহৎ সাম্রাজ্য শক্তি ইংরেজ তথা খ্রীস্টানী শক্তির মোকাবেলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে লিখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি সাময়িকের জন্য ধর্মীয়ক্ষেত্রে আপোষ করলেও ইসলাম ও মুসলমানদের উপর কোন সাধারণ হস্তক্ষেপের সময়েও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভূমিকা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে থাকতেন না[১]।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ। জীবন জিজ্ঞাসায় ক্রমে ক্রমে খ্রীস্ট ধর্মের অসারতা এবং ইসলাম ধর্মেও মাহাত্ম তাঁর কাছে প্রমাণিত হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের বিরোধীতা করার জন্য এই সম্পর্কে যত বেশি অধ্যয়ন করতে লাগলেন, এ ধর্মের গুণাগুণ ও মাহাত্ম তাঁকে আরো বেশি আকৃষ্ট করতে থাকে। খ্রীস্টান মিশনারীদের অশুভ চক্রান্ত তাঁর কাছে যতই

[১] মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, পৃঃ ২০০-২০১।

উন্মোচিত হতে শুরু করলো ততই তিনি ভুল বুঝতে পারলেন এবং অনুশোচনায় তিনি নিজেকে অপরাধী হিসেবে মনে করলেন। অতঃপর সেই অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে সার্বিকভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি ও বিবেকের বিকাশের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়নতা ও উদারতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

শেখ জমিরুদ্দীন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাহকে একমাত্র মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামের নিখুঁত শিক্ষা ও নৈতিকতার মান উন্নয়ন ব্যতিরকে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র হিসেবে বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। সুতরাং অধঃপতিত বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ তাদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি আর চেতনার পুনর্জাগরণ এবং তার বিকাশ।

এ লক্ষ্যে তিনি নিজ বাড়ী ছেড়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে জাগ্রত করতে থাকেন পরম শ্বাশত সত্যের অনুভূতি। এ ভাবে অবিভিক্ত বাংলার গোটা এলাকা জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করলেন এক চরম অনুপ্রেরণা। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যেন ফিরে পেল তাদের হৃত গৌরব।

শুধু সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি নয়, এই মহান মনীষী সাহিত্য সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শুভ উদ্দেশ্য সাফল্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন শতাধিক পুস্তক-পস্তিকা। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকার একটি বিশেষত্ব আছে-যা আধুনিক সাহিত্য সাধকদের সাথে খাপ খায় না। তাঁর সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারাভিযানের প্রতিরোধ করা, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারণ সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। সমগ্র জীবন তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিই ছিলেন একাগ্রহচিত্ত। তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

সেকালের সাময়িক পত্রেও মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে এসব রচনার আধুনিক যুগের মুসলিম বাংলায় খ্রীস্টান মিশনারীদের সাথে ধর্ম-দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে। স্ব-ধর্ম চেতনার বিকাশের সাথে বাঙ্গালী মুসলমানগণ আত্মজাগরণের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে চিরদিন। এতএব, শধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন নয়, সামাজিক আন্দোলনেরও প্রামাণ্য বিবরণী হিসেবে জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর অসাধারণ মূল্য রয়েছে। জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ডঃ আনিসুজ্জামানের উক্তির অনুসরণ করে বলা যায়, ‘‘তার কিছু মূল্য, মেহেরউল্লাহর রচনাবলীর মতো-তো বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে

এগুলোর ভূমিকা স্মরণীয়"। সেকালে মেহেরউল্লাহ-জমিরুদ্দীনের মত সমাজ-সংস্কারক লেখকের আবির্ভাব না হলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অবস্থা যে কি হত ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে[২]।

সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ও বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাসে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অবক্ষয় রোধে যে সকল মহাপুরুষ সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের (১৮৭০-১৯৩৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম জাগরণের উন্মেষ পর্বে তাঁর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল অতুলনীয়। সমসাময়িক অন্যান্য ধর্ম প্রচারক ও সমাজ কর্মীদের তুলনায় জমিরুদ্দীনের আবির্ভাবের তাৎপর্য ছিল প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামনা এবং ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও তার মর্যাদা সংরক্ষণের প্রয়াস ছিল। তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে এবং তা রুপায়িত করতে গিয়ে তাঁকে এক প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হয়। এ অসাধারণ কর্মী পুরুষ স্বকালে উপেক্ষিত ও উত্তরকালে প্রায় বিস্মৃত একটি নামে পরিনত হয়েছেন। মুনশি জমিরুদ্দীন যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সেই প্রেক্ষাপট আজ বিদ্যমান না থাকলেও, সমাজ জীবনের ক্রান্তিকালে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের কারণে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি। (আবুল আহসান চৌধুরী, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭), ভূমিকা হতে সংগৃহিত)।

সবশেষে একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন মানবতার কল্যাণে সাধনেই নিজ জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করেন। দেশ ও জাতির জন্য নিঃস্বার্থ-ত্যাগের বিনিময় তিনি মহান আল্লাহ কাছ থেকে পাওয়ার আশা করেন, দুনিয়ার কোন মানুষ থেকে নয়। কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলার মুসলমান তাঁর এই অবদানের কাছে চিরঋণী।

[২] নাসির হেলাল, মুনসী মেহেরউল্লাহঃ জীবন ও কর্ম, পৃ-৪৫১)।

গ্রন্থপঞ্জী(Bibliography)

১. আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশি শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭), ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯
২. মুন্‌শি শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহেরচরিত, ১৩১৫ বাংলা।
৩. মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন (গবেষণা বিভাগ), জুন-২০০৫।
৪. শেখ জমিরুদ্দীন, আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, রাজশাহীঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭।
৫. মুন্সী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।
৬. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯।
৭. নাসির হেলাল, মুনসী মেহেরউল্লাহ জীবন ও কর্ম, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০।
৮. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৯৭।
------- বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
৯. আববাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড), ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, জুন-১৯৯৪।
১০. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলকতা, ১৯৩৫।
১১. আবুল আহসান চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি, কুষ্টিয়াঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯।
১২. আব্দুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, অনুঃ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
১৩. মুহাম্মদ আবু তালিব, মুনশী মেহেরুল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩।
১৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলিকতাঃ ১৯৭১।
১৫. মুহাম্মদ আবু তালেব, মুনশী মেহেরুল্লাহঃ দেশ করাধ সমাজ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩।
১৬. আবুল আসাদ, একশ' বছরের রাজনীতি, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।
১৭. আবুল হোসেন, মুন্সী জমিরুদ্দীনের জীবনী, মেহেরপুরঃ গাংনী প্রেস, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
১৮. কাজী আব্দুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকাঃ ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯।
১৯. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০।
২০. আব্দুল গফুর সিদ্দীকি, শহীদ তিতুমীর, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী
২১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকাঃ আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬৫।
২২. আবুল হোসেন, আদেশের নিগ্রহ, আবুল হোসেনের রচনাবলী, ১ম খন্ড, সম্পাঃ আব্দুল কাদির, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৩৩৬ বাংলা।
২৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭।
২৪. সৈয়দ আব্দুল মান্নান, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮।
২৫. আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
২৬. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
২৭. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বিবাহ নীতি, আল-ইসলাম, কার্ত্তিক, ১৩২৬।
২৮. ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

২৯.খোন্দকার ফজলে রাব্বী, বাংলার মুসলমান, মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত, ঢাকাঃ ১৯৬৮।
৩০. প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত, বাংলাদেশে খ্রীস্টিয় মন্ডলীয় ইতিহাস, চাঁদপুরঃ খ্রীস্টিয়ান লেটারেচার সেন্টার, ১৯৮৫।
৩১. ডঃ নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, কলিকতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০১ বাংলা।
৩২. নুরুল ইসলাম খান, বাংলাদেশে জেলা গেজেটীয়ার কুষ্টিয়া, ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১।
৩৩. নীহারঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকতাঃ ১৩৫৬ বাংলা।
৩৪. পল কাজল দাশ, যশোর জেলায় খ্রীস্ট মন্ডলী, ঢাকাঃ বাবু বাজার, ১৯৯৩।
৩৫. ফাদার এম, সি,চক্রবর্তী, ভারতে খ্রীস্টের বাণী প্রচারক, কলিকতাঃ ক্যালকাটা খ্রীস্টিয়ান ট্রাক্ট এন্ড বুক সোসাইটি, ১৯৫৯।
৩৬. বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক (সংকলনে মেসবাহুল হক রচিত পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকাঃ ১৯৮৭।
৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা, কলিকতাঃ ১৮৫৯।
৩৮. আ,শ,ম, বাবর আলী, বাঙালি মুসলিম জাগরণে কয়েকজন বাঙালি সাহিত্য সাধক, শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮।
৩৯. মুনশী মনিরুদ্দীন আহমেদ, আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা, কলিকতাঃ ১৩০৮ বাংলা।
৪০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮২।
৪১. মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭।
৪২. মুশতাক আহমেদ, শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করণ, ২০০১।
৪৩. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সমাজ সংস্কার, আল-এসলাম, মাঘ, ১৩২৫।
৪৪. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, বিধবা-গঞ্জনা ও বিষদ ভান্ডার, কলিকতাঃ কড়েয়া, গোরস্থান রোড, ৩য় সংস্করণ, ১৮৯৮।
৪৫. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।
---------- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯।
৪৬. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭১ বাংলা।
৪৭. কাজী মোতাহার হোসেন, ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০।
৪৮. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪।
৪৯. এম,এ, রহিম, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকাঃ আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৪।
---------- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, অনুঃ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
---------- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, অনুঃ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
৫০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশে ইসলাম, ২য় খন্ড, কলিকতাঃ ১৯৯৭।

-------বাংলাদেশে ইসলাম, ৩য় খন্ড, কলিকতাঃ ১৯৮১।
৫১. রেভাঃ রাজেন্দ্রনাথ বাড়ৈ, ব্যাপিস্ট সংঘের ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ব্যাপিস্ট সংঘ, ১৯৮৪।
৫২. ডঃ লুৎফর রহমান, রায়হান, কলিকতাঃ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, ১৩২৬ বাংলা।
৫৩. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা, শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকাঃ ১০, নর্থ বুক রোড, ১৯৬৭।
৫৪. শ, ম, শওকত আলী, কুষ্টিয়ার ইতিহাস, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো, ১৯৭৮।
---------- কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২।
৫৫. জগদীশ নারায়ণ সরকার, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, কলিকতাঃ ১৩৮৮ বাংলা।
৫৬. সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, ভারত বর্ষ ও ইসলাম, কলিকতা (প্রকাশকাল জানা যায়নি)।
৫৭. মোহাম্মদ সিদ্দীক জামাল ও মোহাম্মদ সা্ইফুল ইসলাম, বাংলাদেশে খ্রীস্টান মিশনারী কর্মকৌশল, ঢাকাঃ প্রীতি প্রকাশন, ২০০২।
৫৮. সুকান্ত সরকার, উইলিয়াম কেরীঃ জীবন ও সাধনা, ঢাকাঃ ৮৮/১, সেনপাড়া পর্বত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩।
৫৯. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকতাঃ ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০।
৬০. সালাহ উদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ।
৬১. প্রফেসর ডঃ মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, 'বৃটিশ বাংলায় খৃস্টান মিশনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৪তম বার্ষিক সম্মেলন-২০০৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মরণিকা'।
৬২. আব্দুল মওদূদ, ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকাঃ ১৯৮০।
৬৩. আবু জাফর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।
৬৪. মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, আত্মজীবনী, উদ্বৃতঃ মুহিউদ্দীন খান, জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
৬৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খন্ড, (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩।
৬৬. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, ' মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলন', বাংলাদেশের ইতিহাস,সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত)।
৬৭. আব্দুল মওদূদ, সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা, শতাব্দী পরিক্রমা, ঢাকাঃ ২০০২।
৬৮. মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৭৮।
৬৯. সানা উল্লাহ্ নূরী, সবাদীনতা সংগ্রাম, 'শেরে বাংলা ও লাহোর প্রস্তাব',
৭০. আব্দুল গফুর (সম্পাদিত), আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
৭১. ডঃ এম.এস.এ. ইব্রাহিমী, 'কারামত আলী জৌনপূরী (রঃ)',
৭২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ নভেম্বর ১৯৮৯।
৭৩. ইছমত আলী (অনূদিত), মাওলানা কেরামত আলীর জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, ঢাকাঃ ১৯৬৬।
৭৪. আবু জাফর শামসুদ্দীন, আত্মস্মৃতি-১, ঢাকাঃ ১৯৬৬।
৭৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৫।
৭৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ্, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৬।
৭৭. মুহা. আব্দুল বাকী, 'মাওলানা কারামত আলী জৌনপূরীর রাজনৈতিক মানস ও চিন্তার বিবর্তন', বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা 'ইতিহাস' পঁয়ত্রিশ বর্ষ প্রথম তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকাঃ ১৪০৮ বাংলা।
৭৮. রিপোর্ট, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি, ১৯১০।
৭৯. রিপোর্ট, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম শিক্ষা সমিতি, ১৯১০।

৮০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপূরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৫।
৮১. আ.ফ. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ, উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড
৮২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)
৮৩. রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৩।
৮৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনূদিত, বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ঃ ১৮৮৪-১৯১২, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ২০০২।
৮৫. বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, ঢাকাঃ ১৯৬৭।
৮৬. ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম।
৮৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকাঃ ১৯৮২।
৮৮. মোহম্মদ সেরাজুল হক, সিরাজী চরিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতাঃ ১৯৩৫।
৮৯. নওয়াব আব্দুল লতিফ খান সি.আই.ই, মুসলিম বাংলাঃ আমার যুগ(অনুবাদঃ আবু জাফর শামসুদ্দীন), ঢাকাঃ ১৯৬৮।
৯০. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ঢাকাঃ ১৮৮৪।
৯১. মাহববুল আলম, চট্রগ্রামের ইতিহাস, ১ম খন্ড, চট্রগ্রাম, ১৯৬৭।
৯২. আবদুর রহমান, যতটুকু মনে পড়ে, চট্রগ্রামঃ ১৯৭২।
৯৩. আফতাব উদ্দীন চৌধুরী, অতীতের কথা, ঢাকাঃ ১৯৬৮।
৯৪. কাজী আবদুল ওদূদ, শ্বাশত বঙ্গ, কলিকাতাঃ ১৩৫৮।
৯৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'মুসলিম বাংলার সংবাদ সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ট, ১৩৫০।
৯৬. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকাঃ ১৯৮৫।
৯৭. মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, যুগবিচিত্রা, ঢাকাঃ ১৯৬৭।
৯৮. অমলেন্দু দে, বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতাঃ ১৯৭৪।
৯৯. সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গভাষা ও মুসলমান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৫।
১০০. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬৭-১৯০৭) তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা, আলো আরজুমান বানু।
১০২. মোঃ জহুরুল ইসলাম, মুন্সী ওেম্মদ মেহের উল্লাহঃ তাঁর জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ,ডি, থিসিস, কুষ্টিয়াঃ ইসলামী ওদ্যালয়, ১৯৯৮।
১০৩. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, বাংলায় মুসলিম জাগরণের তিন দিশারীঃ মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও হাকিম হাবিবুর রহমানঃ ঐতিহ্য চেতনা, ইতিহাস সাধনা ও সমাজ সেবা-একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও পি,এইচ, ডি, ডিগ্রীর জন্য ঢাকা ওদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, জুন-২০০৭।
১০৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১শ খন্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২।

Bibliography

1. William W. Hunter, *The Indian Musalman,* Calcutta, Bangladesh Edition, Reprint, 1999.
2. A.R. Mallick, *The British Policy and Muslim of Bengal*, Dacca,1966.
3. B.D Basu, *History of Education in India*, Under the East India Company, 2nd Edition, Calcutta, 1935.
4. J.N Farquhar, *Modern Religious Movement in India*, New Delhi, 1977.
5. K.W Kaye, *Christianity in* India*,* London, 1959.
6. Rafiuddin Ahmed, *The Islamic Reform Movement in Bengal in Nineteenth Century: Meaning and Significance Islam in India,* Bangladesh Etias Samiti, Dhaka-1983.
7. Sayed Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* London: 1955 (8th edition)

---- Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Ibid.

8. Muhammad Mohar Ali, *The Bengal Reaction to Christian Missionary Activitis (1833-1857)*, Chittagong, 1965.
9. H.B Luwford, *Press Relating to Indigo Cultivation in Bengal.*
10. Jagadish Narayan Sarker, *Islam in Bengal,* Calcutta: Ratna Prokashani, 1972.
11. James Wise, *Notes on the Races Castes and Trades of Estern Bengal ;* London: 1983.
12. Dr. K.M. Mosin, *Bangladesh Under British Rule, Islam in Bangladesh through Ages Dhaka:* Islamic Foundation, 1995.
13. K.G.M Latiful Bari, *Jessore District Gazetteers Dacca:* Bangladesh government Press, 1977.
14. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka: Bangla Academy, 1977.
15. T. Titas Murray, *Indian Islam,* Oxford: 1930.

16. Mc Nee Peter, *Crucial Issues in Bangladesh,* California: William Cary Library, 1976.
17. Romesh Datta, *The Economic History of India in the Victorian,* London: 3rd edn, 1908.
18. Ghulam Hussain Khan, *Siar-ul-Mutakharian.*
19. Stephen Neill, *The Story of the Christian Church in India and Pakistan,* Madras: The Christian Literature Society, 1972.
20. W.W Hunter, *The Indian Mussalmans,* Dacca: 1st Edition, 1975.
21. *The World Book Encyclopdia*, Volum 15, U,S,A.: Copyright, 1981.
22. *Census of India Rport 1911*.
23. A.F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal*, 1818-1835, London, 1965,
24. Muhammad Mohar Ali, *The Bebgali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857)*, Chittagong, 1965
25. N. Chatterji, *Life of Muhatma Raja Rammohon Roy*
26. R.C Majumdar, *History of Freedom Movement, iii*,
27. Ahmed Mustafa Abu Hakima, *History of Eastern Arabia, 1750-1800: The Rise and Development of Bahrain and Kuwait,* Birut, 1965.
28. Muin ud-Din Ahmed Khan, *History of the Faraidi Movement,* Karachi, 1965.
29. *Encyclopedia of Islam, Vol-II,*
30. Muin Uddin Ahmed, *`Religious Reform Movements of the Muslims', History of Bangladesh, 1704-1971*; Sirajul Islam (ed.), *Social and Cultural History, Vol. Three, Asiatic Society of Bangladesh,* Dhaka: 1992,
31. Muin Uddin Ahmd Khan, *Titu Mir and His Followes,* Dhaka:1980.
32. R.C Mojumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857,* Calcutta: 1957; --R.C. Dutta, *Economic History of India in the Victoian Age,* Calcutta: 1906; J. E Kaye, *A History of the Sepoy War in India, 1857-58,* London: 1877.
33. J.C. Jack, *Bengal District Gazetteer, Bakergang*, Calcutta, 1918.
34. Mohiuddin Ahmed, *Saiyid Ahmad: His Life and Mission,* Academy of Islamic Research and Publications, Lucknow.
35. Abdul Hai, *Nuzhatul Khawater, Vol.II*, Hyderabad, 1947.

36. Enamul Haque (ed.), *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents,* Dacca, 1968.
37. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal: 1884-1912.*
38. W.S Blunt, *India Ripon*, London, 1909.
39. *The Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association with a list of the members,* Calcutta:1882.
40. K.K. Aziz (ed.) *Ibid*.
41. Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in Later Nineteenth Century* , Cambridge, 1968
42. Moin Shakir, *Khalifat to Partition, 1919-1947,* Delhi: 1970
43. Z.H Faruqi, `*Mulim Opposition to Pakistan, T.W Wallbank (ed.), The partition of India : Causes and Responsibilities,* Boston, 1966
44. S. Abid Hussain, *The Destiny of Indian Muslims,* Bombay: 1965.
45. G.F.L Graham, *The Life and Works of Sir Sayed Ahmed Khan*, Lodon: 1909, 2nd ed.
46. *The Moslem Chronicle,* Calcutta, June 4, 1896.
47. A.F. Salahudin Ahmed,`*Political Thought and Activities in the Ninetheenth Century' in History of Bangladesh, Vol. one,* Sirajul Islam (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992.
48. Sunil Kumar Chatterji, *Srerampore Missionaies and Christian Muslim Interaction in Bengal, C*alcutta: 1981.
49. K.P. Sengupta, *The Christian Missionaries in Bengal,* Calcutta.
50. Jayanti Maitra, *Muslims Political in Bengal,* Calcutta: 1984.
51. Syed Amer Ali, *His Life and Woks,* Lahore: 1968.
52. *Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII*, pt.II, No.1, 1894
53. Dr. Md. Enamul Haque, A History of Sufism in Bengal, Dhaka: 1975.

জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বও ১৮৯৯, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০০, মে-জুন ১৯০০, ৫ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩, ৫ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, ৫ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বও ১৯০৩, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা ১৯০৪, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা মে-জুন ১৯০৪, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম, ৯ম, ১০ম ও ১২শ সংখ্যা, ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩১১, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১৯০২, ৬ষ্ঠ ১ম সংখ্যা ১৩১১, ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩১৫, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯০৫, ৭ম বর্ষ ৩য়,৭ম ও ১১শ সংখ্যা জুলাই ১৯০৫, নভেম্বও ১৯০৫ ও মার্চ ১৯০৬, ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৯০৫।

ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৭।
ওেম্মদী, (সাপ্তাহিক), ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২।
তবলীগ, (মাসিক) অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ফাল্গুন ১৩৩৪।
বাসনা, (মাসিক) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩১৬।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট' ১৯৮২।
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৯০৩
প্রতিবেশী, (মাসিক) বড়দিন সংখ্যা ১৯৯০।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।
নদীয়া আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলামের রিপোর্ট, (১৯১১-১৬), কৃষ্ণনগর নদীয়াঃ ১৩২৫।
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৬।
সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭।
ইসলাম দর্শন, ১৩২২
রওশন হেদায়েত, ১৩৩১।
সোলতান, ১৯০২।
লহরী, ১৩০৭।
বঙ্গনূর, ১৩২৬।
কোহিনূর, ১৩০৫।
খ্রীস্টীয় বান্ধব, ১৮৯২।
সুধাকর, ১২৯৬।
নবনূর, ১৩১০।
সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০।

প্রকাশের বিনবেদন, শিখা, চৈত্র, ১৩৩৩।

শরিয়ত, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৩২, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩৩২, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩২, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩৩২, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩৩২।
শরিয়তে এসলাম, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৩২, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৪, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩৩৫, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৪, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৪, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৩৩৪, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৩৩৪, ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩৩৪।
ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, মুনশী মেহেরুল্লাহ ও তৎকালীন সমাজ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ মার্চ, ২০০১।
নাসির হেলাল, মুসলিম জাগরণে মুন্‌সি মেহের্‌উল্লাহ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ জুন, ২০০২।